



আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেন মহোদয়ের

স্বাক্ষরিত।

শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসন্ন সেন কবিরাজ

ও

শ্রীহরি প্রসন্ন সেন কবিরাজ

কর্তৃক সম্পাদিত

এবং

১৮ নং কুমাবটলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা মণিরাম যন্ত্রে

(১৮ নং অপার চিৎপুর রোড বাগবাজার)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ শাল।

মূল্য ১০ টাকা মাত্র।



আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী ।

অবতরণিকা ।

আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী যে, গুরুতর ভার লইয়া শিক্ষিত-সমাজে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহার নামেও তাহা প্রকাশ পায় ; কিন্তু অভিধান বা কল্পনার সাহায্যে সঞ্জীবনীশব্দ নানারূপ অর্থ প্রসব করিতে পারে । সুতরাং আমাদের অভিপ্রেত অর্থ বিশদ করা আবশ্যিক, —

প্রায় সহস্র বর্ষ ধর্ম —

আসনে অধিষ্ঠিত ; তাহাকে হাতুড়েমী বলা ছঃসহ তিরস্কার ।
 নিদ্রিতও বলিতে পার না ; কেননা নিদ্রিতের আপনা হইতেই
 চৈতন্যোদয় হয় ; কাহারও যত্নের অপেক্ষা রাখে না । যাহা দেখা
 যাইতেছে, তাহা মুমূর্ষু ও মূর্ছিতেরই সম্পূর্ণ লক্ষণ । উহা ঘোর
 অজ্ঞান-তমে আচ্ছন্ন রহিয়াছে । কাজেই চৈতন্য-হীন, ক্রিয়া-হীন
 এবং জীবন-হীনের ন্যায় প্রতীয়মান । যতদিন এই নিদারুণ মূর্ছার
 অপনোদন হইয়া চৈতন্য সম্পাদন না হইতেছে, ততদিন উহা
 এই রূপই থাকিবে । সুতরাং সর্বতোমুখী ফল-প্রাপ্তিরও
 সম্ভাবনা নাই ।

এক্ষণে ইহাকে সজীব ও প্রকৃত কার্যোপযোগী করিতে হইলে,
 দেশীয় সাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও যত্নরূপ পথ্য এবং রীতিমত
 ঔষধ আবশ্যক । বৈজ্ঞানিক মুমূর্ষু ব্যক্তির অচেতন অবস্থায় সঞ্জীবনী-
 ইহারও সঞ্জীবনীই

বোধগন্ধে শাস্ত্র-মর্ম অবগত হইয়া চিন্তা এবং
বুদ্ধিস্থ করা । বিচার পূর্বক সার অসার সম্বলন
প্রয়োগ করা বোধের একটি কার্য্য । নব নব
পদার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বোধের আর একটি
কার্য্য । কেবলমাত্র শাস্ত্র বুদ্ধিস্থ না হয়, ততদিন কেবল ভার-
স্রাব্য উপদার্থের স্থায় কেবল স্থানমাত্র অবরোধ
স্বতন্ত্র এই বিষয়ে একটি সুন্দর মন্তব্য
গিয়াছে ।

নমপ্রতিভাযিতমর্থতঃ ।

ইব কেবলং পরিশ্রম-করং ভবতি ॥

অর্থাৎ যদি তাহা হৃদয়ে যথার্থরূপে উদ্ভাসিত
হয় তবে চন্দন-ভারের স্থায় কেবল

শাস্ত্রের মর্ম অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য
আচরণ । গুরুর নিকটে যথারীতি শাস্ত্র
মর্ম ও সুন্দর রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে
আচরণ না করিতে পারিলে সেই শাস্ত্র
দ্বারা শাস্ত্রের সত্য-নির্ণয়, জ্ঞান-
উপার্জিত বিদ্যার পরিপাক ও ক্ষুণ্ণ

মর্মসকল সাধারণসমীপে প্রকাশ করাকে
কেবল কতিপয় ব্যক্তি-গত সে শাস্ত্র
প্রসার কখনই হইতে পারে না ।
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চেষ্টা, পরীক্ষা, চিন্তা এবং
অপিচ তর্ক বিতর্কের ঘর্ষণে নির্মল-
দূর পরাহত । শাস্ত্রে আছে—

“স খলু ঋণী গুরুজনস্য”

অর্থাৎ যিনি অধীত শাস্ত্র শিষ্যসমীপে প্রচার না করেন, তিনি গুরুলোকের নিকটে ঋণী । আমরা বলি, কেবল শিষ্যের নিকটে কেন ? যিনি জগজ্জনের নিকটে প্রচার না করেন তিনিও ঋণী । শাস্ত্র যদি জগতের আপামর সাধারণের নিকট প্রকাশিত না হইল, তবে সেই শাস্ত্রের সৃষ্টিই বৃথা । সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে পূর্বাশ্রমাদি এদেশে নানা শাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে ।

উক্ত চারিটি অপূর্ণ * অঙ্গ প্রস্থাবিত সঞ্জীবনীর উপাদান । সুতরাং এ কথা বলা বাহুল্য যে, যাহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ ও প্রচার-বৃদ্ধি হয়, এবং এই সমস্ত বিষয়ে অনুদিন সাধারণের অনুরাগ জন্মে, সঞ্জীবনী স্বতঃ পরতঃ সেই চেষ্টায় দীক্ষিত হইল ।

এস্থলে প্রসঙ্গাত আর কয়েকটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যিক ;— প্রথম । যাহারা কোন শাস্ত্রের স্রষ্টা কল্পে যত্ন-শীল হয়েন, তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল স্বজাতীয় শাস্ত্রে এবং স্বজাতীয় জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সংস্কারসাধন এবং সৌষ্ঠব-বর্দ্ধন হইতে পারে না । ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র ও ভিন্নজাতীয় জ্ঞান হইতেও সার অসার বিবেচনা পূর্বক সত্য সঙ্কলন অতীব প্রয়োজনীয় । সত্য গ্রহণ কালে জাতি, দেশ, বয়স ইত্যাদি বিচার অজ্ঞতা বা দাস্তিকতার লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । আমাদের এই কথা সাধারণের সহিত এক মত হইবে কি না বলিতে পারি না, এক মত না হউক, উপহাসের কারণ না হইলেই পরিত্রাণ পাই । কেন না অতি দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের বৈজ্ঞ-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন ; “আমরা

* অপূর্ণ কেন ? যে হেতু ইহাদের কোন চাক্ষুষ আকার বা গন্ধাধাদি নাই এবং কার্য্যকারণভাব ও বিচিত্র ।

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় ইত্যাদি সমুদয় দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছি । চরক সূত্র প্রভৃতি আর্যগ্রন্থ আমাদের কণ্ঠগত, অস্পৃশ্য স্নেহ জ্ঞাতি বা তাহাদের শাস্ত্রে আমাদের শিক্ষণীয় কি আছে ? ঋষি-দের অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দেয় এমন ব্যক্তিই বা কে ? থাকিলেও তাহার মত ভ্রান্ত ও অপবিত্র ।” কিন্তু যদি ইহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই জানিতে পারেন, যে ঋষিরা যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন কিনা সংশয় স্থল, এমন অনেক বিষয়, অনেক সত্য, অপরজ্ঞাতি বা অপর ব্যক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে * । প্রকৃত ঋষি জ্ঞাতি-নিষ্ঠ নহে উহা কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান-নিষ্ঠ এবং জ্ঞানপ্রবাহ, কালস্রোতের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত ।

উক্ত রোগ যে কেবল বৈদ্যদের মধ্যেই আছে এমন নহে । পাশ্চাত্য আয়ুর্বিজ্ঞানে শিক্ষিত অনেক মহাত্মারও ঐরূপ ভ্রান্তি দেখিতে পাওয়া যায় । ইহারাও আবার অনেকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন, যে, “ইয়ুরোপীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র দিনে দিনে যেরূপ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে । তুলনা করিয়া দেখিলে, হিন্দু-চিকিৎসা তাহার নিকট গোপ্পদ তুল্য, সুতরাং উহার নিকটে আমা-দের শিক্ষিতব্য কিছুই নাই । বৃহজ্জলাশয় থাকিতে কুপজলের প্রত্যাশাই বা কেন ?” কাহার কাহারও বা তমোগুণের মাত্রা এত বেশী যে, ইয়ুরোপীয় চিকিৎসায় হতাশ হইয়া, বৈদ্য চিকিৎসায় যে কত শত রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে, প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেও কাকতালীয়-সংযোগ বলিয়া মীমাংসা করেন । বস্তুতঃ ইহারাও যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, “আমাদের প্রাচীনদের তাল-পত্র লিখিত পুস্তকের জীর্ণ কলেবরে এমন অনেক বিষয় অঙ্কিত রহিয়াছে, যাহা অদ্যাপি কাহারও অন্তরে অঙ্কুরিত হয় নাই—এমন সহস্র কথা আছে, যাহার গূঢ় মর্মভেদ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব

* ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয়ের বহুল উদাহরণ দেওয়া যাউক ।

আছে", তাহা হইলে জানিতে পারেন, যে অনেক শিক্ষণীয় আছে।
কি না এবং কাকতালীয় সংযোগ সর্বত্র কার্যকারী হয় কি না ।

আচ্ছা মানিলাম, তুমি যাবজ্জীবন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া
বিজাতীয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ, বিজাতীয় জ্ঞানে তোমার নেত্র
উন্মীলিত হইয়াছে, বিজাতীয় শাস্ত্র হইতে তুমি উৎকৃষ্ট রত্ন সংগ্রহ
করিয়াছ, সুতরাং তুমি যেন সর্বজ্ঞানের আধার ; কিন্তু যতদিন
তোমার পারদর্শিতা, তোমার জ্ঞানোন্মেষ, তোমার সংগ্রহ জাতীয়
ভাবে গঠিত না হইবে, জাতীয়বিদ্যায় লব্ধাধিকার না হইবে,
স্বদেশজ ঔষধ দ্রব্যে নিয়োজিত না হইবে, ততদিন ঐ সমস্ত দ্বারা
দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণ নাই । এ লীলার অবসানে তোমার
যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারই উপস্থিত হইবে । মুসলমানদের রাজত্ব
কালেও এক দিন এদেশে হাকিমী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ;
অনেক দেশীয় লোক উক্ত চিকিৎসায় কৃতবিদ্যও হইয়াছিলেন, এক্ষণে
উহা কোথায় গেল ? তবু যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাও
তাহা প্রায় সমস্ত এদেশের বলিয়াই । ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশের
এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির জ্ঞান সংগ্রহ করা শিক্ষার্থীর যেমন একটী
কর্তব্য, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজশাস্ত্রে উহার স্থান-দান
করাও স্থায়িত্ব-কামীর পক্ষে তেমন আর একটী কর্তব্য । অতএব
সঞ্জীবনী একাধেও জাগরক থাকিবে এবং ভিন্ন জাতি হইতে
সঞ্চিত জ্ঞান রাশিকে পূর্ব পুরুষীয় জ্ঞানকোষের পরিশিষ্টে প্রকরণ
বলিয়া গণ্য করিবে ।

দ্বিতীয় । ভাষার পুষ্টি এবং শাস্ত্রের শ্রীরক্ষা কল্পে অনুবাদও
একটী মহোষধ । ইহা নীরজদেহে রক্তসংক্রামণের ন্যায় আশু
উপকারী অথচ অন্য উপায় অপেক্ষা অল্পক্লেশ-কর । কেন না
অপরের উপার্জিত জ্ঞান ভাষান্তরিত করিলেই হইল । যে ইউ-
রোপায় চিকিৎসাশাস্ত্র দিনে দিনে উন্নত ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত

হইয়া আজ দিগন্তব্যাপী হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহারও মূল ভারতীয় আয়ুর্বেদের সামান্য অনুবাদের অনুবাদ মাত্র। ভাবিলে বোধ হইবে, যেন একটি ক্ষুদ্রতম বীজ কণা বিশাল বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে। অথবা একটি সামান্য প্রান্তবর্ণ-ধারা সাগরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড তুমি ধন্য ! এবং যথার্থ চতুর !। তোমার জ্ঞান-পিপাসা বিষয়-পিপাসা অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নহে।।। তুমি বর্ণিগ্বেশে ভারতরাজ্যের বহিঃসিংহাসন যেমন অধিকার করিয়াছ, অনুবাদকবেশে ইহার জ্ঞান-রাজ্যের অন্তঃ সিংহাসনও তেমনই আয়ত্ত করিতেছ। আজও তোমার ভাষা শতমুখী হইয়া বিবিধ ভাষা হইতে জ্ঞান-রত্ন সংগ্রহ করিতেছে। অনুবাদ সামান্য কার্য বলিয়া তুমি তুচ্ছ জ্ঞান কর না, যদিও তোমার দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের অনেকে শাস্ত্রীয় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, দশ পনরখানি ইয়ুরোপীয়চিকিৎসা গ্রন্থের এবং পাঁচ সাত খানি বৈদ্য-চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে ইয়ুরোপীয় গ্রন্থের দুই চারি খানির অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদ্যক গ্রন্থের অনুবাদের নাম করিতেও আমাদের লজ্জা উপস্থিত হয়। বলিতে কি যাঁহার। সংস্কৃত ভাষার অনুসার বিসর্গ মাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, গুরু সম্মিধানে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ কখন পান নাই, তাঁহারাই ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদক। আয়ুর্বেদ যে অতি জটিল, এমন কি একটি “তু” “ন” প্রভৃতি তুচ্ছ অক্ষরের মীমাংসা করিতে এবং একটি সামান্য শব্দের অর্থ সংলগ্ন করিতে যে যথেষ্ট পরিশ্রম, সময় এবং ব্যয় আবশ্যক, বিশেষত অনুবাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, ইহা তাহাদের মূলে ধারণাই নাই। সুতরাং ঐ সকল অনুবাদ যে কিরূপ বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইতেছে, এবং কি ভয়ঙ্কর বিষ উদ্দীর্ণ করিতেছে, যাঁহার। অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই

জানেন *। ফলতঃ যতদিন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে প্রকৃত ব্যুৎপন্ন ও রুত-
কর্মা ব্যক্তিগণ অনুবাদকার্যে হস্তক্ষেপ না করিতেছেন, ততদিন
উহার গিস্তার নাই। অতএব যাহাতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক
উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সঞ্জীবনী সেই বিষয়ে যত্নবতী হইবে।
এবং অনুবাদ ইহার একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয়। আর একটি কথা। এই যে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রের জীবন্তি
সম্পাদনার্থে বহুল গ্রন্থের প্রচার যেমন আবশ্যিক, কতকগুলি
অকর্মণ্য ও অসার পুস্তক দ্বারা যাহাতে সরস্বতী-ভাণ্ডার কলঙ্কিত
না হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও বিজ্ঞমণ্ডলীর তেমন আবশ্যিক।
কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন ;—

“তদমল্লমপি নোপেক্ষ্যং শাস্ত্রে (কাব্যে) দুষ্টং কথঞ্চন।

কিং বপুঃ সুন্দরমপি স্থিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥”

অর্থাৎ শাস্ত্রের অল্প পরিমাণ দোষও উপেক্ষার যোগ্য নহে,
যেহেতু অতি সুন্দর দেহও একটি মাত্র স্থিত্রে অপবিত্র ও অপ্রীতি-
কর হয়।

এই সাধু অভিপ্রায়ে অনেক কাল হইতেই সমালোচনপ্রথার
সৃষ্টি হইয়াছে। সমালোচন গ্রন্থের পরীক্ষাগ্নি-স্বরূপ, গুণদোষের
দর্পণস্বরূপ, শাস্ত্ররত্নের শাণযন্ত্রস্বরূপ এবং জ্ঞানের রসায়ন স্বরূপ,
ইহা দ্বারা পণ্ডিতগণ উৎসাহিত হইয়া নূতন চিন্তায় নিমগ্ন, নূতন
আবিষ্কারে উদ্দীপিত, এবং নূতন সংকলনে প্ররুত হন। মূর্খদেরও
অজ্ঞানতিমির তিরোহিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন-
পক্ষে সমালোচনও একটি উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব ইহাও সঞ্জী-
বনীর একটি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। যদিও আজ কাল

* ভ্রান্ত অনুবাদে অহরহঃ যে অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে ; তাহার
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অচ্যুত প্রবন্ধে দেখাইব।

বঙ্গভাষার উন্নতিসহকারে সমালোচকপত্রের অভাব নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমালোচ্য বিষয় এত রাশীকৃত হয়, যে প্রায় সময়ে সঙ্কলন হয় না। কেহ কেহ বা নীরস বলিয়া আয়ুর্কৌদ-সমালোচনে উপেক্ষা করিয়াও থাকেন। তাহা না হইলেও চিকিৎসা বা চিকিৎসাশাস্ত্রের সমালোচনের জন্য যে একটি ভিন্ন সম্প্রদায় আবশ্যিক, ইহা অনেকে স্বীকার করেন। কারণ যিনি যে কার্য্যে ব্রতী, সেই কার্য্যে তাঁহার যেমন অধিকার জন্মে অন্যের ঐরূপ হওয়া অসম্ভব।

সঞ্জীবনীর ব্যাখ্যা ও প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বলা হইল। অতঃপর সুধীজনসমীপে বিনীতনিবেদন এই যে, বহুদর্শন, বহু অনুসন্ধান ও বহু পরীক্ষা যে শাস্ত্রের অবলম্বন—তুজের মানবপ্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল অলক্ষ্য রোগসমূহ যাহার অধিকৃত বিষয়—অপরিচিত লতা, গুল্ম, খনিজ পদার্থ, তাপ ও শৈত্যের ভার-তম্য, কালের পরিবর্তন, সংক্ষেপতঃ সমস্ত জগৎই যাহার আলোচ্য, সেই শাস্ত্রের সঞ্জীবন বা উন্নতি-বিধান যে, কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হইবে, ইহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। আয়ুর্কৌদের বিশ্বব্যাপক ভাব আমরা সমুদয় বুঝিয়াছি আমাদের এমন সংস্কার নাই। আমরা আয়ুর্কৌদের সঞ্জীবনার্থ তাহার আলোচনা ও যত্ন করিব, যতদূর বুঝিয়াছি তাহা সাধারণকে বুঝাইব এবং যাহা না বুঝিয়াছি তাহা সাধারণের নিকটে বুঝিয়া লইব এই জন্ত কি চিকিৎসক, কি প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, কি রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, কি পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী, কি দার্শনিক, কি শাস্ত্রিক, পণ্ডিত মাত্রেই নিকট আমরা উপদেশ, শিক্ষা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। যদি সকলের সমবেতযত্নে আয়ুর্বিজ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইলেও সঞ্জীবনী আপনার জন্ম সার্থক বিবেচনা করিবে।

আয়ুর্বেদ কতকালের ?

“আয়ুর্বেদ কত কালের ?” এ প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিতে পারেন না । একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে । প্রয়োজন আছে কি না, তাহা পাঠকই বিবেচনা করুন । আয়ুর্বেদ যদি এদেশের সর্বাধিন হয়, নিজস্ব হয়, আয়ুর্বেদ যদি এদেশের মূলে, মধ্যে ও অধুনা অবিচ্ছেদে বিরাজিত থাকা প্রমাণীকৃত হয়, আয়ুর্বেদ যদি আদি-শরীরী ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, ভারতীয়লোক-পরম্পরায়, ভারতীয়-লিপিপরম্পরায়, অবিচ্ছেদে ও অবিসম্বাদিরূপে চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বুঝিব, আমাদের আয়ুর্বেদ আমাদেরই ধন, আমাদের আয়ুর্বেদ আমাদেরই হিতকারী । আয়ুর্বেদ পর্যালোচনা করিয়া আমরা এইরূপ অবধারণ করিতে পারি যে, আমাদের এই আদিম আয়ুর্বেদে যদি অন্যান্য দেশের ঔষধ প্রবেশ করিয়া না থাকে, ভারতীয় আয়ুর্বেদ, যদি ভারতেই আবির্ভূত হইয়া ভারতবাসীতেই পরীক্ষিত হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে, আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারিব যে, ভারতের আয়ুর্বেদই ভারতের একান্ত উপযুক্ত । ভারতীয় ঔষধ সকল ভারত-বাসীর পক্ষে নিতান্তই হিতকারী । দেশবিশেষে শরীরের ও শারীর-প্রকৃতির বিভিন্নতা হয়, — দেশবিশেষে রোগ ও রোগনিদানের পার্থক্য ঘটনা হয়, — দেশভেদে রোগপ্রতীকারের প্রণালীও আপনা হইতে বিভিন্ন হয়, — দেশভেদে ঔষধ ও ঔষধক্রিয়ার ভিন্নতা সংঘটন হয় । কেন হয়, তাহা অন্য প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে । ভারতীয় আয়ুর্বেদ ভারতেরই সম্পত্তি, দেশান্তরের সম্পত্তি নহে, ইহাও তৎপ্রযুক্ত প্রদর্শিত হইবে । এক্ষণে প্রসঙ্গাত কথা পরিত্যাগ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাউক ।

পুরাতত্ত্ব নির্ণয় করিবার বা অতীততত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার দুইটি মাত্র পথ বা উপায় আছে। এক যুক্তি, অপর ঐতিহ্য (ইতিহাস) যাহা অতীত হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষের অধিকার থাকে না; সুতরাং অতীততত্ত্বের সাক্ষ্যদাতা যুক্তি ও ইতিহাস, বর্তমান বা প্রত্যক্ষ তাহার সাক্ষ্যদাতা নহে। কেবল যুক্তি বা কেবল ইতিহাস বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না। অতএব, যুক্তিযুক্ত ইতিহাসকে কিম্বা ইতিহাসযুক্ত যুক্তিকে অতীত-তত্ত্বের প্রকৃত বোধক বলিয়া স্বীকার করি। কেন না, ঐ দুইটির সমাবেশ হইলে দুইটিরই মিথ্যা অংশ নিষ্কাশিত হইয়া যায়, কাষেকাষেই সত্যাংশ পাওয়া যায়। মনে করুন, কোন একটা যুক্তি উদ্ভাবন করিলাম, বা অনুমান উন্নয়ন করিলাম; করিলে, তাহা যদি ঐতিহ্যের বা ইতিহাসের সহিত মিলিয়া গেল, অবিসম্বাদী বা অবিরুদ্ধ হইল, তাহা হইলেই জানা গেল, বা স্থির হইল যে, আমার সেই যুক্তি সত্যকেই গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ ইতিহাস পাইলে তাহার অর্থ যদি যুক্তি-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে জানা গেল যে, আমার সেই ইতিহাস সত্যকেই প্রচার করিতেছে। অতীত-তত্ত্বানুসন্ধানী পণ্ডিতেরা এতদ্রূপ উপায়েই অতীততত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস ও যুক্তি এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই পূর্বতত্ত্ব নির্ণীত হয়।

যুক্তি ও অনুমান একই কথা। ঐতিহ্য ও ইতিহাস এই দুই শব্দও পর্যায়শব্দ। যুক্তি প্রত্যক্ষমূলক এবং ঐতিহ্য দৃষ্টান্তমাপেক্ষ। এজন্য যুক্তি-উদ্ভাবন-সময়ে তাহার মূলস্বরূপ বা ভিত্তিস্বরূপ কোন এক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বর্তমান থাকা চাই। তাহা না থাকিলে, কোন ক্রমেই যুক্তিজ্ঞান অক্ষুরিত হইতে পারে না। ঐতিহ্যও যদি দৃষ্টান্তবহির্ভূত হয়, তাহা হইলেও সে ঐতিহ্য কার্যকারী হয় না। ইতিহাস পাইলাম, কিন্তু তাহা বুঝিবার

যোগ্য কোন দৃষ্টান্ত পাইলাম না । এরূপ হইলে সে ইতিহাসে কি ফল দর্শিবে ? আমাদের বিবেচনায় তাহা থাকা না থাকা ভুল্য ।

- “ইতিহাস” শব্দের অর্থ কি ? কিরূপ অর্থের উপর বা কিরূপ বস্তুর উপর ইতিহাস শব্দের সন্ধেত ? তাহা বিবেচনা করুন ।

“ইতিহ ইতি পারম্পর্যোপদেশেহবায়ম্ ।

তৎ আন্তে অগ্নিন্ ইতি ইতিহাসঃ ।” মহেশ্বর ।

এক জন অন্য জনকে একটি বিষয় উপদেশ করিল, সেও আবার নিম্নতন ব্যক্তিকে তাহা উপদেশ করিল, সেও আবার আপনার অধস্তন পুরুষকে বলিল, যাহা এতদরূপ পারম্পর্য্যক্রমে অবিচ্ছেদে উপদিষ্ট, — তাহারই নাম “ইতিহ” । সেই ইতিহ যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস । এরূপ বলাবলি করিতে করিতে যে টুকু বাড়িয়া যায়, সেটুকু ইতিহাস নহে, সত্য নহে । যুক্তি প্রয়োগ করিলে সেই টুকুই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে । “ইতিহ” শব্দের অর্থও এরূপ জানিবেন ।

“ইতিহ উচুঃ বৃদ্ধাঃ । ইতি ঐতিহ্যম্ ।

পারম্পর্য্যক্রমাগতং বাক্যমিতি যাবৎ ।”

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, কিরূপ ইতিহাস আমাদের সত্য বুঝাইতে পারে । অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যুক্তিযুক্ত ইতিহাস ভিন্ন, যে সে ইতিহাস সত্য দেখাইতে পারে না । তজ্জন্যই বলিতে হইয়াছে যুক্তিযুক্ত ইতিহাস ও ইতিহাস-সঙ্গত যুক্তিই পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রধান উপায় । তজ্জন্যই আমরা বলিতেছি বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, গুরুপরম্পরাগত বা বৃদ্ধপরম্পরাগত সত্যবাক্য, বা তাহার বোধক লিপি, ঘটনাবিশেষের বা বস্তুবিশেষের লুপ্তবিশেষ, অনু-সন্ধেয় পদার্থের প্রাকৃতিক বা আবহিক তারতম্য, — এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সেই সকল অচ্ছেদ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, অথবা দৃষ্ট, শ্রুত ও সিদ্ধ পদার্থ লইয়া অতীত-তত্ত্বের অনুমান বা অনু-

সন্ধান করিতে হয়। আয়ুর্বেদ কতকালের ? এ প্রশ্নেরও উক্ত উপায়ের আশ্রয় লইয়া প্রত্যুত্তর দিতে হইবে।

যে যুক্তির কোন মূল নাই, ভিত্তি নাই, অবলম্বন নাই, যে যুক্তি পূর্বাপর-বিরুদ্ধ, একদিকে অসংলগ্ন ও অন্যদিকে সংলগ্ন একরূপ যুক্তি পরিত্যজ্য। যে ইতিহাসের অর্থ যুক্তিবিরুদ্ধ ও দৃষ্টান্তবহির্ভূত, কুযুক্তির ন্যায় তাদৃশ কু-ইতিহাসও অগ্রাহ্য। কেন না, সে ইতিহাস অতীত-তত্ত্বের সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। অতীততত্ত্ব নির্ণয় করা যখন এতদূর কঠিন,—এত দুঃসহ, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না যে, “আয়ুর্বেদ কত কালের ?” এই প্রশ্নের ঠিক সচ্ছত্তর বা অজান্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারিব। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে রীতিতে অতীত-তত্ত্বের নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই রীতিরই অনুসরণ করিব; স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্মূলকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, অতি সাবধানতার সহিত আয়ুর্বেদের কালসংখ্যা অনুমান করিব। তাহাতে যতটুকু সত্য লাভের সুসম্ভাবনা, পাঠকগণ ততটুকুই পাইবেন, অধিক আকাঙ্ক্ষা করিলে চলিবে না।

“আয়ুর্বেদ কত কালের ?” এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উন্নয়ন করিবার জন্য প্রথমতঃ আয়ুর্বেদ কি তাহা অনুসন্ধান করুন, পশ্চাৎ তাহার কালসংখ্যা জানিবার ইচ্ছা করিবেন।

আয়ুর্বেদ কি ? তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে, কতকগুলি ইতিহাস ও কতক গুলি গুরুপরম্পরাগত লিপি পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায়, আয়ুর্বেদ অথর্কবেদের একটি উপাদ। কোন কোন গ্রন্থে উহা ঋগ্বেদের উপবেদ, এইরূপ বিস্পষ্ট কথা লিখিত আছে। কোন কোন গ্রন্থে আবার এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, আয়ুর্বেদ সকল বেদের সার। যথা,—

“সর্কেয়ামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি।

ঋগ্বেদস্যায়ুর্বেদ উপবেদঃ। যজুর্বেদস্য অথর্কবেদ উপবেদঃ।

সামবেদস্য গান্ধার্ববেদ উপবেদঃ।

অথর্কবেদস্য শতশাখাণি।” [বাসকৃত চরণবাহু]

ইহার অর্থ এই যে, সকল বেদেরই এক একটি উপবেদ আছে । ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ, সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র,) এবং অথর্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ শল্যতন্ত্র । কেহ কেহ “শস্ত্রার্থশাস্ত্রাণি” এইরূপ পাঠ থাকা নির্ণয় করিয়া, অর্থশাস্ত্রকে অর্থাৎ ব্যবহার-বিজ্ঞানকেও অথর্ববেদের উপবেদ বলিয়া গণনা করেন ।

“ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ক্যখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ ।

বিচিন্ত্য তেষামর্থং বৈ আয়ুর্বেদং চকার সঃ ॥”

[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ]

সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ পরিদর্শন করিয়া তাহার অর্থ অনুসন্ধান পূর্বক আয়ুর্বেদ রচনা করিয়াছিলেন ।

চরণব্যূহের প্রমাণে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ হইতেছে, আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে উহা সমুদায় বেদের অর্থসংগ্রহ বলিয়া খ্যাপিত হইতেছে । কিন্তু বর্তমান কালের প্রচলিত আয়ুর্বেদীয়গ্রন্থে অর্থাৎ সুশ্রুতপ্রভৃতিগ্রন্থে উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা লিখিত আছে । সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ । যথা,—

“ইহ খলু আয়ুর্বেদো নাম যজুপাঙ্গমথর্ববেদস্য ।”

[সুশ্রুত ১ অঃ]

সুশ্রুত বলিলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ । চরণব্যূহ নামক বৈদিক গ্রন্থ বলিলেন, আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ, এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিলেন, উহা সর্ববেদের মার । এই মতত্রয় দেখিয়া পাঠকগণ অবশ্যই ভাবিবেন যে, চরণব্যূহ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও সুশ্রুত,—এই তিনের কথা পরস্পর বিসম্বাদী হইতেছে ; সুতরাং কাহার কথা সত্য, তাহা জানা যাইতেছে না । পরন্তু তাহারা যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন, একবাক্যতা বা সামঞ্জস্য-বিধানে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে,

কাহারও কথা মিথ্যা নহে, সকলেরই কথা সত্য ; ব্যক্ত করিবার ভঙ্গীটি কেবল প্রথক। কেন না, সকল বেদেই আয়ুর্বেদের বীজ বা মূল-সূত্র বর্তমান আছে।

বর্তমান আয়ুর্বেদ মুখ্যকল্পে অথর্ববেদের উপাঙ্গ হইলেও উহার মূল-সূত্র অথবা বীজ, সকল বেদেই আছে। বিশেষতঃ ঋগ্বেদমধ্যে কিছু অধিক আছে। সেই কারণেই বোধ হয়, ব্যাস উহাকে ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুত গ্রন্থ খানি শল্য প্রধান, তাঁহার গুরু ধনন্তরিও শস্ত্রবৈদ্যকের প্রধান উপদেষ্টা ; অথর্ববেদেও শারীরতত্ত্বের প্রাচুর্য্য আছে ; তাই তিনি আপনার উপদেষ্টব্য সৌশ্রুতনামক আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ * বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

মহাভারতলেখক ব্যাসের শাস্তিপর্কের রাজধর্ম পাঠে জানা যায় যে, অত্যন্ত পূর্বকালে চারি শ্রেণীর বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন। “রোগহর” “বিষহর” “শল্যহর” ও “কৃত্যহর”। স্মৃতরাং তৎকালে কায়চিকিৎসা, বিষচিকিৎসা (রোজাদিগের ঝাড়ন ইত্যাদি) প্রভৃতি পূর্ণকভাবেই ছিল, ইহা সহজেই অনুভূত হয়। এখনকার বৈদ্যেরা যেমন কায়চিকিৎসা ভিন্ন শল্যচিকিৎসা করেন না, করিতে ইচ্ছাও করেন না, ব্যাসের সময়েও বোধ হয়, এইরূপই ছিল। তাই তিনি শস্ত্রশাস্ত্রকে অর্থাৎ শল্যচিকিৎসাকে কায়চিকিৎসা হইতে

* সুশ্রুত মুনি “উপবেদ” এই স্পষ্ট কথা না বলিয়া, সূত্র বা ঋগিদ্ধ কথা না বলিয়া, “উপাঙ্গ” বলিলেন কেন ? ইহা যদি বিচার্য্য হয়, উপবেদ ও উপাঙ্গ, এই দুই শব্দের মধ্যে যদি কিছু অর্থভেদ থাকে, তাহা হইলে, তদীয় আয়ুর্বেদ সংহিতাটি অথর্ববেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ প্রধানের (চিকিৎসার) শ্রেষ্ঠ উপকরণ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ উন্নয়ন করা যাইবে না। স্মৃতরাং এতদ্বারাও ব্যাসবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিবার উপায় আছে, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে।

পৃথগুরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং কায়-চিকিৎসা-জ্ঞাপক শল্যতন্ত্রকে ঋগ্বেদের উপবেদ, এইরূপ পারিভাষিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । শল্যচিকিৎসা ও তদুপযোগী শারীরশাস্ত্রকে শস্ত্রশাস্ত্র এবং তাহা অথর্কবেদেরই উপবেদ, এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন । তাহার পরেই হয়ত ঐসকল তত্ত্ব একত্র সংকলিত হইয়া সংহিতাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই তৎকালের আচার্য্যেরা অর্থাৎ স্মৃতি প্রভৃতি তাৎকালিক মুনিরা তাদৃশ সংহিতা, বা তাদৃশ সংগ্রহগ্রন্থকে স্কুলতঃ আয়ুর্বেদ সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন । তৎকালে বোধ হয়, শস্ত্রপ্রধান চিকিৎসা এবল হইয়াছিল, স্মৃতিপ্রোক্ত গ্রন্থখানিতেও শস্ত্রচিকিৎসার বিবরণ কিছু অধিক পরিমাণে উপদিষ্ট হইয়াছিল, তজ্জন্মই বোধ হয়, স্মৃতি মুনির অভিমত আয়ুর্বেদ, অথর্কবেদের উপাদ্ধ বলিয়া খ্যাতিত হইয়াছিল । চরকের সূত্রস্থান অন্বেষণ করিলেও এতদ্রূপ একটী মীমাংসা পাওয়া যায় । যথা,—

“তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্মৃতিচতুর্গাময়কৃসাময়জুবথর্কবেদানাং
কং বেদমুপাশিস্ত্যায়ুর্বেদবিদঃ ?”

চরকেব সূত্রস্থান দেখুন ।

আয়ুর্বেদবেত্তারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ক, — এই চারি বেদের মধ্যে কোন্ বেদ উপজীবন করিয়া (মূলপত্তন বা অবলম্বন করিয়া) উপদেশ করিয়া থাকেন ? যদি কেহ এরূপ প্রশ্নকারী হয়, তবে,—

“তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্গাং ঋকৃসাময়জুবথর্কবেদানাং অনোহথর্কবেদে ভক্তিবাদেশা । বেদোহ্যথর্কণঃ স্বস্তায়নবলিমঙ্গলহোমপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমজ্ঞাদিপরিত্রাহাচ্চিকিৎসাঃ প্রাহ ।”

উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত ভিষক বা চিকিৎসক ঋকৃ, সাম, যজুঃ ও অথর্ক, — এই চারি বেদের মধ্যে অথর্কবেদে আপনার ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন । কেন না অথর্কপ্রোক্ত বেদই স্বস্তায়ন, বলি, মঙ্গল-বিধান, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মজ্ঞাদি উপলক্ষ্য করিয়া চিকিৎসাতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন ।

ভিষক্ অথর্ববেদে ভক্তি থাকার কথা বলিবেন, এ কথার দ্বারা কোনরূপ সূচ্য অর্থ পাওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচনা করুন। ভিষক্ চরক অথর্ববেদে ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন, এ কথার দ্বারা অন্য বেদে অভক্তি করিবেন, এরূপ অর্থ বা এরূপ অভিপ্রায় উদ্ভূত হইয়া যায় না। কেন না অন্য বেদেও আয়ুর্বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। যদিও “যেদোহাথর্বগঃ” এই হেতু প্রদর্শন বাক্যের দ্বারা কায়চিকিৎসা অংশতঃ অথর্ববেদ-প্রসূত এতদ্রূপ বাস্তবিত্য লক্ষ হয় এবং সুশ্রুত বাক্যের সহিত সামঞ্জস্যও হয়, তথাপি, “অথর্ববেদে বলি হোমাদি উপলক্ষ করিয়া চিকিৎসা বলিয়াছেন” এ কথার ভাব বা ব্যাখ্যা অন্যরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য বা নিগূঢ়তথ্য আমরা “আয়ুর্বেদ উন্নতিশীল কি না” এতদ্রূপক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গাত বিচার পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাউক।

বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ঋক্ ও অথর্ব এই উভয় বেদেই আয়ুর্বেদের বীজ বা মূলসূত্র অধিক পরিমাণে নিহিত থাকা দৃষ্ট হইবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ ও আয়ুর্বেদীয় বস্তুতত্ত্ব কোন বেদের কোন স্থানে কিরূপ ভাবে লুক্কায়িত আছে, পাঠকগণকে তাহা আমরা যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছি, দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আয়ুর্বেদীয় জ্ঞান বা বস্তুতত্ত্ব কত পুরাতন।

প্রথম ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের ৯—১১২ মণ্ডলে, সূক্ত ও মন্ত্রে, ভিষক্, চিকিৎসক ধন্বন্তরি ইনি রোগের ব্যবস্থা দাতা, এইরূপ বর্ণনা আছে।

চ্যবন ঋষি জরাজীর্ণ হইলে, অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে ঔষধের দ্বারা যুবা করিয়াছিলেন। যথা,—

“যুবং চ্যবানং অশ্বিনী জরস্তম্

পুনরুবাণং চক্রতুঃ শতীভিঃ ॥”

(১—১১৭—১৩ এবং ৫—৭৪—৫ দেখুন।)

দিবোদাস রাজার রোগ হইলে আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ভিক্ষু তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ ঔষধ আছে, কোথায় ভাল অথবা উৎকৃষ্ট ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন এবং আরোগ্য হইলে পর ভিক্ষু ও রাজা উভয়েই সেই সেই ঔষধের স্তব অর্থাৎ গুণ-বর্ণনা করিয়াছিলেন।

“যত্রৌষধিঃ সমাগমঃ রাজান সমিতাবিব।

বিপ্রাঃ স উচ্যতে ভিক্ষু রক্ষোহা মীব চ্যাতনঃ ॥”

ইত্যাদি ইত্যাদি ১০—২৭—ঋগ্বেদ দেখুন।

জলের দ্বারা রোগপ্রতীকার হয়, জলই ঔষধের যোনিস্বরূপ, কেবল জল-ভূতের দ্বারা ঔষধের কার্য্য করা যায়, এরূপ বর্ণনাও আছে। যথা,—

“অপ্শত্তরমৃত মপ্পু ভেষজং অপামুত

প্রশস্তয়ে। দেবা ভবত বাজিনঃ ॥”

ইত্যাদি ইত্যাদি ঋকের ১—২৩—১৯ মন্ত্র দেখুন।

নানাপ্রকার বনস্পতি, শতমহত্ব ওষধি ও ঔষধবিষয়ক স্তুতি বা বর্ণনাও পাওয়া যায়। যথা,—

“শতং তে রাজন্ ভিষজঃ মহত্মসুর্কী গভীরা শ্রমতিষ্টেহস্ত।

বাধস্ব দূবে নিধতিং পরাটৈঃ কৃতং চিদিনঃ প্রমুখ্যাম্ ॥”

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—২৪—৯ প্রভৃতি মন্ত্র দৃষ্টি করুন।

অনেক ঋক্ মন্ত্রে ওষধির রস, বীৰ্য্য, বিপাক ও প্রভাব ঘটিত বর্ণনা আছে। যথা,—

“অথো হারিদ্ভবেষু মে হরিমাণং নিদগ্ধসি।”

“ইমাং খনাম্যোষধিঃ বীরুধাঃ বলবত্তমাম্।

যযা সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥”

“উত্তানপর্ণে স্তুভগে দেবজুতে সরসতি।

সপত্নীং পরাধমে পতিং মে কেবলং কুরু ॥”

“উত্তরাহমুত্তর উত্তবেদুত্তরাভাঃ।

অথাসপতীযা মম মাধরা সাধরাভাঃ ॥”

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—৫—১২ প্রভৃতি মন্ত্র দেখুন।

কক্ষিবান্, দীর্ঘতমস্, ঔশিজ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির শজ-
বৈদ্যক বা শল্যতন্ত্রনামকীয় জ্ঞান থাকা বর্ণিত আছে। যথা,—

“তস্মাদক্ষী নাসভা বিচক্ষ আধত্তম্ দত্তা ভিষজাথর্কন্ ।”

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—১১৬—১৫ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন।

যাঁহারা আয়ুর্বেদকে আধুনিক বলিয়া প্রতাপন্ন করিতে চাহেন,
তাঁহাদের ভ্রমের ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা বোধ হয়, ঋগ্বেদোক্ত আথর্কণ
শব্দটি দেখেন নাই। না দেখিয়াই তাঁহারা তাদৃশ ব্রথা জল্পনা করিয়া
থাকেন। তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, বৈদিক বস্তু-
সন্দর্ভ অনাদি, পরন্তু তাহার সঙ্কলন অথবা সংহিতাপ্রণয়ন ব্যাসের
সমকালিক। মহাত্মা বেদব্যাসই সেই সেই বেদ বিভাগ করিয়া
সংহিতা নাম দিয়া ছিলেন মাত্র, বস্তুতঃ সকল বেদই তুল্যকালিক।

শুষ্ক জল উপকারক ও বলবর্ণাদির প্রসাদক, ইহা অনেক মন্ত্রে
প্রাপিত আছে। যথা,—

“আপোহিষ্ঠা মযোভুবস্তান উর্জ্জ দধাতনঃ । মহেবধায় চক্ষসে ।”

“যোবঃ শিবভমোরসঃ তস্য ভাজয়তে হনঃ । উশতীরিয মাতরঃ ।”

১০—৯—১ মন্ত্র।

বাস্তোপ্পতি মন্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, গৃহবাটিকায়
ফুল গাছ লাগাইতে হয়, লাগাইলে উপকার হয়। বাস্তুযোগ্য
রক্ষণেও প্রাত্যেক রক্ষের দোষ ও গুণ আছে। এসকল বর্ণনা দেখিলে
কোন্ অভিজ্ঞ না মনে করিবেন যে, ঋক্বেদগদ্যো আয়ুর্বেদাদি উদ্ভিদ
বিচার বীজ আছে! বাস্তোপ্পতিগণ নামক মন্ত্রগুলি ভট্টাচার্য্য
মাত্রেরই জ্ঞাত আছেন, সেই জন্যই আমরা তাদৃশ সুলভপ্রচার সর্ব
বিদিত মন্ত্রগুলি এস্থলে লিখিলাম না।

বর্তমান আয়ুর্বেদে যে ত্রিধাতু বা ত্রিদোষের বর্ণনা আছে, বর্ত-
মান চিকিৎসকেরা যাহাকে বাতপিত্তশ্লেষ্মা বলিয়া থাকেন, তাহাও
ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

উক্ত ধাতুত্রয় সমান থাকিলে সুখ বা অস্বাস্থ্য, অসমান হইলে
 • সুখ বা রোগ, এ কথাও ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে । ভেষজের বা
 ঔষধের দ্বারা ত্রিদোষের প্রশমন হয়, ইহাও ঋগ্বেদে ঋষি জ্ঞাত
 ছিলেন । আমরা বিবেচনা করি যে, ঋগ্বেদের সেই সেই অংশই
 কার্যচিকিৎসার মূল বা বীজ । যথা,—

— “ত্রিনো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্ণিবানি ত্রিরদন্তমস্ত্যঃ ।
 ওমানং শংযোর্মম কাযস্থনবে ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভম্পতী ॥”

১—৩—৬ মন্ত্র ।

ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য এই ত্রিধাতুকে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বলিয়া
 বর্ণন করিয়াছেন এবং উহার সাম্যজনিত সুখই শর্ম্ম শব্দের অর্থ,
 এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা,—

“ত্রিধাতু বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়োপশমনবিদ্যন্তঃ সুখং বহতম্ ।”

পিত্তের সহিত সূর্য্যের, রসের সহিত জলদেবতা বরুণের, শারীর
 বায়ুর সহিত বায়ুদেবতার, সম্পর্ক থাকা বর্ণিত আছে । সে সকল
 বর্ণনা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রৌদ্রের তাপে পিত্তরুদ্ধি হয়,
 জল বা রস উপযোগে রস রুদ্ধি হয়, ঝড়বাত প্রভৃতি সহন করিলে
 শারীর বায়ু প্রকোপ হয় ।

অপিচ, ১০—১৬৩ মন্ত্রে রাজযক্ষ্ম-রোগের বর্ণনা আছে । এত-
 দ্ধিম ফুস্ ফুস্, বুক, উদর, অঙ্গ, মূত্রনাড়ী, কোষ ইত্যাদি ইত্যাদি
 অনেক শারীর-পদার্থও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে ।

(১০—১৬৩) (৬—৫৩—৮) (৩—৩৬—৮)

(৮—১—২৬) (৩—৫০—৬) (১০—১—৮৪) স্পষ্টব্য ।

অমপাকপ্রণালী, তাহা হইতে যে শরীরমধ্যে বায়ু উৎপন্ন হয়
 তাহার প্রসরণ, মাংস, মেদ, স্নায়ু,—প্রসঙ্গক্রমে ও দৃষ্টান্তার্থে
 এ সকল কথাও লিখিত হইয়াছে ।

১০—১৮৬ প্রভৃতি মন্ত দেখুন ।

যে যে স্থানে অন্তের প্রসঙ্গ হইয়াছে, সেই সেই স্থানে “রক্ষোহা” “সপত্নীবাধনম্” “রাজযক্ষ্মণঃ” ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকপ্রকার উল্লেখ ও তৎসঙ্গে ঔষধপ্রভাবের বর্ণনা আছে । (১০—৮৭) (১০—১১৮ । (১০—৪৫) (১০—১৫) (১০—৬২) (১০—১৬৩ , (১০—১৬৪) (১০—১৬৫) (১০—১৬৬) দেখুন । দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঋগ্বেদমধ্যে আয়ুর্বেদের কত পদার্থ লুক্কায়িত আছে । আয়ুর্বেদের বীজস্বরূপ সেই সকল তত্ত্ব যাঁহারা উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা তাহা ঋগ্বেদকে আয়ুর্বেদের মূল বা উপবেদ বলিতে পারেন কি না, তাহা বিবেচনা করুন । এবং ইহাও ভাবিয়া দেখুন যে, আয়ুর্বেদ বা আয়ুর্বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু সকল ঋগ্বেদের ত্রায় অনাদি বা অজ্ঞাত-আদি বলিয়া সিদ্ধ করা যায় কিনা । আমরা এক্ষণে প্রতিজ্ঞা সহকারে বলিতে পারি যে, যদি ঋগ্বেদ অপেক্ষা পুরাতন আর কিছু থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতেও আয়ুর্বেদোক্ত বিজ্ঞান পাওয়া যাইত । যাহাই হউক, সংক্ষেপে ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করা হইল, এক্ষণে দেখা যাউক, অথর্ববেদে কি কি পাওয়া যায় ।

অথর্ববেদ অনুসন্ধান করিলে শারীর ব্যাকরণের অনেক মূল সূত্র পাওয়া যায় । শস্ত্রবৈদ্যকের বীজ স্বরূপ শিরা, প্রাশিরা, অনেক খনিজ পদার্থ, খনিজ দ্রব্যের বীৰ্য্য ও নামবর্গ, গ্রাম্যোষধি ও বন্যোষধি প্রভৃতি অনেক বৈদ্যক-বীজ পাওয়া যায় । যথা, —

“হৃদি হেয আত্মা । অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনং তাসাং শতং শত
মেকৈকস্যা ষাণ্ডতিঃ শাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্তি আশ্ব বানশচরতি” ।

অথর্ববেদোপনিষৎ ।

এবংক্রমে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান ও নাড়ীনির্ণয় প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে ।

“ততোহস্যা এতদশিনো চ সরগতী চ যজ্ঞঃ সমভবন্ গোজামগীঃ ভৈষজ্যায় ।”

গোপথব্রাহ্মণ, ৫, ৩ ।

এই মত্রে ভৈষজ্যবিধির নিমিত্ত নোত্রামণীয়াগ ও তদুপলক্ষে ভৈষজের বীৰ্য্য বর্ণনা আছে ।

অথর্ষবেদসংহিতায় (১ - ১৬) শীতং, (১ - ২৯) গণিঃ, (১ - ৫৫) সুরণং, (২ - ২) জঙ্গিড়ঃ, (৪ - ৬) বিষং, (৪ - ১০) শঙ্খঃ, (৬ - ২৬) পার্থিবানি রজাংসি, (৮ - ৫) প্রাতীসারোমণিঃ, (৮ - ৫) জ্বাক্তোমণিঃ, বরণোমণিঃ, (১০ - ৬) গণিঃ ক্ষত্রস্য বর্দ্ধনম, (১৯ - ২৮) ঔদুম্বরোমণিঃ, (১৯ - ৩১) মৈন্ধবং, (১৯ - ৩৮) দুর্গোমণিঃ - ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভৈষজ্যোপযোগী খনিজ-পদার্থের ও ধাতুর উল্লেখ আছে । স্থানে স্থানে এই সকল পদার্থের বীৰ্য্যবর্ণনাও দৃষ্ট হয় । তাহার পরেই (১৯ - ৩৬, ১৯ - ৪৫)

“অগ্নিন্ মণাবেকশতং বীৰ্য্যানি সহস্রং প্রকাশাঃ ।”

এইরূপ বিস্পষ্ট কথা আছে । ইহা দেখিলে কে না মনে করিবে যে, পূর্বকালের ঋষিরা খনিজ-পদার্থের গুণাগুণ জানিতেন । বীৰ্য্য জানিতেন । বলকারক শক্তি জানিতেন । যদি কাহারও এরূপ সংস্কার থাকে যে, ধাতুখটিত চিকিৎসা তাত্ত্বিক, আয়ুর্বেদবিহিত নহে ; আয়ুর্বেদে কেবল গাছ গাছড়ার চিকিৎসা আছে, ধাতুর দ্বারা চিকিৎসা করার প্রণালী আয়ুর্বেদে নাই ;—তাহা হইলে, সে সংস্কার তাঁহাদের অপনীত হউক । অথর্ষবেদ দেখুন, দেখিলেই জানিতে পারিবেন, উহা কেবল তাত্ত্বিক কি বৈদিক । এক্ষণে প্রসঙ্গাত কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক ।

অথর্ষবেদের (১ - ২৩) (১ - ২৪) (১ - ৩৪) মত্রে বর্ণিত আছে যে, সকল রোগই বহুভঙ্গ, আলস্য, লাম্পট্য ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নরোগও ঐ সকলের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এতদ্ভিন্ন উদরী, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস্থ্যনাশ, শ্লীহা, কেশরোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকার রোগের কারণব্যঞ্জক

উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। রোগপ্রশমনকারী অনেক প্রকার বনস্পতির বর্ণনাও আছে। নিদর্শন যথা,—

“শরঃ শাঃ অঘদ্বিষ্টা দেবজাতা বীকৃচ্ছপথরোপনী।

বজ্রোরজ্জুনকাণ্ডস্য যবস্য তে পলালা তিলস্য তিলোপিষ্ঠা ॥”

“দশ বৃক্ষ মুঞ্চমাং রক্ষসো গ্রাহা।।”

“শং নো দেবী প্রস্মিপর্ণ্যাম্।”

“পাঠামিচ্ছো জলায় ভৈষজ্য।”

“ইদং হিরণ্যং গুগ্গলুঃ।”

ইত্যাদি ইত্যাদি (১-২) (২-৪) (২-৭) (২-৮)
(২-৯) (২-২৫) (২-২৭) (২-৩৩) দেখুন।

অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণের (১-৩০) ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, শারীরিক প্রকৃতির বিপর্যয় হইলেই রোগ হয়, তাহ্নিবারণার্থ বরুণ দেব ভৈষজ্যোপদেশ করিয়াছেন। এই বরুণদেব উত্তম আধ্যাত্মিক চিকিৎসক ছিলেন, সেই জন্যই তিনি আধ্যাত্মিক ভৈষজ্যও উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

“অধ্যাত্মমাত্মভৈষজ্যম্। আত্মকৈবল্যমোক্তকারণঃ।

আত্মানম্ নিরুধ্য সঙ্গমমাত্মীং ভূতার্থচিত্তাং চিস্তয়েৎ ॥”

ইত্যাদি প্রকরণ দেখুন।

এইরূপ স্থানে স্থানে অনেক কথা আছে। অথর্ববেদের গর্ভোপনিষদে শুক্রশোণিতের উৎপত্তি, গর্ভব্যাকরণ, শারীর-ব্যাকরণ, অস্থি প্রভৃতি শারীরপদার্থের সংখ্যা ও সংস্থান, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপদেশ আছে। অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্রবৈদ্যকের অংশ বিশেষও পাওয়া যায়। পুরাতন আর্যেরা যজ্ঞকালে পশুবধ করিতেন। মারিত-পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ অবদান অর্থাৎ কর্তন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। সেই সেই স্থানে, যে প্রকার অবদান-বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেসকল বর্ণনা শাস্ত্রবৈদ্যক জানা

না থাকিলে অসম্ভব হইয়া পড়ে । ফল, অর্থর্ষবেদেই প্রচুর পরিমাণে আয়ুর্বেদের মূল সূত্র পাওয়া যায় । এক্ষণে দেখা যাউক, যজুর্বেদে কিছু আছে কি না । (ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদ ও উহার উদ্দেশ্য ।

শরীর-জীবয়োর্যোগে। জীবনম্ তদবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুরিতি ।

ভাবপ্রকাশ ।

— তস্য হিতাহিতং ।

মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃ স উচ্যতে ॥

চরক ।

যে শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইবে, সেই শাস্ত্র কি ও উহার উদ্দেশ্যই বা কি, অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক । অতএব আমরা আয়ুর্বেদ ও উহার উদ্দেশ্য শীর্ষক প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম ।

যত কাল পর্য্যন্ত শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ, সেই কালকে আয়ুঃ * বলা যায়, সুতরাং জীবনের আরম্ভ হইতে উহার সমাপন পর্য্যন্ত আয়ুঃ শব্দের বাচ্য । এই আয়ুঃ বা জীবনবাহি-কালকে সুখময় করিবার জন্য উহার হিতকর কি, অহিতকরই বা কি, পরিমাণ কত এবং ধরূপই বা কিরূপ এই সকল দুজ্ঞেয় বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা করা যায় তাহাই আয়ুর্বেদ † ।

* আয়ুঃশব্দে ইহা মোটামুটি লক্ষণ । বিস্তৃত লক্ষণ, পরিমাণ ও ধরূপ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ু-তত্ত্ব নামক প্রবন্ধে বিবৃত হইবে ।

† আয়ুর্বেদ একটি যৌগিক শব্দ (আয়ুঃ + বেদ) বিদ্যুৎ দাতুর অর্থ জ্ঞান, লাভ বা বিদ্যমানতা । সুতরাং যদ্বারা আয়ুঃ বিষয়ে জ্ঞান হয়, কিংবা আয়ুঃ লাভ হয় অথবা আয়ুঃ বিষয় যে শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে তাহাই আয়ুর্বেদ । আয়ুরশ্মিনু, বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্বিদ্যতেত্যয়ুর্বেদঃ । স্মৃতি ।

অনেন পুরুষো যদ্বাদায়ুর্বিদ্যতি বেত্তি বা । তস্মান্মুনিবট্টেরেষ আয়ুর্বেদ ইতি স্মৃতঃ ।

ভাবপ্রকাশ ।

অপরূপ জ্ঞানি তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসাশাস্ত্রের তৈমজ্য-
শাস্ত্র (Medical Science) ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন ।
কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুচিকিৎসকগণ ঐক্য সংজ্ঞা পর্য্যাপ্ত বোধ করেন
না, কেন না কেবল রোগ বা ঔষধের তত্ত্ব আলোচিত হইলেই
শরীর, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য সম্পাদিত হইতে পারে না । উহার
সহিত ধর্মভাব চাই, বিশুদ্ধ নীতির আচরণ চাই । মনে কর
তোমার শরীর বিলক্ষণ সবল, প্রচুব আহার ক্ষম, কোন প্রকার
রোগের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তুমি ধর্মভাব বিসর্জন দিয়া হিংসাদি-
রত এবং নীতিমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপ বাসনে আসক্ত,
এইরূপ জীবনে তোমার আত্মার শান্তি কোথায়, চিন্তেরই বা
প্রায়তা কোথায় ? সুতরাং তোমার প্রকৃত স্বাস্থ্য কিরূপে বলিব ?
অতএব হিন্দুচিকিৎসকগণ ধর্ম, নীতি ও সদাচার ইত্যাদির সহিত
সামঞ্জস্য রাখিয়া ঔষধ ও রোগের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন ।

দেহ, আত্মা ও মনঃ এই তিনটির যোগের উপরে জীবনের
শ্রোত নির্ভর করিতেছে । এই তিনটির যোগ যাহাতে হিতময় ও
সুখময় হয়, আমাদের আয়ুর্বেদের তাহাই লক্ষ্য । যাহাতে
দেহ সমদোষ, সমাগ্নি ও সমধাতু হয়, আত্মা ও মনঃ
প্রসন্ন থাকে, মনুষ্য-সম্বন্ধে আমরা তাহাকেই স্বাস্থ্য বলি ।
দেহ, মনঃ, আত্মা এই সকলের যোগ-সামঞ্জস্য-বিধান করা
আয়ুর্বেদের লক্ষ্য বলিয়া আয়ুর্বেদশাস্ত্র দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান
ও আধ্যাত্মিকবিজ্ঞানের উপর সমভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে । যখন
দেহ ব্যতীত মনঃ থাকিতে পারে না, মনঃ ব্যতিরেকে দেহের স্বতন্ত্র
উৎপত্তি নাই, আবার দেহ, মনঃ ব্যতীত আমাদের আত্মানুভূতি
হইতেছে না । তখনই তিনে এক, এবং একে তিন ইহা কে না
স্বীকার করিবে ? দেহ, মনঃ, আত্মা তিনই যখন এককে লক্ষ্য করিয়া
অবস্থান করিতেছে, একের হিতাহিত যখন তিনেরই হিতাহিত,

তখন দেহের পুষ্টি এক, এবং মনের তুষ্টি আর ইহা কখনই হইতে পারে না । কাম ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইলে, যখন দেহের রক্তশ্রোত, বায়ুশ্রোত, জলশ্রোতাদি বিকৃত হয় ; যখন বাহিরের পদার্থ দেহে প্রবিষ্ট হইলে, আবার মনঃশ্রোতঃ পরিবর্তিত হয়, তখন একমাত্র জড়শক্তির প্রাধান্য বিবেচনা করা স্থূলবুদ্ধির কার্য্য । ইহার মধ্যে কেহ প্রাধান, কেহ অপ্রাধান নয়, সকলেই সমভাবে একের দিকে অগ্রসর হইতেছে ।

কোন কোন জাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে কেবল ভৈষজ্যের আড়ম্বর দেখিয়া বোধ হয়, যে মনুষ্যের মধ্যে মনঃ বা আত্মা কিছুই নয়, কেবল ভৈষজ্যতত্ত্বের উপর জীবের পরমায়ু অবলম্বিত রহিয়াছে । মনঃ রাগ, ঈর্ষ্যা বা শোক কর্তৃক বিলোড়িত হইতে থাকুক, আত্মা পাপভরে গ্লানি বোধ করিতে থাকুক ; যদি দেহে বল থাকে, দেহের হস্ত পদাদি কিছুমাত্র না ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, আহার ও মৈথুন-শক্তি যদি অব্যাহত থাকে, তবে তাহাই তাহাদের মতে স্বাস্থ্য । আহার, বিহার, মৈথুন ব্যতীত পশুগণ যেরূপে অপর কোন বিষয়ে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না, মনুষ্যের পক্ষে সত্য সত্যই যদি তাহাই হইত, তবে মনুষ্যত্বের বিশিষ্টভাব কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেক ?

আয়ুর্বেদ বেদপ্রসূত, বেদের ন্যায় সর্ববিশ্বাসকতা ও সর্বজ্ঞতা আছে বলিয়া আমরা ইহাকে বেদের অংশ বলিয়া থাকি । জগতে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, আয়ুর্বেদে সেই সমুদয় প্রণালীই নিহিত রহিয়াছে । সদৃশ চিকিৎসা-প্রণালী (Homeopathic) বিরোধি-চিকিৎসা-প্রণালী (Allopathic) জলচিকিৎসা প্রণালী (Hydropathic) প্রভৃতি সমুদায়ই আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত । অপরূপ জাতির চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণালীভেদে অভিহিত হইয়া থাকে, বোধ হয় যেন সমুদয় জীৱন-শ্রোতঃই সেই প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, পরন্তু

আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র সকলকেই সম-দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া দেখা, কাল, পাত্র বিবেচনায় সকলকেই মানবায়ুর অনুকূল করিয়া লয় । এক আয়ুর্বেদই সমুদায় চিকিৎসা-প্রণালীর সম্মিলন বা সংক্ৰমণকৃত । ভূত-প্রোত পিশাচ প্রভৃতির রোগ কি প্রকারে উপশমিত হয়, হস্তাবমর্শ দ্বারা কি প্রকারে ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়া থাকে, জলের অমৃতত্ব ও অগ্নির দাহিকা শক্তি কোন্ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয়, কোন্ ক্ষেত্রেই বা বিষ দ্বারা বিষ চিকিৎসিত হয়, কোন্ পাত্রেই বা বিষম চিকিৎসা প্রযোজ্য ইত্যাদি আধুনিক জগতের সমুদয় নবীন তত্ত্ব অতি পুরাতন কাল হইতেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে । যেমন পার্থিব ওষধি, বনস্পতি, মৎস্য, মাংস, স্বর্ণ, প্রস্তর, অম্মাদি সমস্তই মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের সাত্ব্যাত্মা গুণে স্ব স্ব শক্তি বিসর্জন দিয়া মানবশক্তির বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্রই এই আয়ুঃস্রোতে লয় পাইয়া আয়ুর্বেদের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করিতেছে । যেমন একই বেদ হইতে স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্র বিনিঃসৃত হইয়াছে ; যেমন একই সমুদ্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল, রত্ন, পশু, কাঁট, রক্ষ পর্য্যন্ত সকলে একত্রে সমবেত হইয়া একেরই উদ্দেশ্যের মার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, তদ্রূপ এই আয়ুর্বেদ-সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন মত সমাবিষ্ট হইয়া একই উদ্দেশ্যে প্রয়োজিত হইতেছে ।

আয়ুর্বেদ কি এবং বিজাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অপেক্ষা আমাদের আয়ুর্বেদ কোন্ অংশে বিভিন্ন ইহা এক প্রকার বলা হইল । এক্ষণে দেখা যাউক উহার উদ্দেশ্য কি ? সূক্ষ্মত বলেন—

‘ইচ্ছায়ায়ুর্বেদ-প্রয়োজনম্ ব্যাধুপশ্রুতস্য ব্যাধি পরিমোক্ষঃ
স্বস্থসা রক্ষণঞ্চ ।’

অর্থাৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ মোচন এবং সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা আয়ুর্বেদের প্রয়োজন । সুতরাং কোন প্রকার রোগ উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণ করা এবং অনুপস্থিত রোগের

হস্ত হইতে পরিভ্রাণ করিয়া আগাদিগকে সুস্থ ও সুখী করা ভিন্ন
 • আয়ুর্বেদের অন্য প্রয়োজন নাই । ফলতঃ পুরুষের বা ব্যক্তির স্বাস্থ্য-
 সুখ বিতরণ করাই উহার চরম উদ্দেশ্য । পুরুষ ধর্ম, অর্থ, বিষয়, বিভব
 প্রভৃতি যাহাই অশ্বেষণ করুন, শরীর প্রকৃত সুস্থ না হইলে ঐ সকল
 কে উপভোগ করে ? অসুস্থ সত্ত্বাটের নিকটে সমাগরা পৃথিবীও
 শ্মশানভূমি । নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুরুষই কর্তা, পুরুষই ভোক্তা,
 পুরুষই সুখী, পুরুষই দুঃখী, পুরুষই জ্ঞানী । বিগ্ন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে
 পুরুষই বিষয়ী, আর সমুদয় তাঁহার বিষয় বা উপকরণ ।

‘ তত্র পুরুষঃ প্রধানঃ তস্যোপকরণমনাৎ ।’

রক্ষ সকল যে সৃষ্টি ফল ধারণ করিতেছে, রক্ষ উহার আশ্রয়
 জানে না ; পুষ্প সকল যে পবন শোভন-ভাবে বিরাজ করিতেছে,
 পুরুষ বিনা কেহই এ মাধুরী অবগত নহে । মণি, মুক্তার মধ্যে যে
 রমণীয় কাস্তি নিহিত রহিয়াছে ; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে
 মনুষ্যের উপকার সাধিত হইয়া থাকে, উহারা নিজের রহস্য কেহই
 অবগত নহে । পরন্তু পুরুষ সকলের কথাই অবগত আছেন ।
 ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু দ্রব্য-শক্তি আছে, পুরুষ সর্কগুণাধার বলিয়া,
 সকলের গুণ সাত্ব্যভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন । এ কারণ ওষধি
 বনস্পতি, প্রস্তর, ধাতু, কীট, পতঙ্গাদি জগতে যাহা কিছু আছে,
 সকলই মনুষ্যের উপকরণ । মানব-শরীরের রক্ষার্থ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের
 আয়োজন করিতে হয়, মানবের সহিত সহানুভূতি আছে বলিয়া
 সমুদায় পদার্থ মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব গুণ শক্তি বিসর্জন
 দিয়া মানবের শক্তি সকলকে বর্দ্ধন করিয়া থাকে । দ্রব্য যে রস,
 বিপাক বীৰ্য্যাদি আছে, মানবেই তাহাদের সম্পূর্ণ বিকাশ অনুভূত
 হয় । অতএব পুরুষ নিরাময় দেহে জগতের সমগ্র নির্মল সুখ যাহাতে
 উপভোগ করিতে পারেন, আয়ুর্বেদের ইহাই চেষ্টা, এই কারণেই
 আয়ুর্বেদের সৃষ্টি এবং এই কারণেই আয়ুর্বেদের উপাসনা বা চর্চা ।

আয়ুর্বেদের অঙ্গ-বিভাগ ।

“ততোহুপায়ুর্ষ্টমপ্যমেধস্বধাবলোক্য নরাণাং

ভূয়োহৃচ্ছা প্রণীতবান্ ।”

স্মৃতি ।

মহর্ষি স্মৃতি বলেন, অতি পূর্বে ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ নামক লক্ষ-
শ্লোকময় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎপরে মানবগণের
অল্প আয়ু ও অল্প মেধা অবলোকন করিয়া উহাকে আট অংশে বিভক্ত
করেন । চিকিৎসাশাস্ত্র অপার সমুদ্র বিশেষ । উহার সমগ্র অংশের
তত্ত্ব হওয়া অন্নাযু ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির শিক্ষার অতীত । এমন কি
এক স্বরোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার তত্ত্ব, প্রকার-
ভেদ, চিকিৎসা প্রভৃতি একজন লোক আজীবন চেষ্টা করিয়াও
শিক্ষা করিতে সমর্থ নহেন ; যেহেতু উহা কাল-সহকারে নূতন
আকারে ও নূতন প্রকারে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাব প্রকৃত
নির্দ্ধাবণে কত গবেষণার প্রয়োজন । ঐ যে ওলাউটা রোগে
কত দেশ উৎসন্ন-প্রায় হইল, উহার উৎপত্তি-কারণ, প্রকৃপ ও
চিকিৎসা প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য কত দেশের কত চিকিৎসক
কত কাল অনুসন্ধান করিলেন, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া
কত পরীক্ষাই করিলেন, কত কামিননই বসিল, তথাপি এ পর্য্যন্ত
কি করিতে পারিয়াছেন ? ঐরূপ বিষ-চিকিৎসা সম্বন্ধে একাল
পর্য্যন্ত কত অনুসন্ধান হইল, কত দেশ হইতে কত বিষধর সর্প
আনীত হইল, কত পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি হইল, তথাপি
অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে একপদও অগ্রসর হইল না । যখন চিকিৎসা
শাস্ত্রের এমন দুর্লভ অবস্থা, তখন সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র একব্যক্তি সুন্দর-
রূপে শিক্ষা করিতে পারিবে ইহা কখনই সম্ভব-পর নহে । তজ্জন্য
অগাধ-ধী ঋষিগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভাগার্থ এবং শিক্ষা বিধানের
সৌকর্য্যার্থ উহাকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের

প্রতি তাঁহাদের দুৰূহ জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বহুজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপদে এমন সকল দুজ্জের বিষয় নিহিত রাখিয়াছে, তাহাতে আমাদের বোধ হয়, উহা আট অঙ্গ কেন, আটশত অঙ্গে বিভক্ত হইলেও এবং উহার এক একটী বিষয় পরীক্ষা ও চিন্তা করিয়া আজীবন অতিবাহিত করিলেও এই বিদ্যা প্রগম্ন হইবে কি না বলা যায় না।

সুশ্রুত মুনি আয়ুর্বেদকে যে অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত করেন, সেই অঙ্গগুলির নাম যথা,—শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভূতা, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র।

১। শল্যতন্ত্র— চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অঙ্গ অধ্যয়ন করিলে বিবিধ ত্বণ, কাষ্ঠ, পাষণ, ভস্ম, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, পুষ্পাশ্রাব, গর্ভ-শল্য (মৃতজ্ঞাণাদি) ইত্যাদি উদ্ধরণার্থ যন্ত্র, অস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি প্রভৃতির প্রয়োগ এবং ত্রণাদি নিরূপণের বিষয় সম্যকরূপে শিক্ষা করা যায়, তাহাকে শল্যতন্ত্র কহে।

২। শালাক্যতন্ত্র—চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অঙ্গে উর্দ্ধজত্রগত অর্থাৎ শ্রোত্র, নেত্র, মুখ, নাসিকাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাধি-সমূহের উপশমের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাকে শালাক্য কহে।

৩। কায়চিকিৎসা—আয়ুর্বেদের যে অঙ্গে জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি সার্বক-

১। তত্র শল্যং নাম বিবিধত্বণকাষ্ঠপাষণ-পাণ্ডু-লৌহ-লোষ্ট্রাস্থি-বাল-নখ-পুষ্পাশ্রাবাভ্যর্গর্ভ-শল্যাধিকরণার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিশ্রনিধানত্রণাবনিশ্চয়ার্থঞ্চ।

২। শালাক্যং নাম উর্দ্ধজত্রগতানাং রোগাণাং শ্রবণ-নয়ন-বদন-জ্ঞানাঙ্গ-সংশ্লিষ্টানাং ব্যাধীনামুপশমনার্থম্।

৩। কায়চিকিৎসা নাম সার্বক-সংস্থতানাং ব্যাধীনাং জ্বর-অতিসার-রক্তপিত্ত-শোষোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠমেহাদীনামুপশমনার্থম্।

দিক রোগের শাস্তির বিষয় বিবৃত আছে,
তাহাকে কায়চিকিৎসা কহে ।

৪ । ভূতবিদ্যা—আয়ুর্বেদের যে অঙ্গে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, পিতৃ, পিশাচ, নাগ ও গ্রহাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আরোগ্যার্থ গ্রহোপশম, শাস্তি-কর্মা, বলিদানাদি লিখিত আছে, তাহাকে ভূতবিদ্যা কহে ।

৫ । কৌমারভূত্য—বালকের পোষণ, ধাত্রীর দুগ্ধের দোষ-সংশোধন এবং স্তন্যদোষ ও গ্রন্থদোষ সমুৎপন্ন ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা আয়ুর্বেদের যে অঙ্গের উদ্দেশ্য, তাহাকে কৌমারভূত্য কহে ।

৬ । অগদতন্ত্র—সর্প, কীট, লুতা, বৃশ্চিক, মূমিকাদি দংশন-জনিত বিষের লক্ষণ, বিবিধ বিষ এবং সংযোগ-বিষ (সমান স্বা৩ মধু ইত্যাদি) দ্বারা উপহত প্রাণীর বিষোপশম আয়ুর্বেদের যে অঙ্গে বিবৃত আছে, তাহাকে অগদতন্ত্র কহে ।

৭ । রসায়নতন্ত্র—আয়ুর্বেদের যে অঙ্গে বয়ঃস্থাপন, আয়ু, মেধা ও বল বৃদ্ধির উপায় এবং রোগাপহরণের বিষয় বিবৃত আছে, তাহাকে রসায়নতন্ত্র কহিয়া থাকে ।

৪ । ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষঃ-পিতৃ-পিশাচ-নাগ-গ্রহা-দ্বাপন-চেষ্টা-শাস্তিকর্মা-বলিহরণাদি-গ্রহোপশমনার্থম্ ।

৫ । কৌমারভূত্য নাম কুমারভরণধাত্রী-ক্ষীরদোষ-সংশোধন-দুগ্ধস্তন্য-গ্রন্থসমুখানাক্ষ-ব্যাধীনামুপশমনার্থম্ ।

৬ । অগদতন্ত্র নাম সর্প-কীট-লুতা-বৃশ্চিক-মূমিকাদি-দষ্ট-বিষবাজন-বিবিধ-বিষ-সংযোগ-বিষোপহতোপশমনার্থম্ ।

৭ । রসায়নতন্ত্র নাম বয়ঃস্থাপন-আয়ুর্মেধাবলকরণ-রোগাপহরণসমর্থকম্ ।

৮। বাজীকরণতন্ত্র — আয়ুর্বেদের যে অঙ্গ অঙ্গ, দৃষ্ট, বিশুদ্ধ ও ক্ষীণ শুক্রের আপ্যায়ন, প্রসাদন ও উপচয় নিমিত্ত ঔষধ, শুক্রদোষ সংস্করণ এবং রতিশক্তি বর্দ্ধনের বিষয় শিক্ষা দেয় তাহাকে বাজীকরণতন্ত্র কহে ।

আবশ্যক মতে এই অষ্টাঙ্গের আরও প্রত্যঙ্গ বিভাগ করা যাইতে পারে । আবার ঐ অঙ্গ গুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া তিনটি প্রধান অংশে স্থাপন করা যায়, শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় এই এক একটি অংশকে বৃহ, কাণ্ড বা স্কন্ধ কহে । তদনুসারে আয়ুর্বেদ ত্রিকাণ্ড । যথা,—হেতুকাণ্ড, লক্ষণকাণ্ড এবং ঔষধকাণ্ড । স্থানান্তরে এই বিষয়ের বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইবে ।

৮। বাজীকরণতন্ত্রং নাম অঙ্গ-দৃষ্ট-বিশুদ্ধ-ক্ষীণরোতসামাপ্যায়ন-প্রসাদোপচয় জনন-নিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থকং ।

শল্য প্রভৃতি নাম গুলির ব্যুৎপত্তি-লক্ষ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিয়ে লিখিত হইল ।
শল্যতন্ত্র—শল্য অর্থাৎ অস্ত্র, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র কিংবা শল্য = অন্তর্নিহিত ভ্রূণকাষ্ঠাদি, তদাহরণার্থ শাস্ত্র শল্য-তন্ত্র ।

শালাক্য তন্ত্র — শালাক্য পটলবেধক অস্ত্রবিশেষ, তৎপ্রধান অঙ্গ শালাক্য ।

ভূতবিদ্যা—ভূতবিষয়ক বিদ্যা ।

কৌমারভূত্যা—কুমারগণের ভরণ এবং পোষণ-বিষয়ক বিদ্যা ।

কায়চিকিৎসা—‘কায়স্যাস্তরগেচ্চিকিৎসা’ (চক্রপাণি) কায় = অগ্নি, তাহার চিকিৎসা । এই নামের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগ অগ্নির বিকৃতি বশতই সচরাচর জন্মিয়া থাকে, সুতরাং সেই সকল বোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে অগ্নির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবেক ।

অগদ তন্ত্র—অগদ = নানাপ্রকার বিষ-নাশক ঔষধ, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ।

রসায়ন তন্ত্র—রস = রসরক্তাদি, অযন = আপ্যায়ন বা বৃদ্ধি, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ।

বাজীকরণ তন্ত্র—বাজি = অশ্ব অথবা শুক্রধাতু । যদ্বারা রতিকালে অশ্ববৎ বল লাভ করা যায় অথবা, প্রচুর পরিমাণে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাই বাজীকরণ, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ।

ক্রীজ =

রোগ ও রোগের বিভাগ ।

“তদুঃখ-সংযোগা ব্যাধয় ইতি”

সুশ্রুত ।

“বিকারো ধাতু-বৈষম্যং——।”

“——বিকারো দুঃখমেবচ ॥”

চরক ।

পূর্বে বলা গিয়াছে রোগ-প্রতিকার আয়ুর্কর্মেদের একটি উদ্দেশ্য ।
অতএব রোগ কি, এবং মহর্ষিগণ রোগের কিরূপ বিভাগই বা
প্রদর্শন করিয়াছেন, এই দুইটি বিষয় প্রস্তাবিত প্রবন্ধের আলোচ্য ।

রোগ কি ? ইহার স্পষ্টজ্ঞান প্রায় সকলের মনেই নিহিত আছে ।
কেন না, প্রায় সকল রোগেই কোন না কোন প্রকার যাতনা অনুভূত
হয় । রোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথচ যন্ত্রণা-বোধ নাই, এমন রোগ
বিরল, এবং কখন কোন রোগ ভোগ করেন নাই, এমন লোকের
সংখ্যাও অতি অল্প । সুতরাং রোগ বলিলেই আমাদের স্পষ্টতঃ বোধ
হয় যে, কোন প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু এই প্রকার
জ্ঞান মোটামুটি অনুভবমাত্র । ইহা দ্বারা কোন রোগেরই প্রকৃত
স্বরূপ-নির্ণয় করা যাইতে পারে না । যেহেতু অরের যে আকার,
উদরাময়ের সেরূপ আকার নহে ; উদরাময়ের সেরূপ আকার,
আবার অর্শ-রোগের সেরূপ আকার নয় । এক রোগও নানা-
প্রকার আকার ধারণ করে । অনেক রোগও একপ্রকার আকারে
আবির্ভূত হয় । কতকগুলি রোগের বা আকার স্পষ্টতঃ প্রকাশই
পায় না । এই সকল কারণে রোগনির্ণয় এত দুষ্কর ব্যাপার ।
এবং এই হেতু বশতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অনেক মত-ভেদ
লক্ষিত হয় ।

পরন্তু রোগের আকারাদিগতপার্থক্যপ্রভৃতি থাকিলেও এমন অনেক

শুলি ধর্ম আছে, যাহা প্রায় সকল রোগেই বর্তমান থাকে। সেই ধর্ম গুলিকে সাধারণ ধর্ম বলে। সেই সাধারণ ধর্ম লইয়া ঋষিগণ সমুদয় বোগের ব্যাপক-লক্ষণ নির্মাণ করিয়াছেন। প্রস্তাবেব মুকুটে যে তিনটি সূত্র-বিন্যাস করা হইয়াছে, উক্ত তিনটি সূত্রই রোগের সাধারণ-স্বকপ-বোধক অথবা রোগেব সাধারণ'ধর্ম বা লক্ষণ-জ্ঞাপক। উহাদের ব্যাখ্যা বুঝিলেই আগম ঋষি-গণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিব। উক্ত সূত্রের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়, এই দুটির অর্থ এই যে, “যাহা দ্বারা পুরুষে বা ব্যক্তিতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাই রোগ” সূত্রাৎ দুঃখজনক মাত্রই রোগ বলিয়া গণ্য। কথ্যটি সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহার অর্থ বহুদূর ব্যাপক, এমন কি, অধ্যাত্ম-প্রকরণ পর্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। কেননা জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি দেহের স্বাভাবিক ব্যাপার সমস্তও রোগেরই অন্তর্ভূত। যেহেতু ইহাদের দ্বারা পুরুষে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, সে দুঃখের অভিঘাতে পুরুষ সদাই জর্জরিত ও সর্বদাই ব্যাকুল। অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাদের নিকটে স্বরপ্রভৃতি বোগসমূহকে অতি সামান্যই মনে করেন। তাঁহারা বলেন, অবাধি রোগ লৌকিক চেষ্টাতেই প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি স্বাভাবিক রোগ সমূহ সামান্য মানবের সামান্য চেষ্টার আয়ত্ত নহে। তুমি যত বড় পণ্ডিত, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় চেষ্টা-শীল হও না কেন, স্বাভাবিক রোগের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। শৈশবের পশ্চাদ্গামিনী জবা তোমাকে আক্রমণ করিবেই,—জন্মেব সহচর মৃত্যুও তোমাকে নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। প্রকৃতির এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম সামান্য মানবের অলঙ্ঘনীয়। যাহা হউক, পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয় দ্বারা এই বুঝায় যে, মানবের যে কোন প্রকার দুঃখদায়ক অবস্থা উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ তাহাকেই ব্যাধিসংজ্ঞা প্রদান করিতেন।

কিন্তু আমরা সাংসারিক ও ঘোর বিষয়ী, ঐহিক সুখই আমাদের সর্বস্ব । ঋষিগণেব নিকট সংসার বিষময় হইলেও আমাদের নিকট অমৃতের প্রাপ্তবণ । ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাহাদের বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে রোগ বলিয়া গণ্য হইলেও, আমাদের প্রাণনীয় সুখ । সুতরাং এতদুব ব্যাপক লক্ষণ এক্ষণে আর আমাদের মনঃপুত হয় না । এই কারণে আর একটি সূত্র প্রথমোক্ত সূত্রদ্বয়ের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে । উহার অর্থ এই যে “ধাতু গণেব বৈষম্যই রোগ” শরীরের বিধান, ধারণ, বা পোষণোপযোগী পদার্থ মাত্রই ধাতু । সুতরাং শরীরের উপাদান বা জীবক সমুদয় দ্রব্যকেই (রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থ এবং যক্ষ্ম-প্লীহাদি যন্ত্রমাত্রকেই) ধাতু[১] বলা যায় । তাহাদের যে কোন রূপ বৈষম্য [২] বা অন্যথা ভাব হইলেই রোগ ।

এইকথাগুলিকে প্রকারান্তরে এইরূপে বলা যাইতে পারে । জীবিত শরীরে যে সকল যন্ত্র, যে ভাবে থাকিয়া, যেরূপ কার্য

[১] শরীরে দধাতি, বিধতে ধাবযতি পুষ্যাতি বা ইতি ধাতুঃ ।

[২] বৈষম্যশব্দে উল্লিখিত পদার্থসকলের দ্রব্যগত, গুণগত ও ক্রিয়াগত হ্রাস অথবা বৃদ্ধি এবং যন্ত্রাদির নিষ্কাশনগত অনাথা ভাব বুদ্ধিতে হইবে ।

কোনওমতে অন্যথাভাব ৪ চারিপ্রকার । যথা—

১—প্রকোপ, ২—আশ্রাপকর্ষ, ৩—হীনতা, ৪—বহুলতা ।

১ প্রকোপ । এস্থলে প্রকোপশব্দে বাতপিত্তাদির রুদ্ধতা ভীকৃত প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ গুণ সকলের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ।

২ আশ্রাপকর্ষ । কোনও তরল অথবা লঘুপদার্থ, অর্থাৎ শরীরগত বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, রক্ত, প্রভৃতি পদার্থের কোন একটি ধাতু, বলবান্ অন্য ধাতুর আকর্ষণে স্বকীয় আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতভাবে অন্য আশ্রয়ে গমন করার নাম “আশ্রাপকর্ষ” ।

৩ হীনতা । এস্থলে হীনতা শব্দে দ্রব্যগত হ্রাস ।

৪ বৃদ্ধি । এস্থলে বৃদ্ধি শব্দে দ্রব্যগত পরিমাণাধিক্য ।

করিতেছে, এবং যে যে পদার্থ, যতখানি পরিমাণে ও যে ভাবে থাকা আবশ্যিক, তাহার বিকৃতিকে রোগ কহে ।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা শারীরিক রোগের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাওয়া গেল, কিন্তু মানসিক রোগের বিষয় অস্পষ্ট রহিল । অথচ, শারীর ধাতুর বৈষম্যবশতঃ যেমন জ্বর প্রভৃতি জন্মে, মানস ধাতুর বৈষম্যবশতঃ তেমন উন্মাদ, মূৰ্ছা, কাম, ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে । শারীর-রোগের চিকিৎসা করা, আয়ুর্কৌদের যেমন একটি লক্ষ্য, মানসিক রোগের চিকিৎসা করাও তেমন আর একটি লক্ষ্য । সুতরাং মানসিক রোগের বিষয়ও এস্থলে স্মরণতঃ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক । পরন্তু, পাঠকগণ ধাতুগণের আরও একটি অর্থের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই, মানসিক রোগের স্বরূপও সামান্যাকারে জানিতে পারিবেন । ধাতু শব্দে যেমন শারীরিক ধাতু রসপ্রভৃতি বুঝায়, তেমন মানসিক ধাতু সত্ত্বগুণপ্রভৃতিও বুঝায় [৩] এই সত্ত্বপ্রভৃতির বৈষম্য বশতই উন্মাদাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে । সুতরাং ধাতুবৈষম্য বলিলে, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগেরই লক্ষণ উপস্থিত হইতেছে ।

উক্ত কথাগুলির বিবৃতি এই—আমাদিগের শরীরে আগাশয় (যে যন্ত্রে আহারীয় দ্রব্য প্রথমে উপস্থিত হয়), পকৃশয় (ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশগুলি যে যন্ত্রে গিয়া মূত্র ও মলরূপে পরিণত হয়) এবং রক্তাশয় প্রভৃতি যন্ত্র সকল, নিরন্তর আপন আপন কার্য্য করিতেছে । আহারীয় দ্রব্য হইতে রস, তাহা হইতে রক্ত, তাহা হইতে মাংস ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া শারীরিক পদার্থ সকলের ক্ষতি, পূরণ ও পুষ্টিসাধন করিতেছে । বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ শারীর-

[৩] “ধাতবো বাতাদয়ঃ রসাদয়শ্চ, তথা রজঃপ্রভৃতয়ঃ ।”

[চক্রপাণিকৃত টীকা]

পদার্থ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ মানস পদার্থ, আপন আপন সিরী ও ধমনী প্রভৃতি পথে গতাগতি করিয়া জীবনক্রিয়ার সহায়তা করিতেছে ; এই নিমিত্ত আমরা সচ্ছন্দ শরীরে ও সুস্থ মনে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছি এবং বাল্য হইতে যৌবনে, তাহা হইতে প্রৌঢ়তায় এবং তাহা হইতে বৃদ্ধাবস্থায় নীত হইতেছি । কিন্তু এই সকল পদার্থের ও এই সকল কার্যের কোনরূপ অন্যথাভাব ঘটিলেই আমরা পীড়িত বা রোগগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হই ।

জগতের বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদের শরীর ও মনের নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে । জল, বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার, বাগ্‌বিত্তপ্রভৃতি বাচনিক ক্ল্যুৰ্য্য, কাম ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অথবা চিন্তন, অনুধ্যান ইত্যাদি মানসিক ব্যাপার, আমাদের আত্মা ও শরীরের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে । ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও ঘটনার অনুষ্ঠান, বিবিধ কারণে প্রয়োজনমত হইয়া উঠে না । কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত কদাপি বা প্রয়োজনাপেক্ষা ন্যূন হইয়া যায় । এই নিমিত্তই আমাদের জীবিত শরীরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঘটনাগুলির অন্যথা ভাব ঘটয়া তাহা “রোগ” নামে পরিগণিত হইয়া থাকে ।

বিষমতা প্রাপ্ত বাত পিত্তাদি হইতেও কতকগুলি রোগের উৎপত্তি হয় । ঐ রোগগুলিকে দুইভাগ করা যাইতে পারে । যথা অমিশ্র ও মিশ্র রোগ ।

বাতের প্রকোপাদি জন্য যে রোগগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে বাতজন্য অমিশ্র রোগ বলা যাইতে পারে । পিত্তের প্রকোপাদি জন্য যে অমিশ্র রোগগুলি জন্মে, তাহাদিগের নাম পিত্তজন্য অমিশ্র রোগ, শ্লেষ্মার প্রকোপাদি-বশতঃ উৎপন্ন রোগগুলি, শ্লেষ্মাজন্য অমিশ্র রোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে । আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করি-

যাচ্ছেন যে, বাতজন্য নখভেদ (কোনও স্থান নিদারণ করিলে যেরূপ বেদনা অনুভব হয়, নখে সেইরূপ বেদনা), পাদশূল (গোড়ারির নিম্নদেশে বেদনা), প্রভৃতি ৮০ প্রকার এবং পিত্তজন্য জোষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে, যেকপ তাপ অনুভব হয়, সেইরূপ অনুভব) প্রোষ (কিঞ্চিৎ দক্ষ করিলে যেমন ক্লেণ অনুভব হয়, সেইরূপ অনুভব), প্রভৃতি ৪০ প্রকার ও শ্লেষ্মজন্য ছৃণ্ডি (সর্বদা ক্ষুধা ও আহারপ্রবৃত্তির অভাব), তন্ম্রা, গাত্রগুরুতা প্রভৃতি ২০ প্রকার অমিশ্র রোগ হইয়া থাকে [৪]। এই রোগগুলির কোনটী বাতজন্য, কোনটী পিত্তজন্য, তাহা বহুকালের বহু পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অমিশ্র রোগগুলির মিশ্রণ দ্বারা অপর কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে মিশ্র রোগ বলা যাইতে পারে। যথা, ঋর অতিসার, গ্রহণী, অশঃ ইত্যাদি। যে সময়ে বাত পিত্তাদির বিষমতা হইতে ঋর রোগের উৎপত্তি হইবে, সেই সময়েই ঐ বাতপিত্তাদির বৈষম্য হইতে কম্প, দাহ, গাত্রগৌরব প্রভৃতি অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া ঐ ঋরনামক রোগের সহিত মিশ্রিত হইবে, ইহা স্থির আছে। শেষোক্ত রোগগুলিকে প্রথম রোগের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বলে। [৫]

ঋর, অতিসার প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইবাব পর, রোগীর অত্যাচার বা অন্ত কোন কারণ প্রযুক্ত বাত পিত্তাদির একোপের আধিক্য হওয়াতে অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া প্রথমোক্ত রোগের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ঐ শেষোক্ত

[৪] চরক, সূত্রস্থান, মহারোগাধায় দেখ।

[৫] জ্ঞানার্থঃ যানি চোক্তানি ব্যাধিলিঙ্গানি সংগ্রহে।

ব্যাধয়ন্তে তদায়ে তু লিঙ্গানীষ্টানি নাময়াঃ ॥ চরক।

রোগগুলিকে প্রথমোক্ত রোগের উপদ্রব বলে । [৬] কোন্ কোন্ রোগের সহিত কোন্ কোন্ উপদ্রব ঘটয়া থাকে, আয়ুর্বেদিক পণ্ডিতেরা তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন ।

অপর এক শ্রেণীর রোগ আছে, তাহাতে প্রথমে বাত, পিত্ত বা কফের প্রকোপাদি হয় না, অথচ অন্যরূপে ধাতুবৈষম্য ঘটে ; পশ্চাৎ বাতাদির প্রকোপাদি উপস্থিত হয় ; অনন্তর বেদনা, দাহ প্রভৃতি অমিশ্র রোগ, তদনন্তর ব্রণপ্রভৃতি মিশ্র রোগ আবির্ভূত হয় । ইহাদিগকে আগন্তু রোগ বলে । তরবারিদ্বারা কোনও ব্যক্তির হস্তচ্ছেদ করিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গহানিরূপ ধাতুবৈষম্য ঘটিল, পরক্ষণেই আঘাত জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাতপ্রকোপ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে পিত্তাদির প্রকোপ, অনন্তর বেদনা, দাহ প্রভৃতি, তদনন্তর ব্রণ বা ক্ষত রোগ ঘটয়া থাকে । [৭]

মনুষ্যশরীরে রোগের সংখ্যা কত, তাহা স্থির করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে । এই অসংখ্য রোগ, কতগুলি শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাহা যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ কবিতোছি ।

প্রথমতঃ যাবতীয় রোগকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে । যথা—

১ আধ্যাত্মিক,—২ আধিভৌতিক,—৩ আধিদৈবিক ।

[৬] উপসর্গিকো নাম, যঃ পূর্বেৎপন্নং ব্যাধিঃ অঘনাকালজ্ঞাতো ব্যাধিরূপসৃজতি স তন্মূলমূল এব উপদ্রবসংজ্ঞঃ । স্মৃতি ।

[৭] স্বধাতুবৈষম্যানিমিত্তজা যে বিকারসংঘাঃ স্বহবঃ শরীরে ।

ন তে পৃথক্ পিত্তকফানিলেভা আগন্তবস্তে তু ততো বিশিষ্টাঃ ।

আগন্তুরন্থেতি নিজং বিকারং নিজস্তথাগন্তমতি প্রবৃদ্ধং ॥

তে পূর্বাঃ কেবলাঃ পশ্চাৎ নিঃস্বাঃমিশ্রলক্ষণাঃ ।

হেত্বৌষধিবিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবো জরাঃ ॥ চরক ।

এস্থলে আত্মা শব্দে মনঃ ও শরীর একত্র এই দুই পদার্থ বুঝিতে হইবে। ভূত শব্দে অঙ্গ, শস্ত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ। দেব শব্দে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুরূপ কাল-ঘটিত প্রাকৃতিক নিয়ম।

আত্মা অর্থাৎ মনঃ ও শরীর ঘটিত যে সকল রোগ আহার বিহারাদির অত্যাচার জন্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক। ভূত পদার্থ হইতে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম আধিভৌতিক। দেব হইতে যে সকল রোগের উৎপত্তি, তাহাদিগকে আধিদৈবিক বলা যায়।

আধ্যাত্মিক রোগ তিন শ্রেণীতে গণ্য। যথা—

১ আদিবলপ্ররুত, — ২ জন্মবলপ্ররুত, — ৩ দোষবলপ্ররুত।

মানবশরীরের আদি উপাদানস্বরূপ শুক্র শোণিতের বিকৃতি থাকিলে তদুৎপন্ন শরীরে তৎজন্য যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগের নাম আদিবলপ্ররুত। যথা—আজন্মজাত কুষ্ঠ এবং সহজাত অঙ্গ সহজাত প্রমেহ প্রভৃতি।

আদিবল প্ররুত রোগ পুনরায় দুই প্রকার। যথা—১ মাতৃজাত — ২ পিতৃজাত।

মাতৃশরীরের রজোবিকৃতি জন্য সন্তানে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম মাতৃজাত। পিতার শুক্রদোষজন্য সন্তানের যে রোগ জন্মে, তাহার নাম পিতৃজাত।

অবিকৃত শুক্রশোণিত হইতে মানবদেহের অক্ষুরোৎপত্তি হইবার পর, মাতৃগর্ভে ঐ অক্ষুরের পরিপোষণ কালে গর্ভস্থ শিশুর যে রোগ জন্মে, এস্থলে তাহার নাম জন্মবলপ্ররুত।

জন্মবল প্ররুত রোগ পুনরায় দুইপ্রকার। যথা—

১ রসকৃত, — ২ দোহদাপচার কৃত।

জরায়ুস্থিত সন্তান মাতৃশরীরের আহারজনিত রসধাতু দ্বারাই

জীবিত থাকে এবং পরিপুষ্ট হয় [৯] যদি তদবস্থায় মাতার আহাৰ বিহাৰাদির অত্যাচার ঘটে, তবে ঐ রসধাতুর বিকৃতি জন্মে । তাদৃশ বিকৃত রসদ্বারা পরিপোষিত হওয়াতে উদরস্থ সস্তানের রোগ জন্মিয়া থাকে । ঐ রোগকে রসকৃত রোগ বলে, যথা—সস্তানের অতিক্রীণতা প্রভৃতি ।

গর্ভ চতুর্থ মাসে উপনীত হইলে [১০] জরায়ুস্থ সস্তানের হৃদয়-দেশের গঠন সম্পন্ন হয় এবং চেতনা ধাতু ব্যক্ত হইয়া উঠে । তখন ঐ সস্তানের আহাৰাদির প্রৱত্তি উপস্থিত হয় । ঐ প্রৱত্তি গর্ভিণীর মনোরথ দ্বারা প্রকাশ পায় । এইরূপ একাধারে দুইটি হৃদয়ের অবস্থান প্রযুক্ত ঐ সময়ে গর্ভিণীকে দ্বি-হৃদয়া [১১] এবং গর্ভবতীর ঐ রূপ আহাৰাদির অভিলাষকে দৌহৃদ বলে । ঐ দৌহৃদের পূরণ না হইলে, ক্ষোভবশতঃ গর্ভিণীর বাতপ্রাকোপ হয়, তজ্জন্য জরায়ুস্থ সন্তান কুজ, পঙ্গু, মুক (বোবা) ইত্যাদি বিকৃতাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে [১২] । ঐরূপ রোগকে দৌহৃদাপচারজনিত ব্যাধি বলে ।

শরীরস্থ বাত, পিত্ত ও কফ এবং মানসিক রজঃ ও তমঃ এই

[৯] মাতৃস্তন্থ খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভিনাড়ী প্রতিবন্ধা
সমিমা মাতুরাহাররসবীৰ্য্যমভিবহতি, তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধি র্ভবতি ।

সুশ্রুত, শারীরস্থান ।

[১০] সুশ্রুতের মতে চতুর্থ মাসে, আর চরকের মতে তৃতীয় মাসে দৌহৃদ উপস্থিত হয় ।

[১১] “দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে ।”

সুশ্রুত ।

[১২] “গর্ভে বাতপ্রাকোপেন দৌহৃদে চাবমানিতে ।

ভবেৎ কুজঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মুকো মিম্বিন এব চ ॥”

সুশ্রুত ।

পাঁচটিকে বিকৃত অবস্থায় দোষ [১৩] বলে । এই দোষদিগের প্রবলতাদি প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম দোষবল-প্রযুক্ত । যথা—জ্বর, অতিসার, উন্মাদ ইত্যাদি । ঐ সকল দোষবল-প্রযুক্ত রোগ দুইটি শ্রেণীতে পরিগণিত । যথা—১শারীর,—২মানস ।

যে রোগ মনকে অধিক আক্রমণ না করিয়া শরীরকে অধিক আক্রমণ করে, তাহার নাম শারীর যথা, জ্বর অতিসার প্রভৃতি । যে রোগ শরীরকে অধিক আক্রমণ না করিয়া মনকে অধিক আক্রমণ করে, তাহার নাম মানস । যথা, উন্মাদ, মূচ্ছা প্রভৃতি । শারীর রোগ স্থলতঃ দুইটি শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকে । যথা—১ আমাশয়-সমুৎপন্ন,—২ পক্কাশয়সমুৎপন্ন ।

নাভিদেশ হইতে স্তনদ্বয়ের নিম্ন পর্য্যন্ত স্থানে [১৪] আমাশয় অর্থাৎ অপক বস্তুর পরিপাক হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঐ স্থানকে আমাশয় বলে । আর নাভির নিম্নবর্তী স্থানে (অস্ত্রে) পাচকাগ্নি দ্বারা পাক করা বস্তুর অঙ্গার অংশ গুলি (যাহা পরিশেষে পুরীষ ও মূত্ররূপে পরিণত হইবে) গিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সেই স্থানকে পক্কাশয় বলে ।

যে রোগ আমাশয়স্থ ক্লেদক শ্লেষ্মা (Gastric Juice) এবং পাচকাগ্নির বিকৃতি প্রযুক্ত প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম আমাশয়-সমুৎপন্ন । যথা,—জ্বর, বমি ইত্যাদি । পক্কাশয়কে দূষিত করিয়া যে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার নাম পক্কাশয়সমুৎপন্ন । যথা—এহণী, অতিসার ইত্যাদি । [ক্রমশঃ]

কবিরাজ ক্রীষ্ণানচন্দ্র শর্মা-বিশারদ ।

[১৩] বাতঃ পিত্তং কফঃ শ্রোত্রঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ ।

মানসঃ পুনরুদ্ভিষ্টো রজশ্চ তম এব চ ॥ চরক ।

শরীরদূষণাৎ দোষাঃ * * ॥ বাহ্যভট ।

১৪] নাভেঃ স্তনাস্তরং জন্তে রামাশয় ইতি স্মৃতঃ । .

আয়ুর্বেদ কত কালের ?

[প্রথম সংখ্যার অনুরূপ]

আয়ুর্বেদের মূলতত্ত্ব, আয়ুর্বেদীয় বস্তু বীজ—যাহা ঋগ্বেদে আছে তাহা দেখিয়াছেন—যাহা অথর্ববেদে আছে তাহাও গুনিয়াছেন ; এক্ষণে যজুর্বেদ অনুসন্ধান করা যাউক ; যজুর্বেদ আয়ুস্তত্ত্বের কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন দেখা যাউক; তাহাতেও দেখিবেন, প্রচুর পরিমাণে আয়ুর্বেদশূত্র বা আয়ুর্বেদীয় বস্তু বীজ নিহিত আছে।

“যা ওষধিঃ পূর্বজাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।

মনৈনু ব্রহ্মণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥”

[শুল্ক যজুঃসংহিতা, ১২, ৭৪, ৭৫ ।

মাধ্যন্দিনী শুল্ক যজুঃশাখার এই মন্ত্রটি এবং ইহার পরবর্তী আর ১৬টি মন্ত্র অথর্বপুত্র কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে ও পরবর্তী মন্ত্রসমূহে ওষধি-স্তুতি উপলক্ষে অশেষবিধ ঔষধতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ওষধির বন, বীৰ্য্য, তাহাদের রোগহারকৰ্ম্ম শক্তি, সমস্তই অভিযাজিত হইয়াছে। উদ্ধৃত মন্ত্রটির অক্ষরার্থ এইরূপঃ—

১) যে সকল ওষধি পূর্বকালে বা আদিযুগিকালে দেবের উদ্দেশে অর্থাৎ ঋতুবিশেষের জন্ত ভবিষ্যৎ ওষধি অপেক্ষা প্রথম প্রজাত হইয়াছিল, যাহা ত্রিযুগে অর্থাৎ বসন্ত কালে, গ্রীষ্মকালে ও শরৎ কালে জন্মিয়াছিল, যাহা ব্রহ্ম অর্থাৎ জন সাধারণের ভরণ বা রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই সকল ওষধির একশত সাতটি ধাম অর্থাৎ একশত আয়ুঃস্থান ও সাতটি শিরঃস্থান (ওষধির অসংখ্যভেদ আছে, তন্মধ্যে এক শত সাত প্রকার ভেদ প্রধান, সেই সকল প্রভেদকে ধাম শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে) আগরা জাত আছি।

কি বুঝিলেন ? এই একটি মাত্র মন্ত্রে যে শত শত বৈদ্যক-বীজ লুক্কায়িত আছে—তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন ? না আমাদেরকে বলিতে হইবে ? উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্যের অভ্যস্তরে যে আয়ুর্বেদীয় উদ্ভিদ বিদ্যার প্রথম সোপান লুক্কায়িত আছে, এই মন্ত্রের মধ্যে যে ওষধির জাতিভেদ, তাহাদের অনংখ্যতা, তাহাদের ব্যাধিহর-ক্ষমতা, তাহাদের সহিত গ্রীষ্মাদি ঋতুর সম্বন্ধ থাকুক বর্ণিত হইয়াছে, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পাঠক তাহা অত্যন্ত অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন । ইহার পরেই আবার—

“উচ্ছুমা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে ।”

ইত্যাদি ক্রমে ওষধির সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে ; মানব শরীরে তাহাদের বল বা বীৰ্য্য প্রকাশ হয়, ইহাও উত্তমরূপে দর্শিত হইয়াছে । পুনর্বার “নিষ্কৃতির্নাম যা মাতা” এতদাদিক অন্য একটি মন্ত্রের দ্বারা তাহার ব্যাধিনাশক ক্ষমতা থাকার প্রমাণ করাও হইয়াছে ।

“যস্যোষধীঃ প্রসর্গতাস্তমঙ্গং পরম্পরক ।”

[শুক্লযজুর ১২ অধ্যায় দেখ]

এই মন্ত্রটির তাৎপর্য আলোচনা করিলে একটি আশ্চর্য্য তথ্য লক্ষ্য হয় যে, ওষধিসকল বা ওষধির বীৰ্য্যসকল অঙ্গে অঙ্গে প্রসর্পিত হইয়া, পারস্পর্য্য ক্রমে অবলম্বন করিয়া, স্বীয় বীৰ্য্যের দ্বারা রোগ হরণ করিতে সক্ষম হয় । একস্থানে ঔষধ সংযোগ করিলে শরীরের স্থানান্তরবর্তী রোগ নষ্ট হয়, উদরান্তরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে মস্তকের পীড়া পলায়ন করে, নখমূলে তৈল প্রয়োগ করিলে নেত্র-তিমির অপহৃত হয়, এ সকল আধুনিক বিধানের মূলতত্ত্ব কেবল উল্লিখিত যজুর্মন্ত্রেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে ।

আধুনিক বৈদ্যগ্ৰন্থে যে সুরাপ্রকরণ আছে, সুরাবিধান আছে,

সুরার দ্বারা রোগ হরণ হওয়ার কথা আছে, তাহার মূলসূত্র বা যৎ-
কিঞ্চিৎ আভাস উক্ত যজুর্বেদের “অশ্বিভ্যাং পচ্যন্—” ইত্যাদিক
১০, ৩০, ৩১ মন্ত্রে এবং তৎপৃষ্ঠবর্তী অন্যান্য কতিপয় মন্ত্রে প্রাপ্ত
হওয়া যায় । ইহার ইতিকর্তব্যতাভাগে লিখিত আছে, সাক্ষুর ও
নিরক্ষুর ধাতু ওষধিলিণ্ড ভাণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া অশ্বিনীদেবতার
উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আতপপক করিতে হইবে, পরে তদ্বারা
হোম করিতে হইবে । যজুর্ব্রাহ্মণের পশুসংজ্ঞাপন প্রকরণ দেখুন,
দেখিতে পাইবেন, সেই অংশে অতি পরিষ্কাররূপে শস্ত্রবৈদ্যকের
আংশিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

“হৃদয়াস্যাংগেহবদ্যাতথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ—”

ইত্যাদি ক্রমে যজ্ঞার্থ-মারিত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, যক্ৰুৎ,
বৃক্ক (ক্ল) দ্বয়, বামহস্ত, দুই পার্শ্ব, শ্রোণী, গুদনাল-মধ্যভাগ, বপা
ও বসা * প্রভৃতি, অস্ত্রবিশেষের দ্বারা নিঃসারিত করিয়া অগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিতে বলিয়াছেন । এ সকল দেখিলে কে না
বলিবে যে, যজুর্বেদে শস্ত্রবৈদ্যকের বীজ লুক্কায়িত আছে ।
যজ্ঞার্থে মারিত পশুর বাহ্যাদ ও অভ্যন্তরাদ শাস্ত্রানুসারে কর্তন
(তদ্রূপ কর্তন করার বৈদিক নাম অবদান) পূর্বক নিঃসারণ করা
অভ্যস্ত হইলে শস্ত্রবৈদ্যকাধিকার আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া
আইসে ; সুতরাং যজুর্বেদের ঐ সকল অংশকে শল্যতন্ত্রের
মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । এই বেদের আরণ্যক
ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিলে শস্ত্রবৈদ্যকাভিহিত শারীর-ব্যাকরণের
মূলসূত্রও দেখিতে পাওয়া যাইবে । যথা—

* যক্ৰুৎ—প্রসিক । হৃদয়—আমলকীফলাকার অংশ । বৃক্ক—উভয় কুক্ষিস্থ
আমলকী ফলাকার অবয়ব বিশেষ । বপা—জীর্ণবজ্রাকার হৃদয় বেষ্টক পদার্থ ।
—বসা—মাংসস্নেহ । গুদনালমধ্যভাগ—মলবহা নাড়ী ।

“যথা বৃক্ষেণ বনস্পাতিস্তথৈব পুরুষোহমৃষা ।
 তস্য লোমানি পর্ণানি অগমোৎপাদিকা বহিঃ ।
 ত্ৰচ এবাণ্য কধিরং প্রাণান্দি ত্ৰচ উৎপটঃ ।
 তন্মাৎ তদাভূণাৎ তৈশ্চৈত্রি রসো বৃক্ষাদিরাহতাৎ ॥
 মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং দ্ধাব তৎ স্থিরম্ ।
 অশ্বীনুত্তরতো দারুণি মজ্জা মজ্জাপমাকৃত্য ॥
 যৎ বৃক্ষে বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরং পুনঃ ।”

* * * * *

যজুরারণ্যকের প্রথম অধ্যায়স্থ এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য লইয়া এমন কি এখনকার বিজ্ঞবৈদ্যেরাও একটি পৃথক্ শারীর ব্যাকরণ রচনা করিতে পারেন । যদি তাঁহাদের শিরা প্রশিরার সংস্থান জানা আবশ্যক হয়, তবে উক্ত ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায় দেখিলেই তৎকার্য্যে কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন । যথা—

“য এসোহস্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ । অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্ ॥
 যদেতদস্তর্হৃদয়ে জ্বলকমিব । অথৈনয়োরেযা শ্ৰুতিঃ সন্ধরণীরেষা ॥
 হৃদয়াদূর্দ্ধনাড়ী উচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা । (ইত্যাদি শ্লোকের পরে)
 ভিন্ন এবেতাস্য হিতা নাম নাড্যোহস্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ...” ইত্যাদি ।

এই বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণের অষ্টমাধ্যায়ে অগ্নিস্তুতি উপলক্ষে অধিভূত অগ্নির, অধিদৈব অগ্নির ও অধ্যাত্ম অগ্নির বর্ণনা করা হইয়াছে । অধ্যাত্ম অগ্নিকে জীবদেহের নিধন, সম্মরণ ও জ্যোতিষ্ক, এই প্রকারত্রয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । যজুর্বেদ বলিতেছেন—

“ভ্রমদসি জলদসি + + + + অর্জো নন্দিশুমসি + প্রভুরসি
 জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোহসি প্রতিষ্ঠোহসি ।”

হে অগ্নি । তুমিই প্রাণরূপে জীবদেহের পরিচালক, আরার তুমিই বহিরিঙ্গনে প্রজ্বলন রূপে প্রকাশমান । তুমি মেঘোদরে

বিদ্যারূপে প্রদীপ্ত হও, তুমিই স্থাবর জঙ্গমে থাকিয়া তাহাদের প্রভু হও ও সামর্থ্য প্রদান কর । তুমিই তাহাদের জ্যোতিষ্ট, কারণ, তুমিই তাহাদের নিধন কারণ, আবার তুমিই তাহাদের সংহারের হেতু এবং তুমিই তাহাদের স্থিতি কারণ ।

বুদ্ধিমান পাঠক ! ভাবিয়া দেখুন, যজুর্বেদ কি বলিতেছেন । যজুর্বেদ কি এস্থলে উক্ত উপলক্ষে কায়-চিকিৎসার বীজ বপন করিতেছেন না ? আমরা দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি, এই স্থানে ও এই উপলক্ষে, আমাদের সেই বেদপুরুষ ভঙ্গিক্রমে কায়াগ্নির বা অধ্যাত্ম অগ্নির সমতায় জীব দেহের স্থিতি, তাহার অভাবে জীবের নিধন, এই অলজ্ঞা উপদেশ করিতেছেন ; সুতরাং ইহা দ্বারা অবশ্যই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অধ্যাত্ম অগ্নি বা কায়াগ্নি যাহাতে অবিকৃত থাকে, তাহা করা আমাদের অতীব কর্তব্য, এবং এই মূলসূত্রের অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম অগ্নির বা কায়াগ্নির সাম্যবিধানার্থ বাহ্যাগ্নির এবং বাহ্য ওষধির সাহায্য লওয়া অত্যাৱশ্যক । চরক মুনি যে কায়চিকিৎসা বলিয়াছেন, (কায়স্থ কায়াগ্নের ধাত্যাগ্নের বৈকৃত্যমাপন্নস্য চিকিৎসা বৈকৃত্যানিবারণ রূপা ক্রিয়া) তাহা অবৈদিক নহে । এই যজুর্বেদেই তাহার বীজ বা সূক্ষ্ম সূত্র লুক্কায়িত ছিল । যজুর্বেদে ও অন্যান্য বেদে অগ্নির যে “তনুপাৎ” নাম আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে কায় চিকিৎসার কারণীভূত সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আকর্ষণ করা যায় । যথা,—

তনুং ন পাতয়তি বলদানেন রক্ষতি ।

যদ্বা তদ্বা দেহস্য উনং হানং পাৎ পালনঞ্চ (ভাবে ক্ৰিপু) যস্মাৎ ।

তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিই অধ্যাত্মরূপে জীবদেহে থাকিয়া এই ভৌতিক দেহকে কখন উন করিতেছে, গ্লান করিতেছে ও ঝরিত করিতেছে এবং কখন বা ইহাকে পালন করিতেছে, পুষ্ট করিতেছে এবং বয়ঃশেষ পর্য্যন্ত ইহাকে অবস্থিত রাখিতেছে । অগ্নির এতদ্রূপ

দুর্বোধাতম মহিমা যিনি জানিতে পারেন, আমাদের বিশ্বাস এই যে, অবশ্যই তিনি কায় চিকিৎসা-নামক বিজ্ঞান বিশেষের সোপান বা মূল সূত্র রচনা করিতে সমর্থ হন। অতএব কথিত প্রকারের শত শত আয়ুর্বেদীয় বস্তু এই বেদে দৃষ্ট হয়, পরন্তু ততাবতের দুই চারিটা মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠক সমীপে উপহার প্রদান করিলাম, অধিক আহরণ করা নিম্প্রয়োজন ভাবিয়া এই স্থানেই উপরত হইলাম।

চরকমুনি যে বালাধিকারে, প্রসূত বালককে নালচ্ছেদের পর,

“ততো মধুসর্পিষী মস্ত্রোপমজিতে যথাস্নায়ং প্রাশিতুমৈশ্ব দদ্যাৎ।”

মধুমিশ্রিত ঘৃত পান করাইতে বলিয়াছেন, ইহা তিনি কোথা পাইলেন? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, এই তত্ত্ব বা এই ঔষধ তিনি যজুরারণ্যকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের নিকট সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

“অথ দধি মধু ঘৃতং সন্নীয় অনন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি।”

(জাতকর্মপ্রাকরণ দেখুন)

যদি কোন পাঠক এইরূপ বিশেষ বিশেষ বা নামগ্রাহী ঔষধ-দেখিতে বা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে অনু-রোধ করি, তাঁহারা যেন বেদ মন্ত্রগুলি মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করেন, করিলে অবশ্যই তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ লইবে।

দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত, বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত, অদ্য আমরা যজুর্বেদনিহিত আয়ুর্বেদীয় বস্তুতত্ত্বের অত্যল্প অংশ উদ্ধৃত করিলাম; আগামী মাসের সঞ্জীবনীতে সামবেদ নিহিত আয়ুর্বেদ-বীজের অংশবিশেষ দেখাইব, অন্তর “আয়ুর্বেদ কত কালের?” এই প্রশ্নের যথা সাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

“ক্লম্বে হি লোকে বুদ্ধিমতাগাচার্যঃ”

অর্থাৎ

“সমস্ত জগৎই বুদ্ধিমানের গুরু”

শ্রীষ্যক্য ।

আয়ুর্বেদ কত কালের নামক প্রবন্ধে সমুদায় বেদে ও বেদের শাখাস্বরূপ উপনিষৎপ্রভৃতি প্রাচীনতম অনেক গ্রন্থেই আয়ুর্বিদ্যার সমুদয় অঙ্গের যে বীজভাগ পাওয়া যায়, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । সুতরাং এই বিষয়ে কোন পাঠকের আর সন্দেহ না থাকিতে পারে । কিন্তু বেদে বা তাহার সমকালীন কোন গ্রন্থে আয়ুর্বেদের যে সকল বীজাংশ পাওয়া যায়, উহা কোনরূপ ধার্মিক প্রণালীতে লিখিত নহে ; কেবল সামান্য ইঙ্গিত মাত্র । সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন গ্রন্থ বা শাস্ত্র বলা যাইতে পারে না । কায়েই তদ্বারা চিকিৎসা কার্যেরও আনুকূল্য সম্ভবপর নহে । যে শাস্ত্র আজ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াও রোগ ও ওষধি-রাজ্যে মানবের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মাইতে পারিতেছে না, তাহার সামান্য ইঙ্গিতে কি হইবে? উক্ত সামান্য ইঙ্গিতই বা কোথা হইতে আনিল, কেই বা তাহার সৃষ্টিকর্তা, ঐ ইঙ্গিত-পরম্পরা হইতে কোন্ কোশলেই বা এই বিশ্ব-ব্যাপক শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, আয়ুর্বেদ-জিজ্ঞাসু মাত্রেরই এই রহস্য জানিবার কোতূহল জন্মিতে পারে । কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র কেন, যে কোন বিষয়ই কেন না হউক, মানবের সেই অন্ধকার-ময় আদিম অবস্থা হইতে

বর্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে সকলের হৃদয় বিস্ময়-রসে
 প্লাবিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের যে বিষয় আজ একটী পঞ্চমবর্ষীয়
 শিশুও সহজ বলিয়া বোধ করিতেছে, প্রথমাবস্থায় তাহা একেবারে
 অজ্ঞাত ছিল। আজ যাহা সামান্য আবিষ্কার বলিয়া বোধ হয়,
 তাহাতেও এক সময়ে মানব-বুদ্ধি চমকিত হইয়াছিল, জয়নাদে গগন
 বিদীর্ণ হইয়াছিল। চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সকল এক দিনের এক
 মাসের বা এক বৎসরের সংগ্রহ নহে। কত যুগযুগান্তর অতীত
 হইয়াছে; বহু দর্শন, বহু চিন্তা ও বহু পরীক্ষায় কত মানবের জীবন
 ব্যয়িত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এক ব্যক্তি কোন
 বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইলেন, সেই ব্যক্তি অপর
 ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের উপদেশ দিলেন, তিনি আবার অপর
 ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন, এইরূপ উপদেশ-পরম্পরা ক্রমে শাস্ত্র-
 মাত্রেরই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, পরন্তু এই পরম্পরিত শিক্ষা
 আয়ুর্বেদে কি ভাবে চলিতেছে এবং অজ্ঞ মানব কিরূপে প্রকৃতির
 রহস্য ভেদ করিয়া, আয়ুর্বেদীয় ভাব-সমূহ সংগ্রহ করিল, তাহা
 এই প্রবন্ধের আলোচ্য। বেদের সময়ে, পুরাণের সময়ে এবং তন্ত্রের
 সময়ে, আয়ুর্বেদের শিক্ষা-গত কোন পার্থক্য ছিল কি না, হিন্দুগণ
 জ্ঞানের ক্রম-বিকাশের সহিত তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের কিরূপ
 উন্নতি করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবে আমরা তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ
 দিব। বর্তমান সময়ে যাহারা আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন, অথবা শিক্ষা
 প্রদান করেন, তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ, প্রকৃত শাস্ত্রের দিকে
 কতদূর লক্ষ্য এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ও এই প্রবন্ধে
 আলোচিত হইবে। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার ফল কি ইহা
 পাঠক স্বয়ংই বুঝিয়া লইবেন।

শিক্ষা বলিলে কি বুঝায়, এবং শিক্ষার গুণ কি ইহা বলা
 নিম্প্রয়োজন, কেননা শিক্ষার স্রোতঃ পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে

রুদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং শিক্ষার প্রভাবও সাধারণে অবগত হইতেছেন। পরন্তু শিক্ষার সহিত চিকিৎসার যে অনেক অংশে সাদৃশ্য বা সাম্য আছে, ইহা হয় ত সাধারণে না জানিতেও পারেন। অতএব আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে উক্ত সাম্য প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

চিকিৎসার যেমন চিকিৎসক, ঔষধদ্রব্য, পরিচারক ও রোগী এই চারিটি পাদ বা অঙ্গ বলিয়া গণ্য, এই কারণে চিকিৎসাকে চতুষ্পাদ (১) বা চতুরঙ্গ বলে, শিক্ষারও তেমন শিক্ষক, গ্রন্থ, অভিভাবক (২) ও শিষ্য এই চারিটিকে পাদ বা অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কেন না উহাদের কোনটির অভাবে চিকিৎসা বা শিক্ষা চলিতে পারে না। এবং উহাদের গুণদোষের উপর চিকিৎসা বা শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। চিকিৎসাপাদেব সহিত শিক্ষাপাদেব নিম্নলিখিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

(১) ভিষগ্ দ্রব্যানুপস্থাত। রোগী পাদ-চতুষ্টয়ম্ ।

গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারবাপশান্তয়ে ॥

চরক । *

পাদ শব্দের অর্থ চতুর্থাংশ। যেমন কোন বস্তু চতুর্থাংশ হীন হইলে, তাহার পূর্ণতা থাকে না, অঙ্গ-ভঙ্গ-দোষ ঘটে। সুতরাং তাদৃশ বস্তু দ্বারা প্রকৃত কার্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। তজ্জগৎ চিকিৎসক প্রভৃতির একতম অঙ্গ বিহীন হইলেও, চিকিৎসা সম্পন্ন বা সুচারু নিম্পন্ন হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই মহর্ষিগণ পাদ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

(২) কেহ কেহ বলিতে পারেন অভিভাবক বা নেতা বা লকেরই আবশ্যক, বয়ঃপ্রাপ্ত বা জ্ঞানবানের শিক্ষার অভিভাবক কেন? ইহার উত্তর এই যে, অভিভাবক বা নেতার আবশ্যকতা নাই এমন কথা হইতে পারে না। তবে কিনা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বয়স্ক নিজেই নিজের অভিভাবক।

চিকিৎসাপাদ ।

- (৩) চিকিৎসক—শাস্ত্রের যথার্থ ভূজ, দৃষ্টকর্মা, স্বয়ংকৃতী, ক্ষিপ্তহস্ত, শুচি, শূর, চিকিৎসোপযোগী-মজ্জা ও উপকরণযুক্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্য-ধর্মপরায়ণ ।
- (৪) ভেষজ—প্রশস্তদেশসমুদ্র, প্রশস্ত-দিনোদ্ধৃত, মাত্রোচিত, মনোহারী, গন্ধবর্ণবসান্বিত, দোষহ, অগ্নানিকর, বিপ-র্ষায়ে অবিকারী ।
- (৫) পরিচারক—সুহবানু, অনিন্দুক, বলবানু, রোগি-বক্ষণতৎপর, বৈদ্যবাক্য-প্রতিপালক, শ্রমশীল ।
- (৬) রোগী—আয়ুজ্ঞান, ক্লেশ-সহিষ্ণু, সাধ্য, দ্রবাবানু নির্লোভ, আস্তিক, বৈদ্যবাক্যস্থ ।

শিক্ষাপাদ ।

- শিক্ষক—শাস্ত্রের যথার্থ ভূজ, দৃষ্ট-কর্মা, অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্তকর্মা, শুচি, শূর, শিক্ষোপযোগী উপকরণ-সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্ন-মতি, বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্যধর্ম-পরায়ণ ।
- গ্রন্থ—শুলেখনী-গ্রন্থত, সু-সময়-লিখিত, শিষ্যের ধারণযোগ্য, মনোহারী, রসভাবাদি-গুণ-সমবিত, চরিত্র-সংশোধক, সম্ভোষণায়ক, অনপকারী ।
- অভিভাবক—স্নেহবানু, অনিন্দুক, বল-বানু, ছাত্রশাসনপটু, শিক্ষক-বাক্যাহুগারী, শ্রমশীল ।
- শিষ্য—আয়ুজ্ঞান, ক্লেশসহিষ্ণু, উপদেশ-গ্রহণ-ক্ষম, গ্রন্থ-দ্রব্যকরণ-সম্পন্ন, নির্লোভ, আস্তিক, শিক্ষকাদে-উগ ।

- (৩) তজ্জাশ্রিতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্মা স্বয়ংকৃতী ।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জাপক্ষর-ভেষজঃ ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্দীমানু বাবসারী বিশারদঃ ।
সত্যধর্মপরো যশস্চ স ভিবক্ পাদ উচ্যতে ॥
- (৪) প্রশস্তদেশসমুদ্রং প্রশস্তেহহনি চোদ্ধৃতম্ ।
যুক্তমাত্রং মনস্কান্তং গন্ধবর্ণবসান্বিতম্ ॥
দোষহমগ্নানিকরমবিকারি বিপর্যায়ৈ ।
সমীক্ষ্য দত্তং কালে চ ভেষজং পাদ উচ্যতে ॥
- (৫) সুকোহিহুগুপ্তবলবানু যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে ।
বৈদ্যবাক্য-কৃদশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ স্মৃতঃ ॥
- (৬) আয়ুজ্ঞান সজবানু সাধ্যো দ্রবাবানু অমানপি ।
আস্তিকো বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে ॥ স্মৃকৃত ।

রোগীর রোগমোচন করিয়া সুনির্মল স্বাস্থ্য সুখ বিতরণ বা তাহার পথ প্রদর্শন করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য ; শিশুর মনো-মালিন্য দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক বিতরণ বা তাহার দ্বার উন্মোচন করিয়া দেওয়া শিক্ষকের তেমন কর্তব্য । রোগ পরীক্ষার জন্য রোগীর বাহ্য ও আভ্যন্তর দেশ তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করা যেমন চিকিৎসকের কর্তব্য ; শিশুর অন্তঃকরণ কিরূপ মল বা কুসংস্কার ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বাহ্য গঠনের সহিত তাহার মানসিক স্বাভাবিক-নিচয় তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করাও শিক্ষকের তেমনই কর্তব্য । রোগীর প্রকৃতি, বয়স ইত্যাদির সহিত দেশকাল প্রভৃতির সামঞ্জস্য রাখিয়া যথোচিত ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য ; শিশুরও মানসিক প্রকৃতি—মনের গঠন কিরূপ, কোন্‌ স্বাভাবিক প্রবল, কোন্‌ স্বাভাবিক অপ্রবল, মেধা কেমন, বুদ্ধি কেমন, মনের স্বাভাবিক আসক্তি কোন্‌ দিকে, কোন্‌ বিষয় শিক্ষায় সমধিক ফলোপধায়ক হইতে পারে ইত্যাদি মনের স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা বা গতি বয়স প্রভৃতি বিচার করিয়া দেশ কাল ইত্যাদি বিবেচনা পূর্বক যথোচিত শিক্ষা প্রদান করা তেমন শিক্ষকের কর্তব্য । নতুবা শিক্ষা সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ হইতে পারে না । শয়, ভয় ও জীর্ণদেহ সংস্কার এবং মুমূর্ষু জীবনের পুনরানয়ন রূপ ঐকট কার্য্য সাধন করেন বলিয়া চিকিৎসক যেমন জীবন দাতা পিতা, অজ্ঞান-তিমিরাক্ত বিমূঢ় ব্যক্তির আত্মসংস্কার এবং জ্ঞানালোক প্রদান করেন বলিয়া শিক্ষক তেমন জ্ঞানদাতা পিতা । কটু তিক্ত প্রভৃতি ঔষধ রোগীর রুচিকর হয় না বলিয়া চিকিৎসককে সময়ে সময়ে যেমন সুখপেয় কল্লনার আশ্রয় লইতে হয় ; আপাত অপ্রীতির দুর্গম ও জটিল বিষয় সকল অরুচিকর ও অপ্রবেশ্য হয় বলিয়া শিক্ষককেও সময়ে সময়ে গল্প, উপন্যাস ও রূপক প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞানার তেমন আশ্রয় লইতে হয় । ফলতঃ চিকিৎসা যেমন দুঃস্বাদ,

শিক্ষকতাও তেমনই দুর্বল । এই কারণে প্রাকৃত চিকিৎসক যেমন দুর্বল, প্রাকৃত শিক্ষকও তেমনই দুর্বল । এইরূপ শিক্ষক দুর্বল বলিয়া ভারতের কোন শিক্ষাকুশল ও নীতিনিপুণ কবি বলেন—

“বিষমোহপি বিগাহতে নয়ঃ কৃততীর্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ ।

স তু তত্র বিশেষদুর্বলঃ সছপন্যস্যস্তি কৃত্য-বজ্জ যঃ ॥”

অর্থাৎ “যেমন জলাশয় দূরববোহ হইলেও কেহ যদি সোপান করিয়া দেন, তবে তাহাতে অবগাহন করা যাইতে পারে ; তেমন শাস্ত্র দুর্বোধ হইলেও কেহ যদি সোপান অর্থাৎ শিক্ষা পদ্ধতি করিয়া দেন, তবে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে । কিন্তু সুন্দর সোপান প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াই ভার ।”

চিকিৎসার সহিত শিক্ষার এইরূপ অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতে পারে । আমরা তাহার কিয়দংশ মাত্র দেখাইলাম । এই রূপ সাদৃশ্যপ্রসঙ্গের তাৎপর্য এই যে, যাহারা চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার উৎকর্ষাভিলাষী তাঁহাদের যেমন চিকিৎসক, ঔষধ, রোগী ও পরিচারক এই চারিটির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক, এই চারিটির উৎকর্ষবিধানে যত্নশীল হওয়া উচিত । তেমন যাহারা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার উন্নতি-কামী তাঁহাদেরও শিক্ষক, শিষ্য প্রভৃতি চারিটি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । ইহাদের একের দ্বারা কখনও শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না । যে কার্য্য পন্থার যোগ-সাপেক্ষ, সে কার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গের বল বা গুণ কত বিচার করা কর্তব্য । যে আয়ুর্বেদের শিক্ষা প্রসঙ্গে আমরা এই সকল কথা উত্থাপন করিলাম, বলিতে গেলে উহার শিক্ষার সমস্ত অঙ্গেরই অভাব । সেই সমস্ত অভাব মোচন না করিয়া যাহারা কেবল উন্নতি উন্নতি শব্দ লইয়া ব্যাকুল হন, তাঁহাদের দ্বারা কোন কালেও চিকিৎসা শাস্ত্রের জীবন্তি হইতে পারিবে না । বাহা হউক

এক্ষণে আনুমানিক কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের সূত্রপাত করা যাউক ।

যাঁহারা বেদকে নিত্য, অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর-বৎ প্রত্যক্ষ বস্তু, ভগবান্ কমল-যোনির মুখ কমল-বিনিঃসৃত বেদবাক্যকে যাঁহারা সমুদয় বিচার আকর, সকল জ্ঞানের প্রস্রবণ বলিয়া পীকার করেন, তাঁহাদের মতে আয়ুর্বেদের উৎপত্তির গীমাংসাবিসয়ে কোন গোলই নাই । আদিশরীরী ব্রহ্মা মানবসৃষ্টির পূর্বে মানবের অভাব মোচনের অন্যান্য উপকরণ সকল যেমন সৃষ্টি করিলেন, অমনি অমৃৎসিদ্ধ বেদও তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মানবের রোগ-মোচনের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ দিলেন । সেই উপদেশ অনুসারে তিনি বিস্তীর্ণ আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিলেন । প্রজাপতি তাঁহার নিকট সেই আয়ুর্বেদের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন(৭), ইন্দ্র প্রজাপতির নিকটে শিক্ষা করিলেন, এইরূপ শিষ্যপরম্পরায় আয়ুর্বেদের শিক্ষাও চলিয়া আসিয়াছে । স্মৃতরাং যেমন এক কথায় প্রমাণ, তেমন এক কথায় উত্তর হইয়া গেল ।

পবিত্র যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বস্তু, মনুষ্যপরম্পরায় জ্ঞান বা বাক্য রাশির সংগ্রহ মনে করেন, তাঁহাদের মতে গীমাংসার বড়ই গোল ও মতভেদ । ‘পক্ষী অণ্ড কি অণ্ড পক্ষি’ ইত্যাদি বিচারচক্রের ন্যায়, অনন্ত তর্কের অনন্ত ভ্রমণে ঘুরিতে হয় । ঘুরিতে হইলেও এই শ্রেণীর লোকের আত্মবলম্বন কিছু বেশী । ‘আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ’ ইত্যাদি বাক্যের অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা হেতুবাদে নিরস্ত বা

(৭) বিধাতাঃ পরমর্ষসম্মানায়ুর্বেদং প্রকাশয়ন্ ।

মনাসা সংহিতাং চক্রে লক্ষ্মণো কময়ীমুজুম্ ॥

ভতঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্মান্মু ।

বিধিধীনীরাধিং সাজসায়ুর্বেদমুপাদিশৎ । ভাবপ্রকাশ ।

অভিনব জ্ঞানসংগ্রহে পরাধীন হন না । পূর্বাপর যাহা চলিয়া আনিতেছে, তাহাই ধ্রুব এবং অকাট্য বলিয়া সিদ্ধান্তও করেন না । দৈবাবলম্বী বা অশ্রুতবাদি-গণের ন্যায় কোনবিষয়েই নিতান্ত হতাশ হন না, ইহারা জ্ঞানসংগ্রহ নিজের আয়ত্ত ও জীবনের মুখ্যত্ব ভাবিয়া জ্ঞানানলে আত্মত্ব প্রদান করিতেও প্রস্তুত । সুতরাং আদি কাল হইতে এই শ্রেণীর লোকের শিক্ষাও ভিন্নরূপ । ইহারা ঈশ্বর প্রণীত কোন গ্রন্থ স্বীকার করেন না ; এবং মানবের লিখিত কোন গ্রন্থের পাঠসমাধিক শিক্ষার সীমা বলিয়া নির্ধারণ করেন না । ইহাদের মতে শিক্ষা অনীম, প্রকৃতি শিক্ষাগ্রন্থ বা শিক্ষক, নিজেরাই শিষ্য বা অভিভাবক । ইহারা আত্মাকে শিষ্য ও অভিভাবকস্থানীয় জ্ঞান করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে প্রকৃতিদেবীর নিকট প্রকৃত জ্ঞানোপার্জন আরম্ভ করেন । এবং প্রকৃতিকেই সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বা আদি-গুরু বলিয়া মানেন । ইহাদের সিদ্ধান্তে আয়ুর্বেদেরও আদি গুরু প্রকৃতি । প্রাকৃতিক পদার্থ বা প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে আবশ্যিকতা বা অভাবের তাড়নায় মানুষ আপনা হইতেই আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন ।

ইহারা বলেন যে, কোন্ সূত্রে বা কোন্ পন্থায় আদিশিক্ষা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত চিত্র যদিও আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করার কোন আদর্শ নাই । “আসীদিদং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্ ।” ভাবিলেই আমরা একেবারে আকুল হইয়া পড়ি, যদিও সেই তমোময় অবস্থার সহিত তুলনা করিলে আজ কোণী সূর্যের উদয় দেখিতে পাই বটে ; সুতরাং সে যুগের সহিত এ যুগের তুলনা হইতে পারে না । কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি ও আমাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে, বোধ হয় আমরা আয়ুর্বেদের আদি শিক্ষার কিঞ্চিৎ উন্নয়ন করিতে পারি ।

শ্রীজ—

[ক্রমশঃ]

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উপযোগিতা ।

কালের ভীষণ ভেরী প্রকৃতির প্রাতি প্রাশ্বে প্রতিনিয়তই বজ্রগন্তীর-নির্ঘোষে পরিকৌর্ভন করিতেছে—“চির দিন সমান না যায় ।” হায় ! সেই এক দিন আর এই এক দিন । যখন আমরা বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন, সংহিতা, জ্যোতিষ, কাব্য, সাহিত্যপ্রভৃতি পাঠ করিয়া জগতের সর্কাদিগ সভ্য, অষ্টাদশ বিষ্ণুর খনি ভারতের সেই পবিত্রতম চিত্র—অতুল্য ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত করি, তখন এমন পাষণ্ড কে আছে, যাহার অস্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব ভাবরসে—স্বর্গীয় পুত্ররসে বিগলিত না হয় । সেই সরস্বতী-ভীরে ঋষিগণের সপ্তমন্ডরে বেদগান, সেই পুণ্য তপোবনে বৈদিক যজ্ঞ, সেই সভ্যতা, সরলতা, ধর্মের পূর্ণ বিস্তার, সেই স্বর্গীয় শাস্তির পূর্ণ আবির্ভাব, সেই রাজসিংহাসনে সমাসীন সর্কমূলক্ষণাক্রান্ত পিতৃতুল্য নরপতি, সেই চারিদিকে দেবভায়ার প্রাতিধ্বনি, সেই মনুষ্য-গণের বহু চিন্তার ফলস্বরূপ—বহু মস্তিষ্ক-ক্ষয়ের চিহ্নস্বরূপ সামাজিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধান সমূহ, সেই সামান্য কর দানে প্রজাপুঞ্জের সুখ-সমৃদ্ধি, সেই জাহ্নবী, যমুনা, শতদ্রু, সিদ্ধলহরীর কল কল নিনাদের সহিত মিলিত প্রকৃতি পুঞ্জের আনন্দধ্বনি, যখন স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়, আবার যখন চিন্তা করিয়া দেখি সমাজবদ্ধ প্রত্যেক বর্ণ নির্দ্ধারিত কার্য সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে—সমুদয় বর্ণই আয়ুর্বেদচিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তায় ভারতের প্রাতি প্রাশ্বে শাস্তিসুখ উপভোগ করিতেছে । হায় ! সেই এক দিন আর ঊনবিংশ শতাব্দীর এই এক দিন । সেই ভারত, আর এই এক ভারত । জগতের শিক্ষাদাতা দীক্ষাগুরু ভারত, আজি স্লেচ্ছের পদতলে সমাসীন । অনন্ত ধনে

ধনী ভারত আজি ক্ষুদ্র দ্বীপেঃ নিকট ভিক্ষার্থী ! নিদাঘের দীপ্ত দিনমণি আজি জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, খতোত্তের নিকট আলোক-প্রভাশী ! স্বাধীনতার জন্মভূমি ভারতের গলে আজি পবাধীনতার কালকূটময় বিষম নিগড় । এমন একদিন ছিল, যেদিন আর্য্যগণ স্লেচ্ছের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, স্লেচ্ছের সংসর্গে আপনাদিগকে প্রায়শ্চিত্তাই মনে করিতেন, কিন্তু হায় ! “তে হি নো দিবসঃ গতাঃ ।” সে দিনও নাই, সে ভাবও নাই । এখন ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, অশন, বসনপ্রভৃতি সকল বিষয়েই স্লেচ্ছ আমাদের আদর্শস্থল । এমন কি কাহারও নাম যদি রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় থাকে, তাঁহাকে মিষ্টার আর, সি, বনার্জি না বলিলে, তিনি আপনাকে মহা অপমানিত জ্ঞান করেন । “রাজা যচ্ছীলঃ প্রকৃতয়ন্তুচ্ছীলা ভবন্তি ।” রাজার অনুকরণ করিতে প্রকৃতিবর্গ স্বেচ্ছাই বাধ্য হয় বটে, কিন্তু যাহা ভাল, যাহার অনুকরণ বা অনুশীলনে ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সমাজগত মঙ্গল-সম্ভাবনা, সে অনুকরণ অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু যাহা আমাদের প্রকৃতির অনুকূল নহে, স্বভাবের অনুমোদিত নহে, বাহ্যদৃশ্যে তাহা শোভনীয় হইলেও, অগ্নিদর্শী পতঙ্গের ন্যায়, তাহাতে আত্ম-হুতি দান করা, তাহার অনুকরণ করা, এই বিজিত দেশের পতিত জাতির বিষম রোগ হইয়া পড়িয়াছে । কাল-মাহাত্ম্যে আমাদের পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, ব্যবহার, স্মরণাতীত কালের চিকিৎসা প্রণালী আমাদের উপযোগী কিনা, ইংরাজি শিক্ষিত অনেকেরই মনে তাহা সন্দেহাত্মক বলিয়া বোধ হইতেছে । ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে ভাসমান ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণ অধুনা জাতীয় ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আন্দোলনানল প্রদলিত করিতেছেন, কিন্তু প্রাণরক্ষার প্রথম সহচর, অতি প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র ভারতবাসি-গণের পক্ষে কতদূর, উপযোগী ।

সে বিষয়ে অতি অল্পলোকই চিন্তা করেন, অতি অল্পলোকই তাহা সমালোচনা করিয়া থাকেন । সুতরাং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী আমাদের পক্ষে কতদূর উপযোগী বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহাই সমালোচিত হইবে । বিষয়টি কত দূর প্রয়োজনীয় কতদূর গুরুতব, ভাবুক তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম ।

এই সমাগরা ধরা একটী প্রকাণ্ড পদার্থ, পরমকল্পণাময় পরমেশ্বর অসীম অনন্ত অজ্ঞেয় সৃষ্টিশক্তি-বলে সেই একটি মাত্র বিরাট পদার্থের সমগ্র অঙ্গটি একভাবে গঠিত করেন নাই । প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে চারিটি মহাদেশের সমগ্র এক একটি প্রদেশ বিভিন্নরূপে নির্মাণ করিয়াছেন । কোন একপ্রদেশের মহিত ভিন্ন প্রদেশের তুল্যতা পরিদৃষ্ট হয় না । জগতের অগণিত নরনারী যেরূপ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারী, যেমন দুইটী মনুষ্য অবিকল এক-আকৃতি-বিশিষ্ট দেখা যায় না, সেই মত প্রত্যেক প্রদেশও পরস্পর বিভিন্ন । প্রাকৃতিক অবস্থাই এই বিভিন্নতার কারণ । প্রাকৃতির বিচিত্রতা সর্বত্রই লক্ষিত হয় । কোনদেশ গ্রীষ্ম-প্রধান, কোনদেশ শীত-প্রধান, কোনটীতে পর্যায়ক্রমে ছয় ঋতুর আবির্ভাব হয়, কোথায়ও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষামাত্র পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়, কোথায়ও কেবল নিরবচ্ছিন্ন শীত দৃষ্ট হয়, কোথায়ও বা দুইটী মাত্র ঋতু দর্শন দান করে । একমাত্র ঐ প্রাকৃতিক কারণেই আমরা এ জগতের প্রত্যেক প্রান্তের মূর্তি বিভিন্ন দেখিতে পাই । আমরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে যেমন দেশ সমূহের অবস্থা বিভিন্ন, সেইমত ভিন্ন ভিন্ন দেশসমূহের মনুষ্য, পশু, পক্ষী, রূক্ষ, লতা বিভিন্ন রূপে সৃষ্ট । যদিও বিভিন্ন দেশের মনুষ্য গণের মনুষ্য একই, তথাপি বিভিন্ন দেশের মানব শ্রেণীর অসংখ্য ধর্ম বা মধ্য-

গত ভাব দেশভেদসূত্রে অনেকাংশে ভিন্ন ভাবাপন্ন । এই বিভিন্নতার জন্যই কোন দেশের লোক গৌরাদ, কোন দেশের লোক ঘোর কৃষ্ণাদ, কোন দেশের লোকদিগের বর্ণ গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ, কোন দেশের মানব দীর্ঘাবয়ব, কোন দেশের লোক খর্ব, কোন দেশের লোক সবল, কোন দেশের লোক দুর্বল, কোন দেশের লোক শ্রমশীল, কোন দেশের লোক অলস, কোন দেশের লোক ভীক, কোন দেশের লোক অসমসাহসী, কোন দেশের লোক দার্বজীবী, কোন দেশের লোক অল্লায়ুঃ । যখন দেশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, বিভিন্ন শারীরিক ধর্ম বিশিষ্ট, বিভিন্ন প্রকার মানব সমাজ দেখিতে পাইতেছি, তখন তত্ত্বদর্শিগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সেই বিভিন্ন দেশবাসী মানব সমাজের আহার, আচার, এবং ব্যবহার প্রভৃতি অবশ্যই বিভিন্ন হওয়া কর্তব্য । প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইলেই অমঙ্গল আমিয়া দেখা দেয় । প্রকৃতির অনুকূলগামী আচার, ব্যবহার, অশন, বসন, প্রভৃতি বিশ্বজনীন মঙ্গলসাধনের মূল ।

এইরূপ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা দর্শনে দেশ ভেদে আহার আচার প্রভৃতি যেরূপ বিভিন্ন হওয়া আবশ্যিক, চিকিৎসা প্রণালী এই ঔষধ ভেদও সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় । কেননা, একদেশের মানবপ্রকৃতিতে যে ঔষধ বা যে আচার প্রভৃতি উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, অন্য দেশের অন্যরূপ মানব প্রকৃতির পক্ষে তাহা কখনও অনুকূল হইতে পারে না । যাহারা এ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, তাহারা প্রকৃতিতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং যাহারা জামিনা শুনিয়া বিভিন্নকেন্দ্রস্থিত বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন শারীরিক অবস্থাপন্ন দুইটি বিভিন্ন জাতিকে একদেশ-প্রচলিতচিকিৎসা প্রণালীমত একবিধ ঔষধে নীরোগ করিতে চাহেন, আগর বলি তাহারা প্রকৃতির শত্রু এবং প্রকৃতির

বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এ জগতে কেবল অমঙ্গলের জন্মদান করিতেছেন। শীত প্রধান প্রদেশের চিকিৎসা প্রণালী—ঔষধাবলী সেই দেশের লোকদিগের শারীরিক প্রাকৃতিক অবস্থামত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তৎসমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের বিভিন্ন শারীরিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থাপন্ন রোগীর প্রতি কি সমান গুণ প্রকাশ করিতে পারে?—না তাহা উপযোগী? একজন অসিদ্ধ-মাংসভোজী, নিয়তমদ্যপায়ী, সবলকায় শীতপ্রধানদেশবাসী রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য, যে পর্য্যায়ের যে মাত্রায় যে ঔষধ প্রদান করা যায়, এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নিরামিষাশী দুর্বলদেহ ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তি কি সেই তীব্র ঔষধ সেবনের উপযুক্ত পাত্র? বাহা যে দেশের উপযোগি-রূপে দৃষ্ট, তাহা ভিন্ন দেশে প্রচলন করা অমঙ্গলের বীজ রোপণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

যদিও কোন কোন রোগে ভিন্নদেশ প্রচলিত ঔষধ অন্যত্র উপকার প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু সেই উপকারমুত্রে রোগীর পরিণামে অনিষ্ট সাধিত হয়। যেঅনিষ্ট কি? তাহা সাধারণে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। আজি কালি আমাদের দেশে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি যে অল্প বয়সে জীবনলীলা সমাপণ করিতেছেন, ইহা লইয়া মহান্ কোলাহল এবং তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, ভাবিয়া দেখিলে চিরাত্যস্ত আচার, ব্যবহার ও চিকিৎসার বিপর্য্যায় ঘটাই ঐরূপ অকাল মৃত্যুর যে একটি কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা কর, প্রায় সকলেই বলিবেন, তাহার পিতা বা পতামহ প্রচুর আহারক্ষম ছিলেন, যথেষ্ট বল ধারণ করিতেন অনেকদিন জীবিতও ছিলেন, এমন বৃদ্ধ এখনও অনেক দেখা যায়, বাহাদের জন্মাবধিই কখন কোন রোগ হয় নাই সুতরাং কখন ঔষধ সেবনও আবশ্যক হয় নাই। আজ

তাহাদেব সন্তানগণ নানাবিধ নুতন রোগের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। যে সমস্ত বিজাতীয় চিকিৎসক বা তাঁহাদের শিষ্যাগণ সচরাচর চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাবা সেই হিম প্রধান দেশের সহিত প্রায় তুল্যজ্ঞানে এদেশীয় লোকের চিকিৎসা আরম্ভ করেন, এদেশীয় লোকের বাহ্য গঠনের ন্যায় আভ্যন্তরিক প্রকৃতি, মত্ব ও অগ্নিবল প্রভৃতি যে ভিন্ন ইহা তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকই চিন্তা করিয়া থাকেন। আরে রোগীর পরিপাক শক্তি একবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষুধা নাই, না থাকুক, তথাপি পুষ্টিকর আহার দাও, নতুবা বল থাকিবে না, এই বিবেচনায় মদ্য, মাংস ও তিস্র প্রভৃতি অপরিপাক্য পরিমাণে আহার দিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি আহার করিতে অক্ষম হয়েন, অস্তুত পিচকারীযোগে বলপূর্বক আহারীয় দ্রব্য প্রয়োগ কবেন। কিন্তু এমন বিবেচনা নাই যে, আহার বল পূর্বক প্রয়োগ করিলেই বলকারক হয় না, উহার যথারীতি পরিপাক হওয়া চাই, তাহা না হইলেই ঐ আহার রন রক্ত মাংস প্রভৃতিতে পরিণত হইতে পারে না। এইরূপে অসাময়িক এবং অনুপযোগী আহার প্রয়োগ করিলে যে অল্পপিত্ত, গ্রহণী, শ্লীহা, প্রভৃতি আনত হয় তাহা কয়জন ব্যক্তি বিবেচনা করেন। এইরূপ অনুপযোগী চিকিৎসায় যে কত নুতন রোগের সৃষ্টি হইতেছে, কত ব্যক্তি জীর্ণ, শীর্ণ, অকাল বৃদ্ধ হইয়া অসময়ে জীবন সমাপন করিতেছে, তাহা কয় ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখেন।

সহস্রবর্ষ হইল, ভারতের পতন হইয়াছে। ভারতের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় রাজার আধিপত্য সূত্রেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনাদিকাল হইতে অতীত সহস্রবর্ষ পূর্ব পর্য্যন্ত একমাত্র এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার দ্বারাই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অনাগয় সুখ বর্ষিত হইয়াছে। এখন ভারতে নানাজাতীয় চিকিৎসা প্রণালী বিরাজমান। কিন্তু এদেশীয়

অধিবানিগণ প্রত্যক্ষপরীক্ষা দ্বারা প্রতাহ দেখিতেছেন যে, বিজাতীয় কোন চিকিৎসাই—ভাবতীয় বোগ প্রতীকার পক্ষে সর্বথা উপযোগী নহে, চিবপ্রানিদ্ধ ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিতে হইলে অতিমুক্ষ্ম সূচ এবং সূত্র দ্বারা সীবন করিতে হয়, কিন্তু যদি কেহ গুণসূচ দ্বারা তাহা সীবন করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে আমরা সেই সীবন-কাৰীকে কি বলি ?

(ক্রমশঃ)

আয়ু তত্ত্ব* ।

নিরুপ্ততম কীট হইতে উৎকৃষ্টতম দেবলোকপর্য্যন্ত যাহার জন্যে লালায়িত ; ঋষিগণ নিকাম হইয়া ও যাহার কামনায় ধ্যান-পরায়ণ, যাহার অভাবে সখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, সম্পদ, বিপদ সকলই সমান ; যাহার সত্য দেহের সত্তা, মনের অস্তিত্ব, আমার আমিত্ব ও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষুতি ; যাহা ভারতের প্রধান আশীর্বাদ (দীর্ঘায়ুৰস্ত, কণ্ঠপণ্ড জ্যামুসমিত্যাদি) সেই আয়ু কিংস্বরূপ

আমরা যখন ‘আয়ুতত্ত্ব শীর্ষক’ প্রস্তাবটি লিখিতে আরম্ভ করি, তখন, কোন ব্যক্তি উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয় ! আয়ু এই শব্দটি কিরূপে প্রয়োগ করিতেছেন ? আয়ুশব্দের পরিবর্তে আয়ুস্ হওয়া উচিত এই বক্তার ন্যায় সহসা কোন কোন পাঠকেরও ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে, এ জন্য আয়ুশব্দের কথকিৎ বিবৃতি প্রদান করা অত্যাবশ্যক বোধ হইতেছে ।

ব্যাকরণ অনুসারে আয়ুশব্দ ইন্ ধাতুর উত্তর উন্ প্রত্যয়যোগে নিপ্পন্ন হয়, কেবল ব্যাকরণ দ্বারা নিষ্পাদিত হইতে পারে বলিয়াও আমরা ইহাকে সাধুশব্দ বলিতাম না, ‘বায়ুনা অগদায়ুনা’ ইত্যাদি বহু শিষ্ট প্রয়োগও দেখা গিয়াছে । ফলকথা আয়ু শব্দ ইন্ ধাতুর উত্তর উন্ প্রত্যয়যোগে [ইন্ × উন্] নিপ্পন্ন হয় এবং আয়ুস শব্দ ইন্ ধাতু উস প্রত্যয়যোগে [ইন্ × উস] সিদ্ধ হয়, এই মাত্র প্রভেদ । তন্নিম্ন তাৎপর্য্যবিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই । এই জন্য কৰ্কশ যুক্তাকর ‘আয়ুতত্ত্ব’ শিরোনামকূট না দিয়া ‘অ যুতত্ত্ব’ শিরোনাম দেওয়া হইল ।

ও কতকাল স্থায়ী ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য, বিষয়টি অতি সন্দিক্ত, সন্দিক্ত বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত । ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়াই চিকিৎসার ভিত্তিও ভিন্ন ভিন্ন । যাঁহারা শোণিতকে আয়ু বলেন, তাহাদের দৃষ্টি শোণিতের দিকেই । যাঁহারা দেহের তাপকে আয়ু বলেন, তাহাদের চিকিৎসা তাপের দিকেই প্রবর্তিত । যাঁহারা বলকে আয়ু বলেন, তাহারা বলরক্ষার্থেই যত্নশীল ।

আয়ু-সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রকার মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, "সমস্তানামিচ্ছিয়াণাং তুমজ্জালাবৎ যুগপদুখিতা জীবন শব্দবাচ্যরূপি রন্তি । তস্যা এব প্রাণাদিলক্ষণা পঞ্চতরী ক্রিয়া ।" জীবনশব্দে শব্দিত আয়ু ইচ্ছিয় সমষ্টির এক অসাধারণ ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে । এই অত্যন্ত কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

শরীরস্থ ইচ্ছিয়গণ শরীরে দ্বিবিধ কার্য্য করিতেছে । বাহ্য কার্য্য ও আন্তর কার্য্য । রূপাদি গ্রহণ করা তাহাদের বাহ্য কার্য্য এবং শরীর সংঘাত অক্ষত রাখা তাহাদের আন্তর কার্য্য । অপিচ, এক এক ইচ্ছিয় এক একটি অসাধারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছে এবং সমস্ত ইচ্ছিয় মিলিত হইয়া অম্ল একটী সাধারণ কার্য্য নির্বাহিত করিতেছে । বহির্বস্ত ও তন্নিষ্ঠ রূপাদি নির্ণয় করা তাহাদের যথাক্রমে অসাধারণ কার্য্য এবং শরীর সংঘাত স্থিরভাবে রাখা, জীবন অবস্থাপিত রাখা, তাহাদের সাধারণ কার্য্য । সমস্ত ইচ্ছিয় মিলিত হইয়া একটী ব্যাপক ক্রিয়া নির্বাহ করে বলিয়া শাস্ত্র কারেরা সেই ব্যাপক ক্রিয়াকে এই সাধারণ নাম দিয়াছেন । বহুতুম (ধান্ডের তুক) একত্রিত হইয়া যেমন এক সতঙ্গ ব্যাপক প্রবল বহিষ্কৃত উৎপাদিত করে, তদ্রূপ, সমস্ত ইচ্ছিয় মিলিত হইয়া সংঘাত রক্ষক ক্রিয়াবিশেষ নির্বাহ করে । সেই বিশিষ্ট ক্রিয়া যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণই জীবন ।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদ কত কালের ?

“আয়ুর্বেদ কত কালের ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সংগ্রহের জন্য আমরা ঋক্, যজু, ও অথর্ব,—এই তিন বেদ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে, তিন বেদেই আয়ুর্বেদীয় বিবিধ বস্তু আছে। এবার সামবেদ অনুসন্ধান করিলাম; দেখিলাম, তাহাতেও আয়ুর্বেদীয় কোন কোন অংশ বিরাজ করিতেছে।

সামবেদ সংহিতার দ্বিতীয় প্রপাঠকের শেষ মন্ত্রটি পাঠ করিলে জানা যায় যে, সামবেদ বায়ু সম্বন্ধে উপলক্ষ্য ভৈষজ্যের দ্বারা মানুষের আয়ুঃস্বার্থ্য থাকার কথা বলিয়াছেন। যথা,—

“বাত আবাতু ভৈষজ্যং শস্তু ময়োহুনে। যদে।

প্র ন আশুংষি কারিষ্যৎ।”

[সামবেদ সংহিতার ২, ১০, ৭০, ১৮৪]

ভৈষজ্যের সহিত জীবের আয়ুঃসম্বন্ধ জানা থাকিলে অবশ্যই আয়ুর্বেদ জানার ফল হয়। সুতরাং উক্ত বেদের আয়ুর্বেদ-মূলকতা পক্ষে কোন রূপ সংশয় করা যায় না। এই বেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ দেখুন, দেখিতে পাইবেন, তাহাতে জাঠরাগি, অন্ন পরিপাক প্রণালী ও ইন্দ্রিয় পরিপুষ্টি,—এই তিনটি প্রধানতম আয়ুর্বেদীয় তত্ত্ব উত্তম রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

“অন্নমশিতং ত্রৈধা বিধীয়তে। তস্য যঃ শ্ববিষ্ঠস্তৎ পুরীষং ভবতি

যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহনিষ্ঠস্তন্মনঃ।”

ইহার অর্থ এই যে, বায়ুসহকৃত জাঠরাগি দ্বারা পচ্যমান ভুক্তান্ন প্রথমত তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার সুলতম ভাগ তাহা পুরীষ, যাহা তাহার মধ্যম ভাগ তাহা মাংস (রসরক্তাদিক্রমে মাংস), যাহা তাহার সূক্ষ্মতম অংশ তাহা উষ্ণায়নশীল বলিয়া “হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাস্থি হিতাখ্যাস্থি নাড়ীযু অনুপ্রাশিয়া কারণসংঘা-

তস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনোভবতি” অর্থাৎ স্নেহপিণ্ডে উক্তাত হইয়া তত্রস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী পথ দ্বারা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে গিয়া সংপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে তাহা মনকে উপচিত করে। এই রূপ ;—

“আগঃ পীতা স্নেহা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্ববিষ্টোভাগস্তদ্ব্যজ্ঞঃ ভবতি
যো মধ্যমস্তলোহিতঃ যোহনিষ্ঠঃ সঃ প্রাণঃ ।”

“তেজোহশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্ববিষ্টোভাগস্তদস্থি ভবতি
যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোহনিষ্ঠঃ সা বাক্ ।”

[ঐ ঐ]

জল বা জলবহুল দ্রব্য উপযোগের পর জাঠরাগ্নি তাহাকে পরিপাক করতঃ প্রথমতঃ ত্রিধা বিভক্ত করে। তাহার সূক্ষ্ম ভাগ মূত্রের, মধ্যম ভাগ রক্তের এবং সূক্ষ্মতম ভাগ প্রাণের বা প্রাণ-বায়ুর উৎপত্তিকারণ হয়। তেজঃ (তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি) বা তেজঃপ্রধান দ্রব্য উপযোগের পর তাহাও উদর্য্য বায়ুপ্রেরিত পৈতৃ তেজের দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার সূক্ষ্মতম ভাগ তাহা এই দেহের অঙ্গি, যাহা তাহার মধ্যম ভাগ তাহা এই দেহের মজ্জা এবং যাহা তাহার সূক্ষ্মতম ভাগ তাহা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক বা পরিপোষক । *

* তাৎপর্য্য এই যে, তৈল, ঘৃত ও ঘৃতমজ্জাতীয় বস্তু প্রভৃতি তৈজস্ বস্তু উপযোগ করিলে বাঈশদা হয়, অস্থি নকল দৃঢ় ও স্থূল হয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুণ গুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই অত্যন্ত বৃদ্ধান্ত গুলিতে মনোমধ্যে অবশ্যই পূর্কপক্ষ উঠিবে যে, তবে অন্নমাত্রভোজী আত্ম প্রভৃতি জীবেরা বাক্যবস্ত ও প্রাণবস্ত হয় কেন? কেননা তাহারা-ত জল উপযোগ করে না, বা তেজঃ উপযোগ করেনা, তবে তাহাদের বাক্যশক্তি ও প্রাণশক্তি কোথা হইতে আইসে? এতদ্ভিন্ন জলমাত্রভোজী কোন কোন মৎস্য অন্নাদি ভক্ষণ করে না, তবে কিসে তাহাদের মনপিতা থাকে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বেদ পুরুষ বলিয়াছেন, কেবল জল, কেবল অন্ন ও কেবল তেজঃ

বালক শ্বেতকেতু পিতার এই নির্দৃষ্টান্ত কথা বুঝিতে না পারিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! পুনর্বার ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন । পিতা বলিলেন,—

“দধুঃ সৌম্য ! মধ্যমানস্য যোহগ্নিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীযতি
তৎ সর্পির্ভবতি এবমেব খমু সৌম্য ! অন্নস্যামানস্য যোহগ্নিমা
স উর্দ্ধঃ সমুদীযতি ।”

বৎস্য ! দধি আলোড়িত হইলে তাহা হইতে যেমন তাহার সূক্ষ্ম-
তম সার সকল উর্দ্ধে উত্থিত হয়, ক্রমে একত্রিত হইয়া মননীতাকারে
পরিণত হয়, তৎপরে তাহাই যেমন স্থতরূপ ধারণ করে ; সেইরূপ,
“ভুজ্যমানস্যায়স্য উদর্ব্যেণাগ্নিনা রায়ুসহিতেন খজেন ইব মধ্য
মানস্য যোহগ্নিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীযতি ।” অন্নাদি ভোজন করিলে
পর রায়ুসহায় জ্বাঠরাগ্নি তখন খজের ন্যায়, মনু দণ্ডের ন্যায়,
তত্তাবৎকে মণ্ডিত করিতে থাকে, ক্রমে তাহা হইতে তাহার সূক্ষ্ম,
মধ্যম ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সার অসার প্রভৃতি পৃথক্ হইয়া, সার সকল
উর্দ্ধে উত্থিত হয়, পরে তাহা পৃথক্ পৃথক্ পথে গমন করে ।

পাঠকগণ ! এখন বিবেচনা করুন, সামবেদে কি প্রকার
বৈদ্যক বীজ আছে । সামবেদের অন্নপাক প্রণালীটি কেমন বিশদ
তাহা উক্ত মন্ত্রের ভাষ্য ও টীকা দেখিয়া বিবেচনা করুন ।

পরিপাক ক্রিয়ার প্রকৃত তথ্য কি তাহা বোধ হয় কেহই
নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন । তথাপি, উক্ত তথ্য সম্বন্ধে বৈদিক
সিদ্ধান্ত সংকলিত হইতেছে ।

কেহই উপযোগ করিতে পারে না, সমস্ত বস্তুই ত্রিবৃত্ত অর্থাৎ প্রত্যেক
বস্তুতেই প্রত্যেক ভূতের গির্জা বা ভাগ আছে ; সুতরাং যে জলপায়ী সে
প্রকৃত জলপায়ী নহে ; জলের সঙ্গে তাহারা অন্যান্য বস্তুও ভক্ষণ করে,
তাহাতেই তাহাদের মনস্বিতা প্রভৃতি সমস্ত গুণ তারতম্যক্রমে সংরক্ষিত
হয় ।

“নাভেরূর্ধ্বে হৃদয়াদধস্তাদামাশয়মচক্ষতে।” [ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

নাভির উপরে হৃদয়ের নীচে, আমাশয় নামক (পাকস্থলী) স্থান আছে। ভুক্তরসকল, গল-নালীর দ্বারা তথায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া মাত্র আমাশয় অঙ্গে প্রথমতঃ স্পর্শাঘাত জনিত ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। যেরূপ ক্রিয়ায় ভুক্তজব্যের আন্দোলন বা আলোড়ন হইতে পারে, এ সেইরূপ ক্রিয়া। সেই জন্যই আগাদের বেদ পুরুষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন,—

“দধঃ সৌমা। যথামথামানস্য যোহগ্নিমা স উর্ধ্বঃ সমুদীষতি
এবমেব খলু সৌমা। অন্নস্যামানস্য।” [ছান্দোগ্যম্।

আচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

“অন্নস্য ওদনাদেবপ্রস্থমানস্য ভুজ্যমানস্য ওদর্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন
খঞ্জন ইব মথামানস্য।” ইত্যাদি।

আম-কোষস্থ বহি বা উদ্ভা কোষ্ঠবায়ুকে আন্দোলিত করতঃ ভুজ্যমান অন্ন সকলকে আলোড়িত করিতে থাকে। উদর্য্য বহি কি? বেদ পুরুষ তাহা আপনিই ব্যক্ত করিবেন। ফল, লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল যে, খাদ্য সকল আমকোষ্ঠে পতিত হইয়া মাত্র প্রথমতঃ আমকোষ্ঠের আন্দোলন, অনন্তর তন্মধ্যগত খাদ্যের আলোড়ন, তৎসঙ্গে রসনিষ্কৃতি হয়। চক্ষুতে কিছু পড়িবা মাত্র যেমন চক্ষু দিয়া জল বহির্গত হয়, জিহ্বায় কিছু রাখিবা মাত্র যেমন তাহার সর্কস্থান হইতে লাল-রস নিষ্কৃতি হয়, সেইরূপ, পাক-শয়েও অন্নাদি পড়িবা মাত্র তত্রত্য রসকোষ হইতে এক প্রকার রস নিষ্কৃতি হয়। সেই রসই অশায়ান অর্থাৎ আলোড়ন ক্রিয়া সহকারে দ্রবীকৃত করিতে থাকে। এই তথ্যটি আমবেদ অন্য এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথাঃ—

“অগ্নিশিষতি নাম আগ এব তদশিতং নয়ন্তে তদমথা—” ইত্যাদি।

আচার্য্য এই ব্রাহ্মণবাক্য ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন যে,—

“অশিতমন্নং কঠিনং রসরূপা আপঃ নয়ন্তে দ্রবীকৃত্য রসাদিতাবেন
বিপরিণাময়ন্তে ।” [ভাষ্যম্ ।

সেই নিষ্কৃত রসই অশ্যমান কঠিন অন্নকে দ্রবীকৃত করিয়া,
গলাইয়া দিয়া, জীর্ণ করিয়া, রসাদি আকারে পরিণামিত করে ।
পুনরপি বলিয়াছেন ;—

“অশিতং হৃদয়মস্তির্দ্রবীকৃতং জঠরযোগা পচ্যমানং রসাদিতাবেন পরি-
ণমতে । রসাচ্ছেদ্যং শোণিতান্নাংসং মাংসান্নেদোমেদসোহস্থীনি অস্থিভ্যা
মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রম্ ।” [ভাষ্যম্ ।

ভুজ্যমান অন্ন ক্লিন্নকারক ঔদর্য জলের দ্বারা অর্থাৎ উদর্য
রসের দ্বারা দ্রবীভূত হয়, জঠরস্থ উন্মা তাহার পাক করে । করিলে,
তাহা রসাদি আকারে পরিণত হয় । প্রথমে রসপাক, রসপাক
অন্তে রক্তের জন্ম, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে
অস্থি, অস্থিসার মজ্জা, এবং মজ্জাসার শুক্র ।

“তথা যোষিস্তু জন্মন্নং রসাদিক্রমেণৈব পরিণতং লোহিতং ভবতি ।”

[ভাষ্যম্ ।

দ্রবীভূতান্নও উক্ত ক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া লোহিত অর্থাৎ
স্রোণীণিতের সৃষ্টি করিয়া থাকে ।

জল-নামক ও আপু-নামক পাচক রস কিরূপ এবং তাহার
কোষই বা কোথায় ? আচার্য্য তাহা উক্ত নির্গদবাক্য ব্যাখ্যায় বর্ণন
করিয়াছেন, যথা—

“হৃদয়মাংসপিণ্ডাৎ সর্কভোবিনিঃসৃত্য আদিতামণ্ডলাদিব রসায়স্তাশ্চ
এতা পিঙ্গলস্যা বর্ণবিশেষবিশিষ্টস্য অগ্নিঃ সূক্ষ্মরসস্য রসেন পূর্ণাস্তদাকারা
এব তিষ্ঠন্তি ভবন্তীত্যর্থঃ ।”

অস্যটীকা ।

“পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ । তেন পাকোহশিতস্য জায়তে । তেন অতি-
নিবৃত্তেন অগ্নেন কফেন লম্পর্কাৎ তদেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ ভবতি
পিঙ্গলম্ । তেন সম্পর্কাৎ রসস্য নাড়ীনাঞ্চ জায়তে পিঙ্গলম্ । তদেব

পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ যথোক্তপাকান্তি নিবৃত্তেন প্রভূতেন বাতেন সম্বন্ধাৎ
ভবতি নীলম্ । তেন চ সম্পর্কাৎ অন্নরসস্য নাড়ীনাঞ্চ জায়তে নৈলম্ ।
তদেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ যথোক্তপাকবশাদভিনিবৃত্তকক্ষস্য সম্বন্ধাৎ
নোভুয়জ্জাৎ ভবতি শুক্রম্ । তেন চ সম্পর্কাৎ অন্নরসস্য নাড়ীনাঞ্চ ভবতি
শৌক্যম্ ।' ইত্যাদি ।

এই সমুদায় বৈদিক ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ এইরূপঃ —

হৃৎপিণ্ড হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল জীর্ণ অশ্বখ পত্রের শিরা
প্রশিরাব ন্যায় চাবিদিকে চলিয়া গিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । সূত্রাৎ
আমাশয়স্থ অন্তস্তকেও ঐ সকল সূক্ষ্ম শিরার সংযোগ আছে । সূর্য্য
হইতে যেমন সূর্য্যরশ্মি, হৃদয় হইতে তেমনি নাড়ী প্রণাড়ী । সেই
সকল সূক্ষ্ম শিরা জাল কেবল রসময় বা রসপরিপূর্ণ । সূত্রাৎ
আমাশয়স্থ ও হৃৎপিণ্ডস্থ রসবহা শিরা সকল কতক পিঙ্গলবর্ণ,
কতক শুক্রবর্ণ এবং কতক বা নীলবর্ণ এবং কতক বা প্রকৃত রক্তবর্ণ ।
এই প্রকার বর্ণোৎপত্তির প্রকৃত কারণ আমাশয়স্থ বা পচ্যমান
আশয়স্থ সৌর তেজঃ । কেননা তত্রস্থ সৌর-তেজের দ্বারাই পাক-
ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় । ইহারই অন্য নাম পিত্তরস । পিত্তরস বা পাক
রস উৎপাদনের প্রকৃত স্থান পৃথক্ প্রদেশে থাকিলেও তাহারই দ্বারা
আমাশয়ের সৌর-তেজ সঙ্কুচিত হয় । পাককালে কক্ষোৎপাদক
বিস্মিতে স্লেষ্মা থাকে, সেই স্লেষ্মার বহুমিশ্রণ হইলেই সৌর-তেজঃ
পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায় ; সূত্রাৎ তত্রত্য রস ও রসবহা সূক্ষ্ম শিরা জালক
(Cecum caeco gland) সকল পিঙ্গলাকার ধারণ করে । এইরূপ,
বাতবহুল হইতে নীলিমা, কফবাহুল্য হইতে শুক্র, ইত্যাদি ইত্যাদি
বর্ণবিশেষের কারণ অনুসন্ধান করিবেন॥

আমাশয়স্থ পিত্তনাগক সৌরতেজঃই যে অন্নপরিপাকের প্রধান
কারণ, উন্মায়ুক্ত রসই যে ভুজ্যমান অর্কে জবীকৃত করিয়া থাকে,
তেজ বা উন্মা যে কোষ্ঠগত রসে বসতি করে, এবং সেই উন্মাই

যে আশ্রয়ীভূত পাচক রসে খালিয়া ধাতুস্তরের সংসর্গবশতঃ বর্ণ বিশেষের সৃষ্টি করে, তাহা প্রদর্শিত বর্ণনার দ্বারা উত্তমরূপ বুঝায়।

বেদোক্তির এতদ্রূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা দেখিয়া আমরা আধুনিক ভাষায় এইমাত্র বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পাকক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের বেদ পুরুষ নিম্নলিখিত প্রকার ভিন্ন অন্য কোনরূপ পাকক্রিয়ার উপদেশ করেন নাই।

*খাদ্য দ্রব্য আশ্রয়স্থানে প্রবিষ্ট হইলে পর, স্পর্শাঘাত জন্মিত তদ্রূপ উন্মায়ুক্ত বায়ুতে আন্দোলনাত্মক ক্রিয়া জন্মে। সুতরাং তদাধার স্বরূপ বা তাহার আশ্রয়স্থান মাংস পেশীময় পাকযন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণ রূপ ক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে সৌরভেজ অথবা পিত্ত নামক রস নিষ্কৃত হইয়া খাদ্য সকল দ্রব করিতে থাকে, সুতরাং খজের দ্বারা অর্থাৎ মন্থদণ্ডের দ্বারা দধি পরিচলিত করিলে তাহা হইতে যেমন তাহার সূক্ষ্ম সার সকল উর্দ্ধে উথিত হইয়া নবনীত ভাব প্রাপ্ত হয়, শূল অর্থাৎ অসারভাগ পৃথক হয়, আর মধ্যম ভাগ যেমন বোল রূপে অবস্থিত থাকে, উন্মায়ুক্ত উদর্যবায়ু কর্তৃক পরিচালিত খাদ্যদ্রব্যও তেমনি বায়ুসহিত সৌরভেজের বা পিত্তরসের মিশ্রণে আলোড়িত ও দ্রবীকৃত হইলে পর তাহার সারভাগ অসার ভাগ যথাযোগ্য পৃথককৃত হয়, অনন্তর তাহা ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবেশ করে। অতএব, উন্মায়ুক্ত ও উদর্যবায়ুই নিজ নিজ আশ্রয়ীভূত আশ্রয়ে থাকিয়া উত্তরূপ পৃথক পৃথক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

এত গেল বেদোক্তি বা বৈদিক মত। এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ কি বলেন, তাহা আমরা পৃথক প্রস্তাবে প্রকটিত করিব। এক্ষণে এই প্রক্রিয়ার উপর বেদবাদী ঋষিদিগের যে এক প্রকার মত আছে, উপদেশ আছে, তাহাও আমরা এস্থলে পাঠকগণের গোচর করিতেছি। বেদবাদী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিতেছেন:—

"আয়ুর্ষাং ভুক্তমাহারং সহগা তৈঃ সমীকৃতম্ ।
 তুঙ্গমধ্যগতঃ প্রাপস্তানি কুর্ষ্যাদ্ পৃথক পৃথক ।"
 "পুনবর্গৌ জলং প্রাপ্য অন্নাদীনি জলোপরি । [জলং ময়ঃ ।
 ময়ং হাপানঃ সংপ্রাপ্য তেতৈব সহ মাক্রতঃ ॥
 প্রয়াতি জলনং তত্র দেহমধ্যগতঃ পুনঃ ।"
 "জ্বালাভিজলনং তত্র প্রাণেন প্রেরিতং মুহুঃ ।
 জলত্যাগকমাপ্রিতা কোষ্ঠমধ্যগতঃ তদা ॥
 অন্নং বাঞ্জনসংযুক্তং জলোপরি সমর্পিতং । [জলং পাচকোরগঃ ।
 ততঃ প্রস্তুতমকরোৎ বহিস্তপ্তধারিণা ॥"
 "অথাস্থতং ষড়্ভুসং বা পাহারং কঠমার্গগম্ ।
 শ্লেষ্মণামুগতং তস্য প্রভাবান্নধুবীভবেৎ ॥
 তত্র স্বাদুল্ললবণ ভিক্তোষণকষায়কাঃ ।
 ষড়্ভুগাঃ কথিতা ভূত-বিকৃত্য প্রব্যমাপ্রিতাঃ ॥
 অথৈবমাশয়গতং পশ্চাৎ পিত্তাশয়ং ব্রজেৎ ।
 তদা তস্যামুগমনাৎ কটুকং সংপ্রপদাতে ॥
 তথাক্রান্তরসংশ্লিষ্টং পচাতে পিত্তধারিণা ।"
 "এহণীনাং যা পাত্রী প্রস্তুতাজলিসম্বিতা ।
 অধস্তন্যাঃ প্রধানাগ্নিঃ সমানেনাপি হৃদাতে ॥
 (প্রধানাগ্নির্দেহস্থ্যাহ্নিভ্যো ভিন্নো বড়বানলরূপো জ্বাঠরাগ্নিঃ
 পচামানাদ্রসং ভিন্নং বায়ুরজাদিকং নয়েৎ ।
 তত্র কিট্টং পৃথক্ ভিন্নং এহণাং চিহ্নভেদনিলঃ ।
 তচ্চীরমানং বিধায় এহণীং পূরয়েন্মুহুঃ ।
 সা তয়া শকুতা পূর্ণা বলিতা প্রতियুক্তি ॥
 পুরীষং পায়ুমার্গেণ তৎপাকে + + + ॥" ইত্যাদি ।

এই সকল শ্লোকের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সহজ । সূত্ররাং ইহার
 বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না । অপিচ, বৈদিক ব্যাখ্যার সহিত এই
 সকল শ্লোকের সুন্দর ঐক্য আছে । অনেক অজ্ঞলোক মনে

করিয়া থাকেন, পূর্নকালের লোকেরা অম্পাক-প্রক্রিয়া জানিতেন না। এ সকল দেখিলে শুনিলে বিবেচনা হয়, যাহারা আয়ুর্বেদকে উক্ত প্রকারে ভুল্ল বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুদর্শী নহেন।

এতদ্ভিন্ন এই বেদে, ক্ষুধা ও পিপাসা প্রভৃতির কারণ উত্তম-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শারীর ধাতুর হ্রাস হইলে বা বৃদ্ধি হইলে কিরূপে তাহার পূরণ ও শমতা করিতে হয়, তাহাও উপদিষ্ট আছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা বা সে সকল সংক্ষিপ্ত উপদেশ আহত করিলাম না। ফল, যাহাতে এই সকল মূলীভূত শারীরতত্ত্ব ও আয়ুস্তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, কি জন্য না তাহাকে আয়ুর্বেদের মূল বা ভিত্তি বলিয়া উল্লেখ করিব ?

যাক, এখন দেখা যাক, আমাদের আয়ুর্বেদ কত কালের। আমরা যখন দেখিতেছি যে, আয়ুর্বেদের সমস্ত তত্ত্বই বীজভাবে বেদমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে তখন আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে, আয়ুর্বেদীয় বস্তু সকল অনাদি অথবা বেদসমকালিক। বৈদিক সময়ে, না হয় তাহা সূক্ষ্মভাবে ছিল, বীজরূপে ছিল, এখন না হয় তাহা অঙ্কুরিত বা শাখাপ্রশাখান্বিত হইয়াছে, বিস্তৃত বা বিশাল হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে আধুনিক বলিতে পারি না। অন্যান্য বেদের ন্যায় ইহা হয় সর্গাদিগ, না হয় অনাদি, এইরূপ বলাই কর্তব্য। কিন্তু যদি কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে, আয়ুর্বেদীয় বস্তু সকল চিরপরিচিত হয় হউক, পরন্তু তদ্ভিত্তি সংহিত। অর্থাৎ যাহাকে আমরা আয়ুর্বেদসংহিতা বলি, তাহা কত কালের ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে অবশ্যই তাহার পৃথক প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, পৃথক প্রকারের অনুসন্ধানও আরম্ভ করিতে হইবে।

আগে উপবেদ শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করণ, পরে দেখিবেন, অথর্ববেদের কিংবা ঋগ্বেদের সহিত আয়ুর্বেদের কিরূপ উপাঙ্গতা আছে। আয়ুর্বেদ সংহিতা কত পুরাতন তাহা জানিবার জন্ম

অগ্রে উপবেদ শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করণ । উপবেদ শব্দের এক অর্থ এই :-

“উপগিতঃ বেদেন ।” বেদের তুল্য অর্থাৎ অন্যান্য বেদ যেমন প্রামাণিক ইহাও তদ্রূপ প্রামাণিক ; কিংবা অন্যান্য বেদ যেমন স্থির নিত্য, ইহাও তদ্রূপ স্থিরনিত্য । এতদ্ভিন্ন, “যে বেদের নিকট বা যে বেদ হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে বা আবিষ্কৃত হইয়াছে সে তাহার উপবেদ ।” এরূপ অর্থও হইতে পারে ।

এই শেষ অর্থ অনুসারে বিবেচনা করণ, উপবেদ গুলিকে মূল বেদের পরবর্তী বলা যায় কি না । যদি যায়, তবে, অবশ্যই আমরা উপবেদাত্মক আয়ুর্বেদসংহিতার আবির্ভাব কাল অনুমান করিবার জন্য অগ্রসর বা উদ্যোগী হইতে পারিব, অন্যথা ব্রথা প্রয়াস স্বীকার করা হইবে । ফল, এখনকে যতদূর অশেষ্য আছে তত দূরই আমরা অন্বেষণ করিব ।

ক্রমশঃ—

তৃত্ব-সূত্র ।

(Principle of Medicine)

সভ্যজগতে যত প্রণালীর চিকিৎসা প্রবর্তিত হইয়াছে, সকল প্রণালীরই কতকগুলি মূল-নিয়ম আছে । ঐ মূল-নিয়মের নাম সূত্র বা Principle । উক্ত সূত্রের ভেদ অনুসারে চিকিৎসা এবং উহার নামের ভেদ হইয়া থাকে । সূত্রই শাস্ত্রের জীবন এবং সূত্রই শাস্ত্রের সোপান । যে কোন বিদ্যাই হউক, যত দিন সৌত্রিক আকারে উপস্থিত না হয়—সৌত্রিক পন্থায় ধাবিত না হয়—অথবা সৌত্রিক নিয়মের অধীন না হয়, তত দিন উহার প্রকৃত শাস্ত্র-সংজ্ঞা বা Science সংজ্ঞা দেওয়া যুক্তি-যুক্ত নহে । সূত্রের উৎকর্ষ বা অপ-

কর্ম অনুসারে শাস্ত্রেরও উন্নতি বা অবনতি বিচার করা উচিত । শাস্ত্রীয়-সূত্র অতি দুর্বোধ্য ও জটিল । দুর্বোধ্য বলিয়া সূত্রগর্ভে সহসা ভেদ করা যায় না এবং এই কারণেই বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়া থাকে । আজ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্বাংশের সম্পূর্ণসূত্রনির্মাণ হয় নাই বলিয়া এই শাস্ত্রও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । জ্ঞানের প্রকৃত উন্মেষ ও প্রকৃত অনুশীলন না জন্মিলে সূত্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না । পরন্তু হিন্দুগণ সূত্রের মহিমা অনেক কাল পূর্বেই অবগত ছিলেন, এবং তদনুযায়িনী চেষ্টাও করিয়াছিলেন । অথর্ববেদের এক স্থানে সূত্রের একটি সুন্দর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে—

“ যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিত্ততঃ

যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ ।

সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ

স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥”

যদিও এই সূত্রটি ব্রহ্ম-বিষয়ক, ব্রহ্ম-প্রতিপাদনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য, তথাপি ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, যাহা মূল, যাহা হইতে সমুদয়ের সৃচনা হইয়াছে, যাহা সর্বত্র বিস্তীর্ণ, যাহাতে সমুদয়ই প্রথিত, তাহা জ্ঞাত হওয়াই কর্তব্য ।

আমাদের দেশের অনেকেই ব্যাকরণ ও সামান্য সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, এবং সচরাচর যে সকল বৈজ্ঞ চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সংগ্রহ বা তালিকাগ্রন্থপাঠী । অনেকে বা আয়ুর্কোষকে নিতান্ত আজ্ঞা-সিদ্ধ মনে করেন, স্মরণ্য যে রোগে যে ঔষধ দ্রুত বা তৈল ইত্যাদি নির্দিষ্ট আছে, তাহা অবিচারিত ভাবে গ্রহণ বা ব্যবহার করিয়া থাকেন (ক) । রোগী ও রোগের প্রকৃতি, ঔষ-

(ক) যাহারা মূলগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন, তাঁহাদেরও শাস্ত্রীয়-সূত্রাদির প্রতি দৃষ্টি নাই বলিলেও হয় । বৈদ্যশাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া

ধের সহিত তাহার মূলসম্বন্ধ, অংশাংশ-কল্পনা, দেশ কাল ইত্যাদির চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত অল্প ব্যক্তিরই সংস্রব দেখা যায়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবার সূত্র কি ?

সূত্র কি ? ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই—যে যুক্তির উপরে শাস্ত্রের ভিত্তি, বিস্তীর্ণ বিষয় যদ্বারা সঙ্কলন করা যায় এবং যাহাতে অধিত থাকে, অনুক্ত বিষয়ও যদ্বারা উহা করিয়া লওয়া যায়, তাহাই সূত্র(খ)। মনে কর, রাগ + আদি = রামাদি, অথবা দয়া + আনন্দ = দয়ানন্দ, এইরূপ নির্দিষ্ট সংহিত পদ যাঁহার জ্ঞানা আছে, তিনি সেই কয়েকটি নির্দিষ্ট পদেরই সন্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐরূপ উদাহরণ সমূহেব সন্ধি যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, যাঁহার সেই নিয়ম পরিগ্রহ হইয়াছে, তিনি ঐরূপ অনন্ত পদের সন্ধি নিষ্পাদন করিতে পারেন, অনন্ত পদকে এক জাতি বা ভিন্ন জাতিতেও গ্রহণ

ইহারা ব্যাকরণের কারক সমাস ইত্যাদি এবং ন্যায়ের দুই চারিটা অব-
চ্ছেদাবচ্ছিন্ন লইয়াই প্রায় বৃথা কালহরণ করেন। বৈদ্যশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি
পক্ষে অনেককাল হইতেই ইহাও একটা অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই
চিকিৎসা-বিষয়ে নূতন সঙ্কলন বা আবিষ্কার ও যথার্থ চিন্তা আর নাই। এই
সমস্ত কারণে বিজাতীয় চিকিৎসকগণ বর্তমান বৈদ্যদিগকে যে 'হাতুড়িয়া'
বলিবেন, ইহা অব বিচিত্র কি ? কবে যে দেশীয় বৈদ্যদিগের ঐরূপ
কুসংস্কার দূর হইয়া কার্যকারিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তাহা বলা যায় না।

(খ) যদিও ব্যাকরণের সূত্র বা নিয়মের সহিত চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রের
প্রকৃত তুলনা হইতে পারে না, কেননা ব্যাকরণের নিরসনমূহ মানব-কল্পিত
শব্দের উপর আধিপত্য করে, আর চিকিৎসাসূত্রসকল স্বভাবজাত বাপার
বা প্রাকৃতিক ঘটনার উপর কর্তৃত্ব করে। তবে যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে
প্রথমপ্রবেশী তাহাদের স্থল জ্ঞানের অন্য ব্যাকরণসূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া
গেল।

করিতে পারেন, ঐরূপ নিয়মের নামই সূত্র (গ) । ঐরূপ জ্ঞান-কেই সূত্র-জ্ঞান বলে । যাহার সূত্র যত ব্যাপক বা যত অব্যভিচারী তাহার সূত্র তত পরিপক্ব ও তত প্রশংসনীয় । সৌত্রিক বা লাক্ষণিক প্রথার সন্ধান না পাইলে, মনুষ্য কোন বিষয়ই আয়ত্ত করিতে পারিত না । এই কারণে কোন প্রবীণ পণ্ডিত বলেন—

“ঋষয়োহপি পদার্থানাং নাস্তং যান্তি পৃথক্‌দশঃ ।

লক্ষণেন তু সিদ্ধানামস্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ ॥”

কোনরূপ নিদর্শনাদি ব্যতিরেকে শাস্ত্রমাত্রেরই প্রায় সূত্রনির্ম্মাণ হয় না, সূত্রের চিকিৎসা শাস্ত্রেরও সূত্র একেবারে বিনা নিদর্শনে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা নস্তুবপব নহে । কোন স্থলে কোন ঘটনা অথবা প্রত্যক্ষ হওয়া চাই (ঘ) । সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনুসারে

(গ) সূত্রগাং সূচনাং গীবনাচ্চাৰ্থসম্বতেঃ সূত্রং ।

চক্রপাণি ।

(ঘ, ১) অন্ন-রন্ধন স্থালীর উপরিস্থিত শরাবের উত্থান ও পতন দৃষ্টি করিয়া জ্বেষ্মন্ ওয়াট্ জলীয় বাষ্পের যে কার্যসামর্থ্য শক্তি অবধারণ করেন, তাহা হইতেই এখন বৃহৎ অর্গবধান সুদীর্ঘ শকট শ্রেনী ও শত শত যজ্ঞ পরিচালিত হইতেছে ।

২ । উদ্যানস্থিত আপেল ফলের পতন দৃষ্টি করিয়া গরু আইজাক্ নিউটন্ পৃথিবীর যে আকর্ষণী শক্তির অনুমান করেন, তাহা জগদ্ব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মূল সূত্র ।

৩ । জ্ঞানার্থ জলাধারে অবগাহনকালে শরীরের লঘুতা অনুভব করিয়া আর্কমিডিস্ জলাদিতে ভাসমান দ্রব্যের ভারাপচয়েব যে কারণ অবধারণ করেন, তাহা হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক নিয়মের সূত্রপাত হয় ।

৪ । একদা ঝটিকা কালে ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ী উড়াইতে উড়াইতে তড়িত ক্ষুণ্ণ লিঙ্গই যে, বিদ্যুতের অংশ ইহা অবগত হইয়া বিদ্যা ও তাহার শক্তির আবিষ্কার করেন, তাহাই বর্তমান টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রের মূল পত্তন ।

অনুমান, অনুভব ও যুক্ত ইত্যাদির বলে সূত্রসকল উদ্ভাবিত হয়। সেই উদ্ভাবিত সূত্র সকল পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ ফলের সহিত সঙ্গত করিয়া দৃঢ় করা হয়। যৎকালে সূত্র দৃঢ় বলিয়া স্থির হইল, কোন স্থলেই আর উহার ব্যভিচার না দেখা গেল, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। মহত্ম যোজন

৫। এক সময়ে গ্যালিলিও এক ধর্ম-শালায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, যে সেই গৃহের উপরিভাগে একটা ঘণ্টা ছলিতেছে, এবং দোলনক্রিয়ার সমভারে হ্রাস হইতেছে, তদর্শনে তিনি প্রমাণ করিলেন যে এক নির্ধারিত বিন্দুতে সংলগ্ন গোলক সমভাবে ছলিবে, এই ঘটনা হইতেই অগতের মহোপকারক সময়-জ্ঞাপক ঘটিকা যন্ত্রের আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়।

৬। একদা গ্যালিলিও শুনিলেন যে, জেন্সন্ নামে এক এলন্দাজ পণ্ডিত এমন এক খেলনার সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তদ্বারা বস্তু সকলকে বিপরীত দেখা যায়, ইহা শুনিয়া তিনি সেই খেলনা ক্রয় করিলেন এবং ঐ খেলনা অবলম্বন করিয়াই ক্রমে জ্যোতিষ সমূহের তথ্যাবধারণের মূল স্বরূপ দূরবীক্ষণযন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন।

৭। পাস্কাল নামে এক পণ্ডিত বহু অনুসন্ধানে অবধারণ করিলেন যে “তরল পদার্থের এক দিকে চাপ প্রয়োগ করিলে, তাহা তাহার চারিদিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়” এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই প্রায়সিক বারি-ঘটিত ব্রামাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়, এবং এক্ষণে তাহারই কল্যাণে, হাইড্রলিক মেশিনে স্রবহৎ গাঁইট সকল ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া দূরদেশে প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে।

৮। কথিত আছে, অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিয়া জরের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাহা হইতেই হানিম্যান্ সঞ্চারিত চিকিৎসার সূত্রাংশ নিষ্কাশন করেন, সেই সূত্র হইতেই চিকিৎসাবিদ্যার আর একটা ভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া আজ বিশ্বব্যাপক হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূমিতে সূত্রবিষয়ক ইত্যাদি বহুল ইতিহাসের অভাব নাই।

অন্তরের কার্য্য সকল, সহস্র বৎসর পূর্বের বা পরের ব্যাপার-সমূহ তখন আর দূরস্থ বলিয়া বোধ হয় না । হস্তাগলকের ন্যায় সন্নিহিত বোধ হয় । অনুধ্যান করিলে সমস্ত জগৎ বুদ্ধি-দর্পণে সংক্রামিত হয় । এই সূত্র সংকলনে যিনি যে পরিমাণে পটু, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানী বা সেই পরিমাণে যোগী । আয়ুর্বেদশাস্ত্রেব উক্ত সূত্র কোন্ আদর্শ অবলম্বন করিয়া ও কোন্ প্রণালীতে প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষা প্রবন্ধে আলোচিত হইবে ।

আয়ুর্বেদীয় সূত্র-সমূহ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (ঙ) । হেতুসূত্র, লক্ষণসূত্র ও ঔষধসূত্র । হেতুসূত্র দ্বারা রোগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হেতু সকল সঙ্কলন করা যায়, এবং লক্ষণসূত্র দ্বারা, ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান চিহ্ন এবং পীড়ার শুভাশুভ ফল স্থির করা যায়, ঔষধসূত্র দ্বারা রোগের ঔষধ বা প্রতিকারোপায় নির্ণয় করা যাইতে পারে । হেতুসূত্র ও লক্ষণসূত্র ভিন্নপ্রবন্ধে আলোচিত হইবে । ঔষধসূত্রই আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য ।

ঔষধসূত্র দ্বারা প্রাতি-রোগে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, সে সকল ঔষধের ক্রিয় পদ্ধতি হওয়া চাই, ক্রিয় পদ্ধতি বিপাক প্রভৃতির প্রয়োজন, কোন্ প্রকার দেশে বা কোন্ প্রকার কালে বা কোন্ প্রকার প্রকৃতিতে ক্রিয় দ্রব্য আবশ্যিক, কোন্ ব্যক্তির প্রাতি বা কোন্ রোগের পক্ষে ক্রিয় আহার আচরণ প্রভৃতি পথ্য বা অপথ্য, কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত মানবের ক্রিয় শুভাশুভ সম্বন্ধ ইত্যাদি অত্যাৱশ্যক তত্ত্ব সকল সঙ্কলিত হইয়া থাকে ।

(ঙ) হেতুনির্দোষ-জ্ঞানং স্বস্থাতুরপরায়ণং ।

ত্রিসূত্রং শাস্ত্রতঃ পুণ্যং বুধে যঃ পিতামহঃ ॥ চরকঃ ।

কেহ কেহ উক্ত তিন প্রকার সূত্র ভিন্নও স্বতন্ত্র ক্রিয়াসূত্র (চিকিৎসা-সূত্র) স্বীকার করেন, সূত্ররাং তাঁহাদের মতে সূত্র চারিপ্রকার ।

রোগের যেমন বিচিত্র অবস্থা অর্থাৎ কোন রোগে মল-ভেদ জন্মায়, কোন রোগে বা মল কঠিন করে, কোন রোগে শীতানমন করে, কোন রোগে বা উত্তাপদান করে, ঔষধেরও তেমন ভিন্ন ভিন্ন শক্তি । কোন ঔষধ তেদক, কোন ঔষধ ধারক বা গ্রাহক, কোন ঔষধ শৈত্য জনক, কোন ঔষধ বা তাপোৎপাদক ইত্যাদি । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা লক্ষণ-যুক্ত রোগে কিরূপ ধর্মবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ বিধের, ইহা বুঝাইবার জন্য ঋষিদিগকে অনেক সূত্রের সঙ্কলন করিতে হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথমে আমরা সামান্য সূত্রের ব্যাখ্যা করিব । তৎপরে আবশ্যক স্থলে বিশেষ সূত্রগুলি বিশদ করা যাইবে । কেন না বিশেষ জ্ঞানের পূর্বে সামান্য জ্ঞান হওয়া উচিত । উক্ত সূত্র এই—

“যথাস্থং সর্কেযাং বিকারাণামপিচ নিগ্রহে

হেতুব্যাধিবিপরীমৌষধমিচ্ছন্তি কুশলান্দুর্দর্থকারি বা ।” (চ)

চরক বিমানস্থান দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অর্থাৎ সমুদয় রোগের প্রতীকারার্থে (১) হেতুবিপরীত, ব্যাধি-বিপরীত এবং উভয়বিপরীত অথবা (২) হেতু বিপরীতার্থকারী,

(চ) মূলে যে, সূত্রের উল্লেখ করা হইল, সেই সূত্রের এবং চরকের নিদান স্থানোক্ত “উপশয়ো হেতুবিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিণামৌষধান-বিহারাণামুপযোগঃ সুখাবহঃ” । এই সূত্রের ভিত্তি একই । বাভট প্রোক্ত সূত্র ঘরের যথাক্রমে নিজ পদ্যে নিম্নলিখিত অনুবাদ করিয়াছেন, যথা—

——বৈদ্যো যুজ্যাদব্যাধিবিপর্যায়ম্ ।

তদর্থকারি বা——

॥ সূত্রস্থান ৮ম অধ্যায়ঃ ।

হেতুব্যাধিবিপর্যাস্তবিপর্যাস্তার্থকারিণাং ।

ঔষধানু বিহারাণামুপযোগঃ সুখাবহম্ ।

বিদ্যাভূপশয়ঃ ব্যাধেঃ সহি.সাত্মা ইতি শ্রুতঃ ।

নিদান স্থান ১ম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাধিবিপরীতার্থকারী এবং উভয়বিপরীতার্থকারী ঔষধ, যথাযথ স্থল বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে । (ছ)

এইটিকে সাধারণ সূত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমুদয় রোগের চিকিৎসাতেই ব্যাপক । রোগ যেকোন প্রকৃতির বা যে প্রকার ধর্মের কেন না হউক, সমুদয় রোগেরই ঔষধ ইহা দ্বারা সাধারণতঃ নির্ধাচন করা যাইতে পারে । প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও যুক্তি-বলে স্থির হইরাছে, যে, বিরোধী পদার্থ বা ক্রিয়ার সম্পর্কে পদার্থ সাত্ত্বেরই হ্রাস বা বিনাশ সাধন হইয়া থাকে, শীত দ্বারা উষ্ণনিবারণ এবং উষ্ণ-যোগে শীত-প্রতিকার ইত্যাদি ব্যাপার স্বভাব-সিদ্ধ । এই স্বাভাবিক কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্বাহ হইয়া থাকে । উক্ত প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বৈপরীত্য বা বিরোধিতাই হ্রাস বা বিনাশের হেতু । ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (জ) । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে স্ববিগণ স্থির করিলেন, যে, যে রোগ যে কারণে উৎপন্ন, অথবা যেকোন ধর্মযুক্ত, উহার বিরোধী দ্রব্য বা ক্রিয়াই সেই রোগের ঔষধ বা প্রশমক । উক্ত বিরোধিতা অনেক প্রকার । স্থূলতঃ উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা,—সাক্ষাৎ-বিরোধিতা, পরম্পরিত-বিরোধিতা ও প্রভাব-কৃত বিরোধিতা ।

১ ম । সাক্ষাৎ বিরোধিতা—ঔষধ শরীরের সহিত সম্পর্কিত হইবা
মাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অব্যবহিত
পরেই যে বিরুদ্ধ বা বিপরীত ক্রিয়া

(ছ) এখানে ইহা বুঝা আবশ্যক যে প্রথম সংখ্যক ঔষধ এক শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় সংখ্যক ঔষধ আর এক শ্রেণীর । প্রথম শ্রেণীর ঔষধগুলিকে রিপারীত ঔষধ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধগুলিকে রিপারীতার্থকারী ঔষধ বলা যায় ।

(জ) এখানে জানা আবশ্যক, বাঁহারা সদৃশ মতের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের ঔষধ আপাততঃ সদৃশ হইলেও কোন কারণ বশতঃ বিরোধিতাই প্রকাশ করে, এই কারণ কি তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে ।

প্রকাশ করে তাহা সাক্ষাৎ বিরোধিতা । যথা,—অগ্নিতাপে শীত-নিবারণ এবং জল-সেচনে দাহ বা তাপ-প্রশমন ইত্যাদি ।

২য় । পরম্পরিত-বিরোধিতা—ঔষধ শরীরে সংলগ্ন হওয়া মাত্র প্রথমতঃ এক প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক বা তাহার পরে যে আর এক প্রকার বিরোধি-ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা পরম্পরিত-বিরোধিতা । যথা,—বিরেচন-নিবারণার্থে উদরে আত্মবজ্র-প্রলেপ অথবা বমন নিবারণার্থে সূর্য-প্রভৃতির লেপ ইত্যাদি (ক) ।

৩য় । অভাব-কৃত-বিরোধিতার বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে ।

এমন স্থল আছে, যে স্থলে কারণের নাশ বা বিলোপ-সাধন হইলে, কার্যেরও বিনাশ ঘটে, এমন উদাহরণ পাওয়া যায়, যেস্থলে কার্যের বিনাশ ঘটিলে তাহার কারণ আপনা হইতেই লয় পায় ।

আবার এমন দৃষ্টান্ত বহুল পাওয়া যায়, যে স্থলে কারণ ও কার্য উভয়কে একদা আক্রমণ না করিলে, উহাদের বিনাশের সুযোগ ঘটে না । ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম (এ) । রোগ এবং উহার প্রতীকারপ্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, সুতরাং উক্ত নিয়মেরও অধীন । এই নিয়মের অধীন বলিয়া ঋষিগণ ঔষধ (বিপরীত বা বিপরীতার্থকারী) ত্রিবিধ প্রকার গণনা করিয়াছেন ।

(ক) নির্দীর্ঘক-বচালোধ নৈকবৈশ্চ প্রলেপনং ।

বমনঞ্চ নিহন্ত্যাপিড়কাং যৌবনোন্তবাম্ ॥ ভাব প্রকাশঃ ।

সৌরীর-পিষ্টাশ্রবজল-লেপোহতিমারহা । চক্রপাণিঃ ।

(এ) এই স্থলে কয়েকটা বিচার্য্য কথা আছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে ।

বিপরীত ঔষধ ।

কথিত নিয়মানুসারে এই ঔষধ তিন প্রকার ।

- ১। হেতুবিপরীত (নামান্তর) হেতুবিরোধী বা হেতুনাশক ।
- ২। ব্যাধিবিপরীত (নামান্তর) ব্যাধিবিপরীত বা ব্যাধিনাশক ।
- ৩। উভয়বিপরীত (নামান্তর) হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত বা হেতু ব্যাধি উভয় নাশক ।

১। হেতু বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ হেতু অর্থাৎ উৎপাদক কারণের বিপরীত ধর্ম যুক্ত অথবা উৎপাদক কারণের বিনাশ ঘটিলে, যদ্বারা পীড়ার শাস্তি হইতে পারে, সেই সমস্ত ঔষধকে হেতুবিপরীত ঔষধ বলা যায় । যথা,—শ্লেষ্ম-জ্বরে শুষ্ঠা অথবা কুমি-জনিত বমন বা শূলরোগে কুমি-নাশক ঔষধ ।

২। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধে রোগের শক্তিকে অগ্রোৎখার করে, যে কারণে (বায়ু, পিত্ত বা কফ) রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগ না করিলেও চলিতে পারে । কেন না রোগের কারণ স্থায় বা ক্রিয়াস্তর দ্বারা নিবৃত্ত হয়) সেই সকল ঔষধের নাম ব্যাধিবিপরীত । যথা,—খদির, কুষ্ঠ নাশক ; হরিদ্রা, মেহ-নাশক ; অহিফেন-অতীসার-রোধক ইত্যাদি ।

৩। উভয় বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ উভয়কেই একদা প্রশমিত করিতে সক্ষম, সেই সকল ঔষধকে উভয়বিপ-

রীত ঔষধ বলা যায় । যথা,—
বাতজনিত শোথ রোগে দশমূল;
পিত্তশ্লেষ্মাঘরে তিক্তরস ইত্যাদি ।

বিপরীতার্থকারী ঔষধ ।

- ১। হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ (নামান্তর) হেতুসদৃশ ঔষধ ।
- ২। ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধ (নামান্তর) ব্যাধিসদৃশ ঔষধ ।
- ৩। উভয়বিপরীতার্থকারী ঔষধ (নামান্তর) হেতু-ব্যাধি উভয়
সদৃশ ঔষধ ।

১। হেতুবিপরীতার্থকারী ঔষধ—যে সমস্ত ঔষধ হেতুর সমান-
ধর্মী অর্থাৎ যে কারণে রোগ
উৎপন্ন হয়, তাহার যেরূপ ধর্ম
বা ক্রিয়া তদ্রূপ ধর্ম বা ক্রিয়াযুক্ত
হইয়াও রোগ প্রতীকারে সক্ষম ।
সেই সমস্ত ঔষধকে হেতু বিপ-
রীতার্থকারী ঔষধ বলা যায় ।
যথা,—মদ্যপান জনিত রোগে
মদ্য ।

২। ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধ—রোগের যেরূপ ধর্ম সেইরূপ
ধর্ম বা ক্রিয়াযুক্ত ঔষধকে
ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা
যায় । যথা,—উন্মাদ রোগে
ধূতুর, অম্লপিত্ত রোগে জ্বর-
রস, বমন রোগে মদন ফল (৬)
ইত্যাদি ।

(৬) এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক ।
আমরা অম্লকৌলসঞ্জীবনীর প্রথম সংখ্যার এক স্থানে লিখিয়া ছিলাম,

২। উভয়বিপরীতার্থকারী ঔষধ—যে সমস্ত ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ উভয়ের সম-ধর্মী-ক্রান্ত হইয়াও রোগ প্রতীকারে সক্ষম, তাহাকে উভয় বিপরীত-ার্থকারী ঔষধ বলা যায়। যথা,—
অগ্নি-দক্ষ স্থানে অগ্নি-সম্ভাপ এবং
উষ্ণবীৰ্য্য বস্তুর প্রলেপ ইত্যাদি।

তিন প্রকার সদৃশ ঔষধের মোটামুটি লক্ষণ মাত্র বলা হইল।
উহাদের পরস্পর প্রভেদ কি, প্রাণধানপূর্বক বুঝা আবশ্যিক।

যে, “সদৃশচিকিৎসাপ্রণালী আয়ুর্বেদের অন্তর্ভূত” এই বিষয়ে পণ্ডিতবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, “এই বিষয় আমরা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিলাম না” উক্ত সম্পাদক মহাশয় আমাদের লিখিত বিষয় কতদূর প্রামাণিক তাহা অবগতির জন্য বিজয়রক্ষিত এবং আতঙ্ক-দর্পণ নামক দুইখানি নিদান-টীকায় লিখিত মদনফলের বাখ্যা তাঁহার পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ফলের বসন নিবারণবিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিয়াই তিনি সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। দশবৎসর পূর্বে প্রবন্ধলেখকেরও ঠিক ঐরূপ সন্দেহ ছিল। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় ঔষধের তাত্ত্বিক পরিবর্তন আলোচনা করিয়া লেখকের সেই সন্দেহের অপনয়ন হয়। বিজয়রক্ষিত বা আতঙ্ক-দর্পণ প্রায় একই টীকা। উহাদের বাখ্যা বৈদিকসময়ে ঔষধপ্রয়োগের যেরূপ প্রণালী বা সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই প্রণালী বা সূত্র অবলম্বন করিয়াই লিখিত, কিন্তু তাত্ত্বিক সময়ে যে উহার কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা উক্ত টীকাকারধর অনুসন্ধান করেন নাই, অথবা তাঁহাদের অনুসন্ধানের আবশ্যকতাই হয় নাই। সেই পরিবর্তন এতদূর বিবৃত করা আমাদের প্রয়োজন নহ, তবে একটীমাত্র উদাহরণ দ্বারা তাহার আভাস দেওয়া গেল। বৈদিকসময়ে সর্পাহত ব্যক্তির শরীরে স্থাবরবিষ প্রয়োগ করিয়া তাহার চৈতন্য ও আরোগ্য সম্পাদন করা হইত। এবং এই বিষয় লইয়াই স্থাবর বিষ জঙ্গমবিষের ঔষধ এবং জঙ্গমবিষ স্থাবর বিষের ঔষধ এই সিদ্ধান্ত তৎকালে সকল চিকিৎসকই অবলম্বন করেন।

হেতুসদৃশ এবং ব্যাধিসদৃশ এই উভয়ে প্রভেদ এই যে, হেতু-
সদৃশ কেবল হেতুরই (যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়) সদৃশ ।

ভারত রচয়িতা ভগবান্ বাসদেবও বিযপানে মৃতপ্রায় ভীমের সর্পদংশনে
পুনর্নৈচতন্তম্পাদন পক্ষেও ঐ যুক্তিই প্রদর্শন করেন । কিন্তু তাত্ত্বিক-
সময়ে সর্পাহত ব্যক্তির অচৈতন্যাবস্থায় সর্পবিষ অন্নমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া
তাহার আরোগ্য সম্পাদনের উপদেশ আছে । তাত্ত্বিক গ্রন্থ পর্যালোচনা
করিলেই একরূপ বহুল উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে “শ্রুয়তে হি যথা
লোকে বিষণ্য বিষমৌষধম্” এই কালিদাসের উক্তি ও উক্ত তাত্ত্বিক
যুক্তিগূলক, দ্রবোর অন্নমাত্রা যে বিরোধি-শক্তি প্রকাশ করে, ইহা তাত্ত্বিক
সময়েই প্রস্ফুট হয় । অরুণদত্ত দ্রবোর গুণবৈপরীত্য প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ।

“অণুশো (তিলশো) নিষেব্যমানং বিষমপি সঞ্জায়তেহমৃতসমানম্ ।

* ভল্লাতকং সহ তিলৈস্তৎ কার্যমপি কুষ্ঠমুপহন্তি ।

সংস্কারেণ লঘুভাঃ শক্তুভাঃ সিদ্ধপিণ্ডিকা গুরবঃ ॥” ইত্যাদি ।

অর্থাৎ পরিমাণ, দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণ, সংস্কারাদি বশতঃ দ্রবোর
বিপরীত ফল প্রকাশ পায় । যথা,—বিষ অণুমাত্রায় সেবন করিলে তাহার
বিপরীত ফল প্রসব করে । ভল্লাতক কুষ্ঠ জনক হইলেও তিলের সহিত
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ নাশক হয় । এবং লাজশক্তু
লঘুপাক হইলেও পিণ্ডাকারে মোদুকাদি প্রস্তুত করিয়া লইলে গুরুপাক হয়,
ইত্যাদি । সদৃশ বস্তু অন্নমাত্রায় যে বিরোধি-ফল প্রকাশ করে, তাহা এইরূপ
নিয়মে পরীক্ষা করিয়া তাত্ত্বিক সময়ে অনেক ঔষধের প্রয়োগ হইয়াছিল ।
সৈকো, কুচিলা, ভেলা প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিখ্যাত ঔষধের মূলমূল্য সম্বন্ধে
তাত্ত্বিকগণ প্রোক্ত বচনই উল্লেখ করিয়াছেন । রসেন্দ্র-চিন্তামণিপ্রভৃতি
গ্রন্থ আলোচনা করিলে সহজেই উহার গীমাংসা হইতে পারে । আমরা
সদৃশ চিকিৎসা আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিলেও অবিকল হানিমানের চিকিৎসা
নাই যে আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত ইহা বলি না । কোন কোন অংশে কিছু
কিছু মতভেদও আছে । হয় ত হানিমানের চিকিৎসায় কিছু দোষও
থাকিতে পারে । সেই দোষই মতভেদের কারণ । যাহা হউক এই বিষয়
“প্রচলিত চিকিৎসাসমূহের দোষগুণবিচার” নামক গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে
আলোচিত হইবে ।

ব্যাধির যে প্রকার লক্ষণ হউক না কেন, তাহার সহিত সাদৃশ্যের কোন আবশ্যকতা নাই। মনে কর পান-দোমে অজীর্ণ, দাহ ও পিপাসাপ্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ উপস্থিত হইতে পারে, ইহাদের যে কোন রোগ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হউক না কেন, সমস্ত রোগেই মদ্য প্রয়োগ করা যায়। ব্যাধিসদৃশ ঔষধ ঐরূপ নহে। অর্থাৎ যে কোন কারণে রোগ উপস্থিত হউক না কেন, ঔষধ কারণের সদৃশ না হইয়া রোগের সদৃশ হওয়া চাই। মনে কর ধুস্তুর-সেবনে উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ধুস্তুর ভিন্ন অন্য কোন কারণে যদি উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে ধুস্তুরপ্রয়োগ করাই যথার্থ ব্যাধি সদৃশ ঔষধ। উভয় সদৃশ ঔষধ উভয়ের মিশ্র লক্ষণ-যুক্ত। যথা,—পারদ জনিত ক্ষত রোগে পারদ অথবা অগ্নি-দগ্ধ স্থানে ঐ অগ্নিরই সম্ভাপ ইত্যাদি।

ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যবিধান ।

স্বাস্থ্যই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। শরীর সুস্থ না থাকিলে সমগ্র পৃথিবী, পার্থিব সমুদায় ঐশ্বর্য্য—দান, ধ্যান, যোগ, ভোগ, মন আর কিছুতেই তৃপ্তি মানে না। অসুস্থ ব্যক্তির নিকট সমুদায় সংসার যন্ত্রণার আকর বলিয়া বোধ হয়। ভোগসুখ সকল সমল ও ক্ষণিক। ভোগে রোগ-ভয় আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যসুখ বিমল ও দীর্ঘব্যাপী। ক্রমাগত ভোগ সুখ করিতেই ভোগ্য বিষয়ে সুখানন্ডব করিবার শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্য সুখ বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। ভোগ সুখে কেবল যে ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস হয়, তাহা নহে; পরন্তু তাহাতে মন অসৎ সংকল্পের আবাস হয় এবং বুদ্ধি-বৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সুখে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন তিনেরই স্ফুর্তি হইয়া থাকে, তাহাই স্বাস্থ্যসুখ। বিবিধ আয়োজনের ও

অনেক চেষ্টার পর তবে ভোগ সুখ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য সুখ অনেক পরিমাণে আয়ত্তাধীন।—রাজা বা ধনী না হইলে—বিধিমত চেষ্টা না করিলে ভোগ সুখের অধিকারী হওয়া যায় না। কিন্তু কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্জন—সকলেই স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী। যাহা অগ্রে সম্মোহনকর, কিন্তু পরিণামে বিষময়, তাহা ভোগ সুখ—তাহাই তামসিক; কিন্তু যাহা অগ্রে অপ্রীতিকর, কিন্তু পরিণাম রমণীয়, তাহাই স্বাস্থ্য সুখ—তাহাকে শাস্ত্রকারগণ সাত্বিক বলিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আছে যে, যাতাতে দেহ সমদোষ, সমাগ্নি ও সমধাতু হয়—যে সুখে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন তিনিই প্রসন্ন থাকে, তাহাই স্বাস্থ্য সুখ। সুতরাং আত্মধর্মে মনোধর্মে ইন্দ্রিয়ধর্মে ও দেহধর্মে যে সুখ লাভ হয়, অথবা আত্মা-ইন্দ্রিয় ও দেহ ইহাদের একতান সামঞ্জস্যে যে সুখ হয়, তাহাকেই আমরা স্বাস্থ্য সুখ বলি। যাহা দেহের অনুকূল, কিন্তু মনের প্রতিকূল, যাহা আত্মার অনুকূল, কিন্তু দেহের প্রতিকূল তাহাকে স্বাস্থ্যসুখের মধ্যে গণনা করা যায় না। কিন্তু যাহা জীবের দেহ, মন ও আত্মা তিনেরই উপযোগী তাহাকেই স্বাস্থ্যসুখ বলা যায়। এই বিবেচনায় আর্য্যগণের সমগ্র আচার ব্যবহার স্বাস্থ্যসুখের মধ্যে পরিগণিত। ধর্মবিবেচনায় যদিও আর্য্যগণ আচার প্রতিপালন করিয়া থাকেন—কিন্তু দেহের অবিরোধী ধর্মোৎপাদ্য সুখও ইহাদের স্বাস্থ্যের প্রতাপোষক। এই কারণ আয়ুর্বেদের স্বাস্থ্য প্রকরণে স্মৃতি শাস্ত্রের অধিকাংশ আচার প্রকরণ নিক্রপিত হইয়াছে। দেহ, মন ও আত্মা লইয়াই মনুষ্য। এই তিনের সামঞ্জস্যসুখই মনুষ্যের স্বাস্থ্য। কিন্তু আমরা স্থূল বুদ্ধিতে কেবল দেহোৎপাদ্য সুখকেই মনুষ্যের স্বাস্থ্য বলিয়া বিবেচনা করি এবং এই দেহোৎপাদ্য সুখের দিকে কেবল দৃষ্টি প্রসারিত করি বলিয়া ভোগ সুখের সহিত স্বাস্থ্য সুখের প্রভেদ বিবেচনা করিতে পারি না।

আজ কাল জনসমাজ ভোগসুখের জন্য যে প্রকার ব্যস্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্যসুখের জন্য তাহার কিয়ৎ পরিমাণও চেষ্টা দেখা যায় না। অর্থ উপার্জন করিয়া বিবিধ ভোগসুখে গা থাকিব, মনুষ্যের ইগাই একমাত্র কৰ্ম এবং চেষ্টা। ভোগ-সুখ উৎপাদন করিবার জন্য কল, কৌশল, যন্ত্র, বিজ্ঞান ও শিল্পাদির দিকেই মানববুদ্ধির একমাত্র প্রেরণা। যত কিছু বাহ্য আড়ম্বর দেখিতে পাও, সকলি ভোগসুখের জন্য। স্বাস্থ্যসুখের জন্য এত আড়ম্বর—এত আয়োজনের অতি ভুলই প্রয়োজন হইয়া থাকে। দিনে দিনে সভ্যতাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে মানবায়ু হ্রাস ও মানবজীবন রোগময় হইতেছে, স্বাস্থ্যের সহিত এই বাহ্য সভ্যতার কতদূর সম্বন্ধ, এতদ্বারা অনায়াসেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। সভ্য, সমাজসকল এক্ষণে স্বাস্থ্যের অনুকূলভাবে অবস্থিত নয়, সামাজিকতার অনুসরণ করিতে গিয়া প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু পরিমাণে স্বাস্থ্য-সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সভ্য-সমাজ সকলের ধন-বিভাগ, শ্রম-বিভাগ, কার্য-কৌশল স্বাস্থ্য-দৃষ্টিতে সম্পন্ন নয়।

অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ-নিচয় স্বাস্থ্যের বাহ্য উপাদান। নিম্নলি প্রজা ও নিষ্পাপ অন্তঃকরণ ইহার আন্তরিক উপাদান। অন্তরে আন্তরিক চেষ্টা হইতেছে ও বাহ্যে সমগ্র প্রকৃতি সেই চেষ্টার সহায়তা করিতেছে, ইহাতেই স্বাস্থ্য বিদ্যত হয়। প্রাকৃতিক পদার্থসকলের পরিমিত সেবনেই স্বাস্থ্য-সুখলাভ কবা যায়। সভ্য জগতের বিমর্ষ আড়ম্বরের মধ্যে পতিত হইয়া যে সকল পদার্থকে বা যেসকল আচারকে আমরা এক্ষণে গণনার মধ্যে আনয়ন করি না, মনুষ্যের স্বাস্থ্য সেই সমুদায় পদার্থের বা সেই সমুদায় আচারের উপরেও নির্ভর করে। জল, বায়ু, আলোক ও আহাৰ্য্য ইহাদের সেবনে একটু ইতর

বিশেষ হইলেই মনুষ্যের স্বাস্থ্যের ইতিবাচকতা হইয়া থাকে । সুতরাং এই সকল পদার্থের সাহিত্য মনুষ্যের ঘনিষ্ঠতম যোগ ও দেখা যায় । অতি তুচ্ছ দ্রব্য বা অতি তুচ্ছ কারণে যেমন আমাদের রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদের স্বাস্থ্যও তুচ্ছ কারণ-সমূহে রক্ষিত হইতেছে ।

বাহ্যে নিবিধ বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত হইয়া বিরাজ কর, অতি প্রশস্ত সুরম্য অট্টালিকায় বিবিধ-বিলাসদ্রব্য-বেষ্টিত হইয়া অবস্থান কর, কিন্তু যদি যথাকালে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন না হইয়া থাকে, তবে তোমার নিজের মন আর তোমাকে পবিত্র বলিবেনা । উহাতে শরীর স্নান হইয়া গ্লানি অনুভব করিতে থাকিবে, দৈহিক ক্রিয়া সকল বিকৃত ভাবে সম্পাদিত হইতে থাকিবেক । বায়ু বৃদ্ধি হইয়া উদর স্ফীত হইয়াছে, বৃদ্ধ শব্দ অনুভূত হইতেছে, একটু অধিককাল শরীরে জল লাগাতে মস্তিষ্ক ভার হইয়াছে, দেখিবে, তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, বিষয় ও বিভব—মন আর কিছুই পানে ধাবিত হইবেনা । আপনা হইতেই মন তখন ঐ সকল স্থানে বিচরণ করিতে থাকিবেক । শারীরিক বোগ বিমুক্ত হওয়াতে কত সময়ে সম্রাজ্য-লাভেরও অধিক আনন্দ বোধ হয়, ইহা কেনা স্মীকার করিবেন ? রুগ্নব্যক্তি সাংসারিক বাহ্য বিষয়বিভবকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা কবে । বাস্তবিকও স্বাস্থ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে সাংসারিক সমুদায় লাভই তুচ্ছ কথা । কিন্তু যাহা তুচ্ছ কথা, লোকেব আকর্ষণ এক্ষণে সেই দিকেই অধিক ধাবিত ; যাহা মানবজীবনের একমাত্র প্রার্থনীয়, লোকে এক্ষণে তাহাকেই নগণ্যের মধ্যে গ্রাহ্য করিয়া থাকে । অর্থ উপার্জনজন্য লোকের যে প্রকার চেষ্টা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহার কিয়ৎ পরিমাণও চেষ্টা নাই । মনুষ্য পঞ্চভূতসমবায়ের গঠিত, প্রাকৃতিক পদার্থ তাহার জীবনের অন্ন, সুতরাং প্রাকৃতিক পদার্থনির্ভরতার প্রতি তাহার অধিক

মনোযোগী হওয়া উচিত । এজন্ম পান, ভোজন, আসন ও শয়নাতির বিধি আমাদের পক্ষে যেরূপ গুরুত্ব বোধ হয়, জগতে অপর কোন কার্যই আমাদের পক্ষে ততদূর গুরুত্ব নথ । কিন্তু আমরা কালে কালে এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িতেছি, বিকৃতির মধ্যে—কৃত্রিমতার মধ্যে লান করিয়া আমরা এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, যে, যাহাব সহিত আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম যোগ, তাহাকে আমরা দূরের পদার্থ মনে করি ও যাহাদের সহিত আমাদের জীবনের দূরতম সম্বন্ধ, তাহাদিগকে আমরা নিকট সম্বন্ধীয় জ্ঞান করি । হস্তমৃত্তিকা উই মৃত্তিকাতে কবিত্তে নাই, একথা লোকের নিকট এক্ষণে উপহাসাস্পদ, কিন্তু অঙ্গরক্ষাব (জামার) বোদাম বাঁধুকে হইলে ভাল হয়, এই কথায় লোকের অধিক মনোযোগ হইয়া থাকে । যে স্বাস্থ্য জগতের একমাত্র বরণীয়, সেই স্বাস্থ্য বিধি পালন করিবার জন্য লোকের এক্ষণে অবকাশ নাই । কিন্তু স্বাস্থ্য বিহীনে লোকের যে বিষয় বিভব ভুচ্ছ, সেই বিষয় বিভব উপার্জনেই লোকের সম্পূর্ণ অবকাশ ।

আমাদের অম্পানীয় প্রাপ্ত কর। আমরা পথিকের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি এবং পথিকের ব্যয়ের ভার আমরা স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া তজ্জন্য ব্যস্ত থাকি । যাহা নিকটেব বস্তু তাহা দূরে গেল এবং দূরের বস্তু এক্ষণে নিকট হইল । কল কৌশলের নিয়ম কিসে রক্ষা হয়, সাধারণতঃ লোকে তজ্জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু দেহের কৌশল কিসে সূচান্ন নির্বাহ হয়, সেদিকে কাহাবও দৃষ্টি নাই । এত কৃত্রিমতার ভিতর, এত বিকৃতির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যদি গনুষ্য অজ্ঞাযু না হইবে, তবে প্রকৃতিই যে অপ্রকৃতি হয় ?

আমরা আমাদের পূর্কপুরুষগণকে নিন্দাবাদ করি, অশিষ্ট ও অসভ্য জ্ঞান করি, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের এতদূর

দৃষ্টি ছিল, যে এক্ষণে সভ্যজগৎ তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। তাঁহারা আচার প্রতিপালন করাকে সকল ধর্মেরই মূলভূত বলিয়া জানিতেন। অথ্রে আচার প্রতিপালন না হইলে তাঁহারা অর্থচেষ্ঠা বা ধর্মচেষ্ঠায় ব্যস্ত হইতেন না। প্রতিদিন শরীর সুস্থ রাখিবাব জন্য যে সকল আচরণ করিতে হয়, ভৃত্যবর্গের উপর তাহার ভার না দিয়া অথ্রে নিজে সেই সকল সমাধা করিয়া পশ্চাৎ অর্থ বা ধর্ম চেষ্ঠায় ধাবিত হইতেন। পূর্বে আর্য্যসমাজ এতদূর আত্মজ্ঞানী ছিল, যে যাহা আচার বা স্বাস্থ্য প্রতিপালন না করিত, তাহা কেহই আর্য্যসমাজ-ভুক্ত হইতে পারিত না, মুচ্ছ বোধে আর্য্যসমাজ তাহাদের সংশ্রবে রোগ হইবার ভয়ে দূরে থাকিত। আমাদের আর্য্য শাস্ত্রমকলে বিজ্ঞানের তথ্য তত পাও বা না পাও, ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় আচার প্রতিপালনে কিরূপে শরীর সুস্থ রাখতে হয় তাহা দেখিতে পাইবে। ভোগ সুখ অপেক্ষা আর্য্যগণ স্বাস্থ্যসুখকে এত ববণীয় মনে করিতেন, যে উহা তাঁহাদের প্রধান ধর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। স্বাস্থ্য-প্রতিপালন না করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা স্বাস্থ্যের উদ্দেশে এত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয় সকল চিন্তা করিয়াছিলেন, যে এত দূরবর্তী সময়েও ঐ সমস্ত বিষয় কিরূপে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রাহ্ম্য-মুহূর্তে গাত্রোথান করিয়া কি প্রকারে শৌচকার্য্য সমাধা করিতে হয়, স্নান করিবার কালে স্রোতেব কোন অভিমুখে স্নান করিতে হয়, কোন্ কোন্ দ্রব্য দন্তধাবনে প্রাপ্ত, কোন্ কোন্ সময়ে শৌচ-কার্য্য প্রাপ্ত, শয়নকালে কোন্ কোন্ শিরে শয়ন করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, কোন্ কোন্ বস্ত্র কোন কোন কালে পরিধেয়, ইত্যাদি হিতকর বিষয় আর্য্যগণের শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে, তদ্রূপ অন্য কোন জাতির শাস্ত্রে আছে কি না, সন্দেহস্থল।

এমন অনেক আয়ুৰ্ঘ্য নিষ্ঠাটাবেব উল্লেখ আছে, যে আজ কালির বিজ্ঞানের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও সেই সকলের মৰ্ম উদঘাটনে সমর্থ নহে । আমাদের আয়ুর্বেদের চিকিৎসিতস্থান তত ব্যাপক হউক বা না হউক, কিন্তু ইহার স্বাস্থ্য প্রকরণ যেমন স্বন্দর, বোধ হয়, কোন জাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই রূপ নাই । বাস্তবিকও স্বাস্থ্য প্রকরণ ব্যাপক হইলে ঔষধপ্রকরণব্যাপক হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতি কি ? যে জাতি স্বাস্থ্য রক্ষণে সম্যক যত্নশীল, রোগের ঔষধ অনুধাবনে তাহাদের তত আয়াস গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, বাহ্য বিষয়ের দিকে যাহাদের দৃষ্টি অধিক তাহারা অধিক আত্মজ্ঞানী, না যাহাদের শরীরের দিকে দৃষ্টি অধিক তাহাদের বিশেষ আত্মজ্ঞান আছে বলিতে হইবেক ?

বিকৃত আহার ও বিকৃত আচরণ দ্বারা বোগ উৎপাদন করিয়া তাহার ঔষধ অনুসন্ধান করা অপেক্ষা বাহাতে মূলে বোগ উপস্থিত হইতে না পারে সেই বিষয়ে সদা জাগরুক থাকা যে পরিণাম-দর্শীর কার্য ইহা কে না স্বীকার করিবেন ? বাহাতে আদৌ বোগ উৎপন্ন না হয় এজন্য প্রাচীন আৰ্য্যগণ অনাগত-বাধ প্রতিষেধ প্রকরণের সম্যক প্রসংসা ও আলোচনা করিয়া থাকেন । কেন না, গাত্রে পঙ্ক লেপন করিয়া উহা ধৌত করা অপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ না করাই শাধু সম্মত কার্য ।

যেমন রোগের অনুভূতি সকলের থাকে স্বাস্থ্যের অনুভূতি তদ্রূপ সকলের থাকে না । মনুষ্য সমাজ এতদূর বিকৃত হইয়াছে, যে প্রকৃত স্বাস্থ্য-সুখ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না । শরীরের ভিতর একটুও গ্লানি নাই মন ও আত্মা সকলই সুপ্রসন্ন, এমন ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল । সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা পৈতৃক বা মাতৃক বীজদোষে পুঙ্কলাঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই ; কাহারও দেহে বা

কৌলিক রোগ চিরবসতি করিতেছে, কেহবা অযথা ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া জন্মের মত শাস্ত্যবিহীন হইয়া ভগ্ন-তরুন ন্যায় সংসার তরঙ্গে সশঙ্কভাবে ভাসমান বহিয়াছে, দরিদ্র অবস্থায় জগৎগ্রহণ করায় অপারিমিত শ্রম করিয়া কেহবা শাস্ত্যহীন হইয়াছে, বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত থাকিতে কাহারও বা শাস্ত্যভঙ্গ ঘটিয়াছে—এইরূপ সমুদায় লোকের মধ্যেই একটী না একটী ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত শাস্ত্য কি তাহা মনুষ্য সমাজে এক্ষণে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় না।

আপনাতে আপনি অবস্থান করার নাম স্বস্থ বা প্রকৃতিস্থ। কিন্তু সমুদায় বিকৃতির মধ্যে মনুষ্যের আদিম প্রকৃতি কি তাহা এক্ষণে অনুভব করা দুর্লভ ব্যাপার। প্রকৃত স্বস্থ শরীরে দৈহিক শ্বাস শ্রাসাদি ক্রিয়া সকল কি পরিমাণে ? কিরূপ ভাবে নির্বাহ হওয়া উচিত, নিদ্রা, স্বপ্ন, স্মৃতি ও স্মৃতি-ভ্রমাদি দৈহিক ব্যাপার সকল কিরূপে সমাধা হওয়া অথবা প্রবৃত্তি নিচয়ের উদ্দেশ্যে কোন কালে কিরূপ ভাবে হওয়া যে মনুষ্য প্রকৃতির স্বভাব সিদ্ধ তাহা এক্ষণে কে বলিবে ? সুতরাং শাস্ত্য শব্দ আমরা আপেক্ষিক ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের অপেক্ষা আর একজন অপেক্ষাকৃত সুখী বা দুঃখী এইরূপ বিবেচনায় যেমন সুখ দুঃখ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, শাস্ত্য কথাও তদ্রূপ চলিতেছে, তথাপি মানব সাধারণের শাস্ত্য পর্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্যের বৈকল্পিক সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করিয়া থাকেন, আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্যের আদর্শের সহিত অপরাপর জাতির শাস্ত্যের আদর্শ কিরূপ কি কি মূল কারণেই বা শাস্ত্য বিকৃত হইয়া থাকে, তদ্বিময় ক্রমে আলোচিত হইবে।

রোগ ও রোগের বিভাগ ।

২য় খণ্ডে প্রকাশিতের পর ।

অতি বলিষ্ঠের সহিত দুর্বলের বাহ্যবুদ্ধাদিবশতঃ শারীর যন্ত্রাদির বিলোড়ন বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনাশ বা অকর্ষণাতা প্রভৃতি যে সমস্ত আগন্তু [১] পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সংঘাত-বল-প্রবৃত্ত রোগ বলে । এই শ্রেণীর পীড়া সমূহ আধিভৌতিক রোগ মধ্যে গণ্য । ইহা স্থূলতঃ দুই প্রকার । যথা,—

১ শস্ত্রাদিকৃত ,— ২ ব্যাঙ্গাদিপ্রাণি-কৃত ।

তরবারি, বর্ষা, হস্তের মুষ্টি প্রভৃতি শস্ত্র, বা তীর, গুলি, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা আঘাত, অথবা পর্কত, রক্ষাদি অত্যাচছ প্ৰাণ হইতে নিম্নে পতন, ইত্যাদি কারণে শারীরযন্ত্রাদি অতিশয় আহত হওয়াতে আংশিক বিকৃতিপ্রাপ্ত বা বিপর্য্যস্ত এবং বাতাদিদোষ পদার্থের প্রকৃতির অন্যথাভাব হইলে, তাহাকে শস্ত্রাদিকৃত আগন্তু রোগ বলে ।

ব্যাঙ্গ, ভল্লুক, কুক্কুব, সর্প প্রভৃতি জন্তুতে দংশন করিয়া কোনও প্ৰাণ ক্ষত করিলে, তদ্বারা শরীরের বিকৃতি এবং তাহাদিগের বিষ দ্বারা দেহের যে অন্যথাভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে এস্থলে ব্যাঙ্গাদি-কৃত আগন্তু রোগ বলা হইয়াছে ।

[১] আগন্তু শব্দে অন্যান্য স্থলে, অপরাপর কারণ সম্ভূত কতক গুলি রোগকেও বুঝায় । যথা—

“অভিঘাতাভিযঙ্গাভ্যামভিচার্য্যভিশাপতঃ ।

আগন্তু জায়তে দৌষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ ॥” (চরক)

অর্থ এই যে, শস্ত্রাদিধাবণ অভিঘাত কোনও বিষয়ে মনের অতিশয় আসক্তিরূপ অভিযঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষ দ্বারা অভিচার এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের অভিশাপ দ্বারা যে বোগ হয়, তাহার নাম আগন্তু ।

কিন্তু, ঐরূপ বিভাগ দ্বারা প্রস্তাবিত বিভাগের কোনও হানি নাই । কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কপে সংজ্ঞা প্রদান করিলেও মূল পদার্থের অন্যথা হয় না ।

সংঘাতবলপ্রবৃত্তা য আগন্তুবো দুর্বলস্য বলবদ্ বিগ্রহাদিত্যাদিঃ । স্মৃতিতঃ ।

আধিদৈবিক রোগসকল প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে পরিগণিত।
যথা,—১ কাল-বল-প্রযুক্ত ;—২ দৈব-বল-প্রযুক্ত ;—৩ অভাব-বল-
প্রযুক্ত।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি কালের অর্থাৎ ঋতু সকলের প্রাদুর্ভাব
সময়ে, শীতগ্রীষ্মাদির অযথা সেবন দ্বারা শরীরে যে জড়তা, দাঁহ,
কম্প অথবা ঝর ও ব্রণ প্রভৃতি রোগ জন্মে, উহাদিগের নাম
কাল-বল-প্রযুক্ত।

কাল-বল-প্রযুক্ত রোগেরও দুইটি শ্রেণী। যথা,—

১ অব্যাপন্ন ঋতুতে উৎপন্ন ;—২ ব্যাপন্ন ঋতুতে উৎপন্ন।

পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যপ্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ সকল যে
স্থানে থাকিতে, বা যে ভাবে গমন করাতে বর্ষা, শরৎ,
হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সকল
ঘটনার কোনরূপ অন্যথাভাব না ঘটিলে, ঐ সকল ঋতু এক
প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ শীতের কালে শীত এবং
শীতপ্রধানস্থানে অধিক শীত আর গ্রীষ্মের কালে গ্রীষ্ম এবং
গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে অধিক গ্রীষ্ম, ইত্যাকারে ঋতুসকলের আবির্ভাব
হয়। ঐরূপ ঋতুকে অব্যাপন্ন অর্থাৎ অবিকৃত ঋতু বলে। তাহা
ঋতুতে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম অব্যাপন্ন-ঋতু-জাত। যথা,—
শরৎ ঋতুতে অর্থাৎ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে [২] পিত্তজন্য
জ্বরাদি রোগ, বসন্ত ঋতু ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ক্লেমজন্য রোগ
এবং গ্রাবৃৎ ঋতু আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাতজন্য রোগসকল।

(ক্রমশঃ)

[২] আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বাত পিত্ত ও একরূপ রোগোৎপাদক পদার্থ-
দিগের সঞ্চয় প্রকোপাদি নির্দারণার্থ যে ঋতুগণনা হইয়া থাকে, সেই ঋতু
শ্রেণীর মধ্যে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস শরৎ, ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত, এবং
আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস গ্রাবৃৎ বলিয়া গণ্য হয়।

সুশ্রুত, সুত্রস্থান, ৬ অ, দ্রষ্টব্য।

তস্যাশিতাদ্যাহারাৎ বলং বর্ণশ্চ বর্জতে ।

যস্যার্ভুসাত্ম্যং বিদিতং চেষ্টাহারবাপাশ্রয়ম্ ॥

হরেদ্বগন্তে শ্লেষ্মানং পিত্তং শরদি নিহরেৎ ।

বর্ধাস্থ শময়েদ্বায়ুং প্রাণিকারসমুচ্ছয়াৎ ॥

চরক । সূত্র, ৬ ।

কালতত্ত্ব ।

“কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ” । মহাভারত ।

“আমি” এই সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে বটে, কিন্তু তাহাতে “আমি” কিংস্বরূপ ? দেহের কোন অংশ আমি ? বা “আমি” কি বস্তু ? ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সাধারণের পক্ষে যেরূপ দুর্গম, সেইরূপ, কাল কি ? লোকে তাহা সাধারণ ভাবে জানিলেও, সকল ব্যক্তির পক্ষে উহার প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া দুঃস্বপ্ন । এই জন্যই কালতত্ত্বানুসন্ধানী প্রাচীন পণ্ডিতগণের এত মতভেদ । ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বর্ণন করিব । বলিতে পারিবেন না যে, আয়ুর্বেদে সঞ্জীবনীতে কালতত্ত্ব বর্ণন করিবার প্রয়োজন কি ? কেন না, কালতত্ত্ব অবগত হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয় । যিনি যে কার্য্য করুন না কেন, সকল ব্যক্তিকেই কাল অকাল জানিতে হয় । যিনি ক্রুশি করিবেন, তিনি যদি কালাকাল না জানেন তবে তাঁহার অনেক ক্ষতি । যিনি রোগনির্ণয় করিবেন, যিনি ঔষধ প্রয়োগ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবেন, কালতত্ত্ব না জানিলে তিনি বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না । কাল সকলেরই প্রয়োজনীয়, কাল ছাড়িয়া, কালজ্ঞানে অভিজ্ঞ না হইয়া, কেহই কিছু করিতে পারেন না, পারিবেনও না । অতএব, কালতত্ত্ব নির্ণয় করা আয়ু-

র্ষেদের অপ্রাসঙ্গিক নহে। কালতত্ত্ব নির্ণীত হইলে, অবশ্যই তদ্বারা আয়ুর্বেদের প্রধান প্রধান প্রয়োজন সাধিত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কোন দার্শনিক বলিয়াছেন, কাল একটি প্রত্যক্ষাভীত দ্রব্য পদার্থ এবং মহৎ প্রকৃতি হইতে জন্য-কীটাদি পর্য্যন্ত বস্তু মাত্রের পরিণামকারণ। ন্যায়বাদিগণ কালিক সম্বন্ধ নামে একটি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া ঐ সম্বন্ধটী জগতের উপর বিস্তৃত ভাবে নিষ্ক্ষেপ করেন; সুতরাং তাহাদিগের মতে কাল জন্য-বস্তু-মাত্রেরই কোন এক প্রকার জনক এবং পূর্বাধার জ্ঞানের সাধক। পৌরাণিকেরা বলেন, জগদভ্যুদয়ের যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে কালই প্রধান এবং যাহা কিছু ঘটিতেছে, ঘটবে, তাহারও প্রধান কারণ কাল; সুতরাং কালই জগতের দ্বিতীয় কর্তা।

এসিদ্ধ দার্শনিক সাঙ্খ্যাচার্য্য বৈশেষিক মত খণ্ডন উদ্দেশে বলিয়াছেন, কাল কিছুই নয়, কেবল অনাগতাদি-ব্যবহার-ভেদক উপাদি মাত্র। বিখ্যাত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরাও স্ব স্ব গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক-প্রধান সাঙ্খ্যাচার্য্যের অনুসরণ পূর্বক ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কাল বিষয়ে ঐরূপ মতভেদ হইলেও মনুষ্য নাম ধারী জীব-গণের অস্থি মাংসে জড়িত হইয়া কাল যে জীবনযাত্রা নির্বাহের এক প্রকার প্রধান সাধক হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং আয়ুর্বেদিকগণ কালতত্ত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। আয়ুর্বেদের এমন অনেক বিষয় আছে যে, কালই তাহার একমাত্র নিয়ম, কালের রহস্যভেদ না হইলে সেই সকল তত্ত্বের আভাসও বুঝা যাইতে পারে না। তৃতীয়ক বা চাতুর্থক জ্বর এক দিন বা দুই দিন একভাবে অদৃশ্য হয়, এবং পুনরপি আগিয়া উপস্থিত হয়। কালতত্ত্বে সুপণ্ডিত না হইলে, কে ইহার তথ্য নিখাইতে পারে?

উন্মাদরোগ প্রয়োদশ বর্ষে উপস্থিত হইলেই বা কেন অসিদ্ধ হয় ?
কালতত্ত্বজ্ঞেই ইহার মূল রহস্য জানিতে পারেন ।

ক্যান্ট নামক সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত কালকে
জ্ঞানমাত্রের নিয়তোপস্থিতিক এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থবর্গের
পরস্পর সম্বন্ধযুক্তক মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অন্তর বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ।

Time and space are ultimate mental forms.

স্পেন্সার নামক বিখ্যাত ইংলণ্ড দেশীয় পণ্ডিত ধারাবাহিক
জ্ঞান সমূহের ধারাগত সাম্মিবেশিক সম্বন্ধগণের সাধারণ ধর্ম বলিয়া
কালকে নির্দেশ করিয়াছেন ।

*And Time in general as known to us, is the abstract of all
relations of position among successive states of consciousness.*

• *Herbert Spencer Principles of Psychology, Vol. II.*

এই দুই ইংরাজ পণ্ডিত কালতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ অংশ বা ছায়া
মাত্র বুঝিয়া ছিলেন, সংশয় নাই । কিন্তু ইংরাজ পণ্ডিতের উপদিষ্ট
কালজ্ঞান আমাদের দূরবগাহ আয়ুর্বেদের বহিরাবরণও স্পর্শ
করিতে পারে নাই বলিলেও বলিতে পারি । আমাদের বিবেচনায়
যোগসিদ্ধ বৈদিক ঋষিদিগের উপদিষ্ট কালতত্ত্ব আয়ুর্বেদবিদগণের
বিশেষ উপকারী । বৈদিক কালতত্ত্ব কিরূপ তাহা শুনুন ।

বৈদিক ঋষিরা কালতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য কালকৃত কার্য সমূহের
মূল ভাব প্রদর্শনের জন্য প্রথমত জীবাজীবগত সমস্ত ভৌতিক
বিক্রিয়ার কারণীভূত মণ্ডলতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন । যথা—

“স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষ-মৈতিহ্যমুমানঞ্চতুষ্টয়ম্ ।

এতৈরাতিতামাণ্ডলাং সর্কৈরেব বিধাস্যতে ।”

পণ্ডিতগণ স্মৃতি, বেদ, পুরাণ, জ্যোতিষ ও শিষ্টাচার প্রভৃতি
অবলম্বন করিয়া আদিত্য মণ্ডলের নিয়মিত বিধানই জানিয়া থাকেন
অথবা অবলম্বন করিয়া থাকেন ।

আমি কি বলিতেছেন ? বলিতেছেন যে, সূর্য্যমণ্ডলই কাল-নির্মাণক যন্ত্র, উহাই বিচিত্রক্রিয়া কাল-কারার মূলতম রহস্য । আমি তাহা পরমজ্ঞেই সন্মত করিয়াছেন । যথা—

“সূর্য্যোমরীচিমা দত্তে সর্ব্বাঙ্গাঙ্গুণাদধি ।

তমাঃ পাকবিশেষেণ স্মৃতং কালবিশেষণম্ ॥”

যজুর্বেদোক্ত অরুণকেন্দ্রক যন্ত্র ।

অস্যার্থ—“ভুবনগতং সর্ব্বভূতজালং অধিকৃত্য রসবীর্য্যবিপাক-দিভিঃ তত্তদনুগ্রহমর্থং মরীচিং সূর্য্য আদত্তে স্বীকরোতি । তৎ-কৃতেন ভূতপাক-বিভেদেন নিমেষাদিপরাঙ্কপর্য্যন্তঃ কালবিভেদো-হস্মাভিরবগতো ভবতি ।

এ সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভূত অধিকার করিয়া রস, বীর্য্য ও বিপাক প্রভৃতি পরিণামরূপ অনুগ্রহ শক্তিসম্পন্ন রশ্মি বা তাপ স্বীকার করিতেছেন । তৎকৃত বিচিত্রভূতবিপাক প্রভেদ দ্বারা আমরা নিমেষ হইতে পরাঙ্ক পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি ।

এই আশ্চর্য্য আখ্যবিজ্ঞানের বা এই অদ্ভুত কাল রহস্যের সহিত আয়ুর্বেদের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা অন্য এক বিস্তীর্ণ প্রবন্ধে বর্ণন করিব । ক্ষণপরিণামঘটিত জীর্ণত্ব পুরাণত্ব প্রভৃতি সমস্তই সূর্য্যকিরণের অধীন, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝান যাইতে পারে । মহামতি কান্ট যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থবর্গের পরম্পর সম্বন্ধঘটক মানস) প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অন্যত্রকে কালসংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহা উত্তম হইত যদি তিনি উল্লিখিত সম্বন্ধটী উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন । যাহাহউক, বৈদিক কালতত্ত্বটী আমরা এই প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে না বলিয়া সংক্ষিপ্ত কথায় তাহার আভাসমাত্র বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশ করুন ।

প্রত্যেক বস্তুর অঙ্গে অবিচ্ছেদে ক্রিয়োৎপত্তি হইতেছে, পরন্তু তাহা আমরা এই অনেকাশ্রিতকালে বোধগম্য করিতে পারি না ।

সেই সমুৎপন্ন প্রত্যেক ক্রিয়া এত সূক্ষ্ম যে তাহা আমাদের বুদ্ধি অধিকারের বহির্ভূত । পর পর, বা উপর্যুপরি, ২।৩।৪ এবং-ক্রমে শত শত ক্রিয়া উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা আমাদের মানস প্রত্যক্ষের অবিষয় থাকে । বহু ক্রিয়া অতীত হইলে পর, ক্রিয়াশ্রিত দ্রব্য যখন স্কুলতম বিক্রিয়ার অধীন হয়, রূপাদির অন্তথা হওয়ায় অন্য এক নূতন আকারে পরিদৃষ্ট হয়, তখন তাহা আমরা বুদ্ধ্যারোহ করিতে পারি, তৎপূর্বে পারি না । এক ক্রিয়ার পর অন্য ক্রিয়া, তৎপরে আবার অন্য ক্রিয়া, এতদ্রূপ ক্রমে বহু ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়া-তেই যে ক্রিয়াপরম্পরার দ্বারা বস্তুর নারূপ্যপ্রচুতি হয়, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না । আপনার এক খণ্ড জীর্ণ বস্ত্র লইয়া যৎকিঞ্চিৎকাল চিন্তা (মানসক্রিয়া উত্থাপন) করিলেই উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যাইবে । এক বৎসর পরে দেখিলাম, আমার নূতন বস্ত্র পুরাতন হইয়াছে অর্থাৎ জীর্ণ হইয়াছে । ভাবিয়া দেখুন, সেরূপ পুরাতনতা বা সেরূপ জীর্ণতা এক দিনে হইয়াছে কি বহু দিনে হইয়াছে ? সেরূপ জীর্ণতা এক দিনে হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহা বহুদিনেই হইয়াছে এবং তাহা ক্ষণপরম্পরাক্রমে ও সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মক্রমেই হইয়াছে । যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে সেই একবৎসরকালকে বিভাগ করিয়া ক্ষণ করুন এবং তদ্রূপ জীর্ণতাকে বিভাগ করিয়া সূক্ষ্ম করুন । দেখিতে পাইবেন, বস্ত্রখানি ক্ষণপরম্পরাক্রমে ও ক্রমিক সূক্ষ্মতম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মরূপে অল্পে অল্পে বিকৃত হইয়া তদুদশায় উপস্থিত হইয়াছে । এতদ্রূপ ক্রিয়া-তত্ত্বের দ্বারা জানা যায় যে, যে গণিত ক্রিয়াকে আমরা বৎসর নাম দিতেছি, সেই অগণিত ক্রিয়াই তাহাকে অল্পে অল্পে ও সূক্ষ্মতমাদি ক্রমে জীর্ণতায় পরিণত করিয়াছে । সেই জন্যই আমরা তাহাকে একবৎসরের পুরাতন বলিতেছি এবং অনেক কালের জিনিশ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি । এতদ্রূপ জীর্ণতা-রহস্য-বিচারের দ্বারা

ইহাই অব্যাহিত হয় যে, কাল কি ? না কতকগুলি ক্রিয়া সমষ্টি ।* ক্রিয়াই কাল ; অন্য কোন অলৌকিক কল্পনা ইহাতে নাই । যাহারা ভাবেন, কাল একটি মনঃকল্পিতভাব বা জ্ঞানাভাসমাত্র, নিশ্চিত তাহারা কালশক্তিবিজ্ঞানে বঞ্চিত ।

ক্রিয়াই কাল, এ কথায় অনেক প্রশ্ন উঠিবে । কাল কাহার ক্রিয়া ? কিংনিষ্ঠ ক্রিয়া ? এ কথায় প্রাত্যুত্তরে কালবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—সূর্য্যক্রিয়া ও বস্তুক্রিয়া, উভয়ক্রিয়াই কাল, ক্রিয়ামাত্রেই কাল । বস্তুকায়ায় যে নিরন্তর ক্রিয়া জন্মিতেছে, তাহার প্রধান কারণ তেজ বা তেজোগুণাত্মক সূর্য্য । সূর্য্যই বস্তুরূপ অধিকরণে স্পীয়া ক্রিয়ার দ্বারা বিকারজনক ক্রিয়াস্তর জন্মাইতেছেন এবং নিজেও ক্রিয়াবান্ হইয়া পরগত ক্রিয়ার পরিচ্ছেদ বা পরিমাণ বিধান করিতেছেন ।

সূর্য্য কি ? সূর্য্য তেজঃপিণ্ড, দিব্য ও ভৌম-তেজের আকর বা প্রকৃতি । ঐ মণ্ডলাত্মক সূর্য্য হইতেই ভৌম ও দিব্য প্রভৃতি বিবিধ তেজ উদ্ভূত, উপতিষ্ঠমান ও উপধ্বস্ত হইয়া থাকে । ঐ তেজের শত শত অজ্ঞাত শক্তি আছে । উহার জ্ঞাত শক্তি এই—

“উর্দ্ধভাক্ পাচকং দগ্ধ্ পাবকং লঘু ভান্নরম্ ।

প্রধ্বংসোজপি বৈ তেজঃ পূর্ক্ভাভাং ভিন্ন লক্ষণম্ ॥”

পাক, দাহ, পরিবর্তন, সংশোধন, লঘুক, নৈর্মল্য, সংযোগধ্বংস, উগ্রতা,—এসমস্ত তেজেব জ্ঞাত শক্তি । বস্তুর পাকক্রিয়া, দাহ ক্রিয়া, আণবিকসংযোগের বিয়োগ, নৈর্মল্যক্রিয়া, সংশোধনক্রিয়া, (সাক্ষর্য্যভঙ্গ) পরিবর্তনক্রিয়া, লঘবক্রিয়া,—এ সমস্তই তেজের দ্বারা বা তেজঃপ্রবেশের দ্বারা সাধিত হইতেছে । তেজের মূলবস্তু কি ? না সূর্য্য বা সূর্য্যমণ্ডল । সূর্য্যই তেজের প্রস্রবণ । অতএব,

“ক্রিয়ৈব কাল ইতি মতানুসারাহুক্তম্ ।” [স্বতিদেখ ।]

সূর্য্যনামক তেজ প্রাতোক ভূতবিক্রিয়ার মূলে জীবন্তভাবে স্থিতি করিতেছে । যদি সূর্য্যনামক তেজোমূল না থাকিত, তাহা হইলে শীত হইত না, গ্রীষ্ম হইত না, বর্ষা হইত না, শিশির হইত না, মেঘ হইত না, বিদ্যুৎ হইত না, ফলাদির পাকনিষ্পত্তি হইত না, কাষ্ঠ পুড়িত না বা প্রজ্বলিত হইত না, অধিক কি কিছুই হইত না । এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, সূর্য্যের সহিত জগতের কিরূপ সম্বন্ধ এবং কাল বা ক্রিয়া কি জিনিষ ।

কালের বা অনুভবযোগ্য ধারাবাহিকক্রিয়ার ক্রমসংস্থানিতা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে । কালতত্ত্ব অপেক্ষা, কালের বা ক্রিয়ার ক্রমতত্ত্বটি অতীব দুর্নিরূপা । দুর্নিরূপা হইলেও তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অবশ্যজ্ঞাতব্য । বস্তুরূপে অধারে কত অগণ্য ক্রিয়া উপন্ন হইয়া তাহাকে জীর্ণ করে, কিরূপে অধার কিপ্রকারে ও কি পরিমাণ ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত বা পাক প্রাপ্ত হয়, এই ভৌতিক দেহের উপর কিপ্রকারের কত ক্রিয়া আপতিত হইলে ইহার জীর্ণতা সম্ভব, এই স্তম্ভশরীর, ইহাতে যে পরিমাণ ক্রিয়ানৈরন্তর্য্য স্বাভাবিক আছে, যাহা ঠিক থাকিলে ইহাতে দশ বৎসরেও জরা আসিতে পারে না, যাহা ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ যাহার পরিমাণ হ্রাস হইলে ইহাতে দশবৎসর দূরের জরা এক দিনেই উপস্থিত হইতে পারে, এসকল বিষয়ের জ্ঞান কালিক ক্রমতত্ত্বজ্ঞানের অধীন, ইহা নিশ্চিত জানিবেন । এসকল তত্ত্ব ঋষি ভিন্ন, যোগী ভিন্ন, অশ্বের পক্ষে দুজ্ঞেয় ; অথচ ইহা চিকিৎসকদিগের জ্ঞাতব্য ।

“কাল” এই শব্দের ব্যুৎপত্তিতে হৃদয়চাঁচাৰ্য্য বলিয়াছেন যে, সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভুতানি” টীকাকার ডল্লনাচার্য্য নানাপ্রকার অর্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা এস্থলে জ্যোতির্বিদ্যে প্রধান সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করিলাম ।

কাল 'দুই' প্রকার প্রথম অথও কাল "সঙ্কলয়তি ভূতানি" অর্থাৎ ভূত শব্দে পঞ্চভূত আকাশাদিকে বুঝাইবে ঐ ভূতগণের পরস্পর সংযোজনকারক অথও কাল । পূর্বে বলা হইয়াছে, কাল জগতের আশ্রয় এবং ঈশ্বরানুরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা কেননা অথও কালে সংযোজিত বস্তুর স্থিতি বিলয়ও কালের অধীন ।

দ্বিতীয় খণ্ডকাল "কালয়তি বা কলয়তি" অর্থাৎ এস্থলে কল ধাতুর অর্থ জ্ঞান যিনি নিমেষাদি বিবিধরূপে মনুষ্যাগণের জ্ঞানের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন । জ্যোতিষিকেরা প্রোক্ত কালকে যতখণ্ডে বিভাগ করিয়াছেন, আয়ুর্বেদিকেরাও প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় ইতি কর্তব্যতা বিধানের পরিচয় দিতে কৃটি করেন নাই ; দ্বিতীয় কাল আগাদেব প্রয়োজনীয় এবং বক্তব্য হইলেও আমরা কালকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে চাই না ।

তস্য সংবৎসরাব্রনো ভগবানাদিতাঃ । সূক্ষতঃ ।

অল্পকাল হইতে যুগ পর্য্যন্ত কালকে যত অংশে বিভক্ত দেখিতেছি, তাহাব মধ্যে সম্বৎসর কালই পবিত্রত্ব শীল ; এই সম্বৎসরের পুনরাবর্তনে যুগাদি সংখ্যা আবিস্কৃত হইয়াছে । অতএব সংবৎসরের বর্ণনা মাত্র লিখিত হইবে ।

খণ্ডকাল আবার দুই প্রকার প্রথম অণু (সূক্ষ্ম) অপ্রধান । দ্বিতীয় স্থূল (মূর্ত্ত) প্রধান ।

অনিবার্যভাবে সূর্য্যের রশ্মিপাত হইতে পারে, এমন কোন এক প্রকার সমতল স্থানে একটি সঙ্কু (কৌলক) সরল ভাবে রোপিত করিয়া তাহার ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিলে ঐ ছায়ার গতি দ্বারা সূর্য্যের গতি প্রমাণ করিতে হইবে ; ঐ গতি একটি পরমাণু দেশ অতিক্রম করিতে যে সময় অতীত হইবে তাহাকে এক অণুকাল জানিবে । এই প্রকার ১, ২, ৩, পর্য্যন্ত এক রেণুকাল , ইহার

ত্রিগুণে এক ক্রটি, একশত ক্রটিতে এক বেধ । ইত্যাদি অননু-
ভবনীয় কালই সূক্ষ্ম কাল । এই কাল গণনীয় সংখ্যার মধ্যে বটে
কিন্তু ব্যবহারের অযোগ্যবলিয়া অপ্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে ।
দ্বিতীয় “স্কুল বা মূর্ত” কাল কোন গুরু ব্যক্তি সূখাসনে উপবেশন
করিলে তাহার নিশ্বাস পতনের কালকে প্রাণ বলে ; ইহার ছয়
প্রাণে এক বিনাড়ী (পল) ৬০ বিনাড়ীতে এক নাড়ী (দণ্ড) ৬০ নাড়ীতে
এক অহোরাত্র । পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষ । পক্ষ দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও
শুক্ল ; দুই পক্ষে বা ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস বা এক রাশি ;
বারমাসে বা ষাদশ রাশিতে এক সংবৎসর । দিন দুই প্রকার চান্দ্র
এবং সৌর । চান্দ্র দিন রাত্রেব শেষাৰ্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া
পবদিবসীয় পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত । সৌরদিন সূর্যের উদয় হইতে
পুনরায় উদয় কাল পর্য্যন্ত ।

(ক্রমশঃ)

রোগ ও রোগের বিভাগ ।

মধ্যে মধ্যে বিবিধ কারণে শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুর ব্যাপ্তি অর্থাৎ
অন্যথা-ভাব উপস্থিত হয় । তজ্জন্য দেশবিশেষে বা প্রদেশবিশেষে
জনপদোৎপন্নকারী মহামারী (ম্যালেরিয়া প্রভৃতি) বিবিধ রোগের
প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে [৩] ঐ সকল রোগকে ব্যাপন-ঋতু-জাত
বলা যায় ।

[৩] কি কারণে, অস্বাভাবিক ঋতু-ব্যাপ্তি উপস্থিত হয়, কি কারণে
ও কিরূপেই বা বিভিন্নবয়স্ক, ও বিভিন্নপ্রকৃতি লক্ষ লক্ষ লোকের
প্রাণনাশক মহামারী (ম্যালেরিয়া প্রভৃতি) নামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়,
তদ্বিশয়ে আয়ুর্বেদীয় সিদ্ধান্ত কি, আগবা তাহা প্রস্তাবান্তরে ব্যক্ত করিব ।

দৈব বল দ্বারা অনেক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় । যথা,—

১ দেবজোহজাত ;—২ অভিশাপজ ;—৩ অভিচার-কৃত ;—
৪ উপসর্গজাত, ইত্যাদি ।

দেবতা, গুরু, সিদ্ধপুরুষপ্রভৃতির প্রতি ধৃষ্টতা, গর্ভপ্রভৃতি প্রকাশ করিলে, যে ছুরদৃষ্ট জন্মে, তজ্জন্য উৎপন্ন রোগকে দেব-জোহ-জাত রোগ বলে । [৪]

তপোবলশালী মহর্ষিপ্রভৃতির নিকট পাপাচার প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগের অভিশম্পাতবশতঃ যে রোগ জন্মে, তাহার নাম অভিশাপজ ।

অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রবিশেষদ্বারা সম্পাদিত কার্যাবিশেষকে অভিচার বলে । তজ্জন্য যে রোগ জন্মে, তাহার নাম অভিচারজ ।

কখন কখনও মূল ব্যাধি সামান্যাকারে উৎপন্ন হইবার পর অপর কোনও প্রবল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয় । এস্থলে, তাহার নাম উপসর্গজাত ।

ঐরূপ দৈববল-প্রযুক্ত রোগ সকল, চারি প্রকারে উপস্থিত হইয়া থাকে । তজ্জন্য উহারা প্রথমতঃ চারি শ্রেণীতে পরিগণিত । যথা,—

১ বিদ্যুদশনিকৃত ;—২ পিশাচাদিকৃত ;—৩ সংসর্গজাত ;—
৪ আকস্মিক ।

[৪] দেবতা বা সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতির অলৌকিক প্রভাবের বিষয়ে বিদ্যমান সময়ের বাস্তবিশেষের অবিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু জগতের তত্ত্বজ্ঞ আয়ুর্বেদ তাহাতে অশ্রদ্ধা করেন না । বিবিধ কারণানুসঙ্গায়ী আর্য্য মহর্ষিগণ প্রস্তাবিতরূপ কারণমাত্র বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; তাঁহারা, তাদৃশ রোগের স্বরূপ ও তাহার চিকিৎসার সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন । আজি কালি পৃথিবীর সভ্যসমাজে প্রকৃত বুদ্ধিমান বাস্তবিকের নিকট এতাদৃশ বিষয় আর অসম্ভব বলিয়াও গণ্য হয় না ।

মেঘ হইতে মধ্য মধ্য পৃথিবীতে যে অসাধারণ তেজোগয় পদার্থ পতিত হয়, তাহাকে “তাড়িত” বলে। সংস্কৃত ভাষার পুরাণাদি শাস্ত্রে উহার নাম অশনি অর্থাৎ বজ্র। ঐ তাড়িত পদার্থের বর্ণকে বিদুৎ বলা যায়। অশনির বিদুৎ ছাড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেই অশনি ও বিদুৎ পাতদ্বারা যে মৃত্যু (মৃত্যুও রোগমধ্যে গণ্য হইয়াছে) অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকলতা হয়, তাহার নাম বিদুদশনিকৃত। [৫]

গন্ধর্ক, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচাদির আক্রমণবশতঃ যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগের নাম পিশাচাদিকৃত। যথা—ভুতোন্মাদ প্রভৃতি।

কোন কোনও রোগ এরূপ আছে যে, তাদৃশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অতি নিকটে অবস্থান বা তাহার সহিত একত্র শয়ন ও আহারাদি করিলে, ঐ রোগ আক্রমণ করে। এরূপ রোগকে এস্বলে, সংসর্গজাত বলা হইয়াছে। যেমন, কোন কোনও ঔর, রাজযক্ষ্মা ও বিস্মূচিকা প্রভৃতি।

পূর্বে কোনও লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া হঠাৎ যে রোগ জন্মে, তাহার নাম আকস্মিক। যথা, সংশ্য়াসনামক মূচ্ছা প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বভাব বলে। স্বভাবানুসারে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগের নাম স্বভাব-বল-বৃত্ত। যথা,—ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি [৬] ঐ সকল স্বাভাবিক রোগের দুইটী শ্রেণী। যথা,—

[৫] বজ্রকে লোকে যে “দধিচি” নামক ঋষির অস্থি এবং দেব-রাজ ইন্দের অস্ত্র বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহা পুরাণশাস্ত্রের আলঙ্কারিক বর্ণনা হইতে কৃত হইয়াছে। পুরাণ কর্তা মহর্ষিগণ বিবিধ কারণে লোকের প্রবৃত্তিভেদ লক্ষ্য করিয়া প্রায় সকল শাস্ত্রেই অলঙ্কার বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

[৬] লোকে যাবজ্জীবন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া চলিতে

১ কাল-কৃত, — ২ অ-কালকৃত।

শরীর ও মনের সুস্থতা রক্ষার নিমিত্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের যে সকল ব্যবস্থা আছে। তদনুসারে চলিলেও যেরূপ ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি এবং যেরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার নাম কাল-কৃত ব্যাধি।

যথাকালিক ও পরিমিত পরিমাণের ক্ষুধা-পিপাসাদি রোগ, বলিয়া গণ্য হইবার কারণ এই যে, শরীরস্থ পদার্থদিগের অভাব বোধক এক এক প্রকার যন্ত্রণাবিশেষের নামই ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি। যন্ত্রণাবিশেষ হইলেই, ব্যাধিশব্দে গণ্য হইল। আবার অন্ন আহার বা জল পান করিলে, সুখানুভব হয় বলিয়া, ক্ষুধা ও পিপাসাকে সুখজনক বলা যাইতে পারে না। অপিচ একপ্রকার সুখের সাধন বলিয়া এতাদৃশ স্বাভাবিক রোগগুলি প্রার্থনীয়ও হইতে পারে না। কারণ, যদি ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া ক্লেশভোগ না করাইত, তবে আহার জন্য তৃপ্তিও হইত না। সাংসারিক লোকের শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারা শরীরস্থ রসরক্তাদির ক্ষয় হইলে, আহার দ্বারা তাহার পূরণ হয় বটে, কিন্তু সংসারত্যাগী যোগী ব্যক্তিগণের তাদৃশ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আয়ুর্বেদীর রসায়ন-চিকিৎসা অথবা যোগশাস্ত্রোক্ত যোগ দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুধা পিপাসাদির নাশ হইয়া থাকে, অথচ তাদৃশ ব্যক্তির সুখের অভাব নাই। এইরূপে সূক্ষ্ম বিচার করিলে পরিমিত ক্ষুধা পিপাসাদিও দুঃখজনক পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

পারিলে, অতিসার, অম্লীর্ণ, বা কিমি প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত অতিসারাদি রোগ সকল স্বাভাবিক নহে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালিত হইলেও, ক্ষুধা, পিপাসা এবং অন্ন ও মৃত্যু, একেবারে নিবারিত হয় না। এই জন্য এই ক্ষুধাপিপাসাদি রোগদিগের নাম স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালন করিয়া না চলিলে, ঐ ক্ষুধা পিপাসাদি পরিমিত পরিমাণাপেক্ষা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অস্বাভাবিক রোগ বলিয়াই গণ্য হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মে না চলিলে, অথবা স্বাস্থ্যভঙ্গ কারক নিষিদ্ধ কার্য সকলের অনুষ্ঠান করিলে, যেরূপ ক্ষুধা পিপাসাদি এবং যেরূপ হৃদ্য ঘটে, তাহাদিগের নাম অকালকৃত ব্যাধি।

বাত্তবিক ব্যাধি বা রোগের প্রকারভেদ অসংখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার উপরি উল্লিখিত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিনটি বিভাগকে অতিক্রম করিতে পারে না; তাহার সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তরে বিভাগ করিলে, যাবতীয় রোগের তিনটি শ্রেণী উপস্থিত হয়। যথা,—

১' দোষ-জন্য, —২ কর্ম-জন্য; —৩ কর্মদোষ-জন্য। [৭.]

জন্মান্তরীণ পাপ বা দুরদৃষ্ট ব্যতিরিক্ত, স্বাভাবিক কাল নিয়মে অথবা ঐহিক আহার বিহারাদির নিয়ম বিরুদ্ধ ব্যবহারবশতঃ অথবা আঘাতাদি আগন্তু কারণে যথাকালে, যথা পরিমাণে বাত পিত্তাদি দোষদিগের যথা সম্ভব প্রকোপাদির অনুযায়ী রূপে উৎপন্ন রোগ কালকে দোষজন্য রোগ বলে। যথা, বসন্ত ঋতুতে স্বাভাবিক নিয়মেই শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপজন্য শ্লেষ্মাপ্রধান রোগ, অথবা চৎকালে শ্লেষ্মাবর্দ্ধক নিদান সেবন বশতঃ অতিশয় শ্লেষ্মাপ্রকোপাদি ওয়াতে শ্লেষ্মাপ্রধান জ্বর ইত্যাদি, অথবা আঘাতাদি প্রযুক্ত কানওরূপ ক্ষতরোগ।

পূর্বোক্তরূপ ঐহিক কারণ ব্যতিরেকে জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত য রোগ জন্মে, তাহার নাম কর্মজন্য রোগ। যথা, সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিতে করিতেও বসন্ত ঋতুতে পিত্তজন্য বক্তপিত্ত রোগ।

[৭] কর্মজা ব্যাধয়ঃ কেচিৎ দোষজাঃ সন্তি চাগরে।

কর্মদোষোস্তবাস্তানো কর্মজাস্তেষাহেতুকাঃ ॥

[শ্রুত উত্তরভাগে, ৪০ অ.]

জন্মান্তরীণ কর্মজন্য পাপ এবং ঐহিক অত্যাচার জন্য প্রকুপিত বাতাদি দোষ এই উভয় কারণ মিশ্রিত ভাবে যে রোগ উৎপাদন করে এবং জন্মান্তরীণ শুভাদৃষ্ট বা পুণ্য এবং ঐহিক অত্যাচার এই উভয়ের মিশ্রিত কার্যের ফলস্বরূপ যে রোগ জন্মে তাহার নাম কর্মদোষজন্য ।

শেষোক্ত কর্মদোষজন্য রোগেরও দুইটি শ্রেণী হইয়া থাকে । যথা—

- ১ ঐহিক কারণের উপযুক্ত রোগাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রোগ ;
- ২ ঐহিক কারণাপেক্ষাতে অল্প পরিমাণে রোগ । [৮]

যদি অধিক পরিমাণে ব্যায়ামপ্রভৃতি বাতপ্রকোপের, কটুরস-সেবনপ্রভৃতি পিত্তপ্রকোপের, গুরুজব্যসেবনপ্রভৃতি শ্লেষ্মা প্রকোপের নিদান অথবা আঘাতপ্রভৃতি আগন্তু নিদানের কোনও একটি ঐহিক কারণ বা অনেকগুলি কারণের সমষ্টি ও জন্মান্তরীণ পাপ, এই উভয়ে মিশ্রিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে, তবে ঐহিক কারণের উপযুক্ত রোগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যাধি জন্মে ।

যদি জন্মান্তরের এরূপ পুণ্য থাকে যে, তজ্জন্য ইহ জন্মে সুখ নন্দনে কাল যাপন হইতে পারে, অথচ ইহ জন্মে শারীরিক আহাৰ বিহারাদির অত্যাচার করা হয়, তবে, রোগের উৎপাদক ঐহিক কারণের উপযুক্ত রোগাপেক্ষা নূন পরিমাণে রোগ জন্মিয়া থাকে । [৯]

[৮] সূক্ষ্ম বিভাগ করিলে, আরও অনেক শ্রেণীভেদ হইতে পারে । যথা, পূর্বজন্মের পাপ ঐহিক নিদানের তুল্য, অল্প বা অধিক এবং জন্মান্তরীণ পুণ্য ঐহিক নিদানের তুল্য, অল্প বা অধিক । আবার অধিক, অধিকতর অধিকতম ইত্যাদি ।

[৯] চরক সংহিতাতেও মানবের জীবন মরণ যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কারণের প্রতি নির্ভর করে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে । যথা,—

নিকৃত বাতাদি দোষ পদার্থ রস রক্তাদি ধাতু পদার্থদিগকে দূষিত করিয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে, তাহারা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

- ১। রস-দোষ-জ বা রসজাত। যথা, অর, অরুচি প্রভৃতি।
- ২। রক্তজাত। যথা, গ্ৰীহা, বিদ্রুপি ইত্যাদি।
- ৩। মাংসজাত। যথা, অর্শঃ গলগণ্ডপ্রভৃতি।
- ৪। মেদোজাত। যথা—অতিস্থূলতা, অতিশ্বেদ প্রভৃতি।
- ৫। অস্থিজাত। যথা—কুনখ, অস্থিতোদ (হাড়ের মধ্যে বেদনা) প্রভৃতি।
- ৬। মজ্জাজাত। যথা—অন্ধকার-দর্শন, মূর্ছা প্রভৃতি।
- ৭। শুক্রজাত। যথা—ক্লীবতা, শুক্রমেহ প্রভৃতি। (১০)

শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রানুসারে বিভাগ করিলে, অনেকগুলি শ্রেণী হইতে পারে। তন্মধ্যে আমাশয় ও পক্বাশয় যন্ত্রগত রোগের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তদভিন্ন অপর দুইটি স্থল শ্রেণী আছে। যথা—

১ গলাশয়জাত ;—২ ইন্দ্রিয়াশয়জাত। (১১)

“দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলং।”

এবং “দৈবং পুরুষকারেণ দুর্বলং হ্যপহন্যতে।

দৈবেন চেতরং কৰ্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।” [বিমানস্থান।]

আত্মার জ্ঞানান্তরগ্রহণঘটিত পূর্বকাল ও পরকালে অবিশ্বাসকারী অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ, রোগের পক্ষে এতাদৃশ কারণ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হাস্য বা উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর পণ্ডিত-শিরোমণি জগতের কারণতত্ত্বাভিজ্ঞ আৰ্য্য মহর্ষিগণ বহু চিন্তা ও যোগলব্ধ জ্ঞান দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দূরদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট তাহা উপহাসের বিষয় হইতে পারে না।

[১০।১১] সূত্রত, সূত্রস্থান, ২৪ অ, ভ্রষ্টব্য।

উক্ত নাগক মলাশয়ের বিকৃতি বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগের নাম মলাশয়জাত । যথা,—চুলকানো, পাচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ ।

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের আধারযন্ত্রদিগের অন্তর্ভাব প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়াশয়জাত বলা যায় ।

চিকিৎসা দ্বারা শান্তিবিধানবিষয়ে, রোগদিগের শ্রেণীভেদ করিলে, প্রথমতঃ দুইটি শ্রেণী উপস্থিত হয় । যথা,—

১ সাধ্য রোগ ;—২ অসাধ্য রোগ ।

যে রূপ উপায়ে যত দিনেই হউক, যে রোগের সর্বতোভাবে শান্তিবিধান হইতে পারে, তাহার নাম সাধ্যরোগ ।

আয়ুর্বেদিক উপায়ে কোন প্রকারেই যাহার সর্বতোভাবে শান্তিবিধান হইতে পারে না, তাহার নাম অসাধ্য রোগ ।

সাধ্য ও অসাধ্য, এই দুই প্রকার রোগেরও প্রত্যেকের দুই শ্রেণী আছে । যথা,—

সাধ্যরোগ—১ সুখসাধ্য, —২ কষ্টসাধ্য ।

অসাধ্যরোগ—১ যাপ্য, —২ প্রত্যাখ্যেয় ।

যাহাকে অল্পায়ুসে শমিত করা যায়, তাহা রোগের নাম সুখসাধ্য ।

যাহাকে শমিত করা অনেক আয়ুসের কার্য্য, তাহাকে কষ্ট-সাধ্য বলে ।

সর্ব প্রকার চেষ্টাতেও যে রোগের মূল বিনাশ হয় না, কেবল কিছুকালের জন্য তেজের হ্রাস হয়, তাহার নাম যাপ্য ।

যে রোগের তেজের হ্রাসও হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকে প্রত্যাখ্যেয় বলে । ইতি ।

কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র শর্মা-বিশারদ ।

ঔষধসূত্র ।

(পূৰ্ণপ্রকাশিতের পর)

পূর্বে যে তিন প্রকার বিপরীতার্থকারী বা সদৃশ ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে, সদৃশশব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ মনে না করেন, ঐ সকল ঔষধ বর্তমান হোগিওপ্যাথি-মতানুসারী। কেন না, হোগিওপ্যাথীগতের সহিত কোন অংশে এক হইলেও সর্বাংশে তুল্য নহে। ঐ সমস্ত ঔষধের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া এবং মাত্রাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে। এবং জানিতে পারিবে যে ঐ সমস্ত ঔষধ বিপরীত ঔষধেরই অর্থাৎ এলোপ্যাথিকেরই অন্তর্নিবিষ্ট। কেবল কোন ধর্মের বৈলক্ষণ্য-বশতঃ নামমাত্রে পৃথকশ্রেণীভুক্ত। এই বিষয়টি সুন্দররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত নিদানটীকাকার বিজয়রক্ষিত এবং নৃসিংহাচার্য্য যে কয়েকটি পূর্বাপরপ্রসিদ্ধ উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

১ম। বমনরোগে মদনফল।

মদনফল যাবতীয় বমনরোগে প্রয়োগ করিতে হয় এমন নহে। যে স্থলে উদরে বা হৃদয়ে বহুপরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে, ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ রোগীর বমন বা বিবমিষা হইতেছে বলিয়া পরীক্ষিত হয়, এমন স্থলে উক্ত শ্লেষ্মা নিঃসারণের জন্য বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করাই আশু উপকারক। কেন না যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা নির্গত না হইলে, শীঘ্র বমননিবারণ হওয়ার সুযোগ নাই। এই বিবেচনায় রোগের কারণীভূত কফ নিঃসারণ করার অভিপ্রায়েই ঐরূপ স্থলে মদনফল প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং ইহা হেতুবিপরীত ঔষধই হইল।

২য় । অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নির উত্তাপ ।

আপাত বুদ্ধিতে বোধ হয়, শৈত্য-সংযোগে অগ্নিদাহের উপশম হইতে পারে, অতএব দগ্ধ স্থানে শীতল জল সেচন করাই উচিত । বস্তুতঃ ঐরূপ শীতপ্রক্রিয়ায় উপকার না হইয়া বরং অপকারই ঘটে । কারণ শীতল জল স্বাভাবিক সঙ্কোচনশক্তিবশতঃ দগ্ধস্থানের রক্ত জমাট করে, পরে ঐ ঘনীভূত রক্ত পাকপ্রবণ হইয়া পড়ে । কিন্তু দগ্ধ স্থানে অগ্নির তাপ লাগাইলে তাপেব সঞ্চালনশক্তিবশতঃ উক্ত রক্ত চতুর্দিকে সঞ্চারিত হয়, জমাট বাঁধিতে পারে না । সুতরাং পাকিবারও আশঙ্কা থাকে না । অতএব আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে এই তাপও হেতুবিপরীত ঔষধ বলিয়াই বোধ হইবে ।

৩য় । বিষে বিষক্ষয় ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে জাতীয় বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বিরোধি-জাতীয় বিষ পূর্কোক্ত বিষের নাশক । যেমন শ্বাবর গোল বিষ, জঙ্গম বিষের ঔষধ এবং জঙ্গম বিষ শ্বাবর গোলবিষের ঔষধ । কেন না উভয় প্রকার বিষ, বিষজ্ববিষয়ে এক হইলেও পরস্পর বিরোধি-ক্রিয়াশীল । জঙ্গম বিষ উর্দ্ধগামী এবং শ্বাবর বিষ অধোগামী । এরূপ বিপরীত ক্রিয়াকারী বলিয়া ইহাও হেতুবিপরীত ঔষধের মধ্যে ধর্তব্য ।

৪র্থ । মদ্যপানজনিত-মদাত্মরোগে মদ্যপান ।

প্রোক্তটীকাকারদ্বয় এই উদাহরণে দুইটি উপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন । প্রথম উপপত্তি—মদ্য মাত্রই সদৃশ-গুণ-যুক্ত, এমন কথা হইতে পারে না । কোন মদ্য রুক্ষ, কোন মদ্য বা স্নিগ্ধ ইত্যাদি । সুতরাং কোন মদ্যের সহিত কোন মদ্যের বিরোধিতাও আছে ।

অতএব রক্ষা মদ্য পান করিয়া যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে স্নিগ্ধ মদ্য পান করাইবে। এইরূপ স্নিগ্ধ মদ্য পানে যাহার পীড়া জন্মিয়াছে, তাহাকে রক্ষা মদ্যপান করিতে দিবে, কাজেই এইরূপ ব্যবস্থা হেতুবিরোধীই হইল। দ্বিতীয় উপপত্তি—যে স্থলে সমজাতীয় মদ্যপান দ্বারা রোগীর পীড়া নিরুত্তি হইতে দেখা যায়, সেই স্থলে কোনরূপ দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগে ঐ মত্তের বিপরীত ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া হেতুবিরোধী করিয়াই লইতে হয়। সুতরাং উহা হেতুবিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল।

৫ম। ব্যায়ামজনিত বাতরোগে জলসন্তরণরূপ ব্যায়াম।

যেমন কুম্ভকারপয়নস্থ অগ্নি উপরিস্থিত মুল্পোর আবরণে সংরত থাকায়, অভ্যন্তরে পিণ্ডীকৃত হইয়া সমধিক প্রাজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ সন্তরণকারী ব্যক্তির আন্ত্যন্তরিক তাপ, জলের শৈত্য ক্রিয়া বশতঃ লোমকূপ পথে বহির্গত হইতে না পাওয়ায় অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই তাপের সাহায্যে মেদ এবং শ্লেষ্মা গলিত হয়, তৎ সহকারে সন্তরণ-শ্রমোৎপন্ন বায়ু পূর্কসঞ্চিত বাতকে স্বস্থানে প্রত্যানয়ন কবে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও হেতুবিপরীত ঔষধের মধ্যেই পরিগণিত হইল।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যদি বিপরীতার্থকারী ঔষধ আন্ত্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রভৃতি কারণবশতঃ বিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল, তাহা হইলে উহাকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করার তাৎপর্য্য কি এবং সদৃশ ঔষধ এইরূপ নামই বা কেন দেওয়া হইল? ইহার উত্তরস্থলে টীকাকারগণ যাহা বলেন, তাহা এই—

যদিও বিপরীতার্থকারী ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত ঔষধেরই অন্তর্নিবিষ্ট, তথাপি উক্ত ঔষধের ধর্ম্মগত আংশিক বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্যে পৃথক্ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। যদি বল

বৈলক্ষণ্য কি ? আপাতত সমধর্মী বা সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই বৈলক্ষণ্য । *

(ক্রমশঃ)

* “নহু ছর্দ্যাং বহ্নশ্লেষ্মজায়াং বমন-যোগায়াং যদি বমনং ন ক্রিয়তে, তদা চিরাহুবর্তী রোগোহনুচ্ছেদ্যো বা সাৎ । ততশ্চ বমনং প্রযুক্তং দোষপ্রতানীকমেব ভবতি যদুক্তং সূত্রতে । ছর্দিষু বহ্নদোষাসু বমনং হিতযুক্ত ইতি । এবমগ্নিশূঠেহপ্যুষ্ণক্রিয়য়া রক্তস্য বিলপনেন স্থানান্তরগমনাৎ হেতু-প্রতানীকতৈব । অথবা রক্তং দাহপ্রকুপিতং তত্রস্থং পাকমারজেত । যদুক্তং সূত্রতে । অগ্নিনা কুপিতং রক্তং ঙ্গুশং জস্তোঃ প্রকুপাতি । তত-স্তেনৈব বেগেন পিত্তমস্যা পুদীর্যত ইতি । শীতক্রিয়া চ তত্র নিষিদ্ধা । রক্তস্য স্থানান্তরহেতুত্বাৎ । যদাহ সূত্রতঃ । একত্বাহুদকং শীতং স্কন্দয়ত্যতিশোণিতং । তস্যাং সূথয়তি সূক্ষং ন তু শীতং কথঞ্চনেতি । স্কন্দয়তি স্থানীকরোতি । তথা জলমবিষে উর্দ্ধগধ্বরূপে ঘোণবিষমধোগধ্বরূপং হেতুবিপরীতমেব । যদুক্তং চরকে । বিষং বিষমুক্তং যত্নং প্রভাবপ্রভাবিতমিতি । অস্যায়মর্থঃ বিষত্যা-বিশেষেহপি কুতো গতিভেদ ইত্যত প্রভাবপ্রভাবিতমিতি । তথা মদ্যকৃতে মদাত্ম্যে যদ্যদাং তদপি মাতুলুঙ্গচূক্রাদিযুক্তং সূত্রতাদিভিক্ৰিহিতং ত্র্যাস্তর সংযুক্তমন্যদেব । অথবা বাতমদাত্ম্যে কক্ষমাধ্বীকাদিনা জনিতে তত্র স্নিগ্ধপৈষ্টিকাদিমদ্যং প্রযজ্যমানং হেতুবিপরীতমেব । যদুক্তং সূত্রতে । যথা নরেম্মোপহতস্য কসাচিৎ ভবেৎ প্রসাদস্ততএব নানাতঃ । এবং তথা মদ্য-হতস্য দেশিনা ভবেৎ প্রসাদস্তএব নানাত ইতি । তদ্বদ্য জাতীয়ানামতি-প্রায়ে বায়ামজনিত সংমূঢ়বাত্তে জলপ্রতরণরূপো বায়ামঃ, তত্রাপি জলস্য শৈথিল্যে নিগচ্ছন্ দেহোন্মা নিপ্তকুন্তকারপয়নন্ত্যায়েনান্তঃপিণ্ডিতো-মেদঃ শ্লেষ্মাণৌ বিলালয়তি । বায়ামশ্চ ভৌ শোথয়তি ততস্ত নিরাবরণো-বাযুঃমার্গপ্রতিপন্নো ভবতীতি হেতু-প্রতানীকতৈব । অনেন স্থায়েন সর্বমেব তদর্থকারি যথাসম্ভবং হেতু-প্রতানীকাদাবেবাস্তবতীতি উচ্যতে ।

যদ্যপেবং তথাপ্যবাস্তরবৈধর্ম্যপ্রতিপাদনার্থমাচার্যৈঃ পৃথক্ দর্শিতং ।

বৈধর্ম্যক হেতুসমানধর্মকভেদপি ক্লেশগপ্রশমকভূমিতি ।”

আয়ুর্বেদানুবাদ ।

আমরা সঙ্গীক-সানুবাদ-চরকসংহিতা-মুদ্রাক্ষণের এক খানি
অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইলাম । *

* চরক-সংহিতা আয়ুর্বেদের প্রধানতম গ্রন্থ । ইহার প্রকৃত মর্ম কি
তাহা এখন পর্য্যন্ত সাধারণের গোচর হয় নাই । যদিও দুই তিন বার
ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি তদ্বারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রকৃত
সুবিধা হয় নাই । কারণ, চরক-সংহিতা অতি দুর্বোধ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট টীকার
আশ্রয় ও গুরুপদেশ ব্যতিরেকে, ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য কেহ সর্ব্বাংশে বুঝিতে
সমর্থ হন না । অতএব আমরা আয়ুর্বেদের গভীর-তত্ত্বজ্ঞ-চক্রপাণি-দত্ত-কৃত
আয়ুর্বেদ-দীপিকানাংক টীকা, শিবদাস-কৃত চরক-তত্ত্বদীপিকার আবশ্যিক
অংশ, বিশদ বঙ্গানুবাদ, উৎকৃষ্ট বিবৃতি এবং গুরুপদেশের সহিত উহা উত্তম
কাগজ ও অক্ষবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়াছি । উক্ত
সংহিতার মূল ও টীকা বেনারস, কাশ্মীর ও বোম্বে প্রভৃতি নানা স্থান হইতে
সংগৃহীত হইতেছে । চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন
শ্রীযুক্ত কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঈশানচন্দ্র বিশারদ
মহাশয়দ্বয়, ইহার অনুবাদ ও সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যে অতী হইয়াছেন ।
দুই তিন জন ধনবান্ ব্যক্তিও ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত
হইয়াছেন । কার্য্যটি দুরূহ বটে, কিন্তু তাহার নির্বাহের উপকরণ প্রভৃতিও
উপযুক্তই হইয়াছে । সুতরাং এ কার্য্য যে সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহার
সন্দেহ নাই । দেশ হিতৈষী বিদ্যানুরাগী মহাশয়গণের উপযুক্ত উৎসাহ
প্রদান প্রার্থনীয় । প্রত্যেক মাসে চারি ফর্ম্ম করিয়া প্রচারিত হইবে ।
বার্ষিক মূল্য ২।০ বিদেশে ডাকমাসুল ১।০ আনা অধিক লাগিবে ।

যাঁহারা গ্রন্থক্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন-লিখিত
ঠিকানায় আমার নিকট মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন ইতি ।

২৬ নং শ্যামবাজার স্ট্রীট,

শ্রীপারীমোহন সেন কবিরাজ ।

কলিকাতা ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ।

বৈজ্ঞানিকগ্রন্থের মুদ্রণ ও অনুবাদের দুরবস্থা দেখিয়া অনেক সময়েই আমাদের মনে বিলক্ষণ ক্ষোভ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ অনুবাদকগণের ভ্রম, অনবধানতা ও মূর্থতায় স্থানে স্থানে যেরূপ অনিষ্টপাত দেখা যায়, তাহা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। যে শাস্ত্রের সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, জীবনের হিতাহিত বা মঙ্গলামঙ্গল যে শাস্ত্রের উপদেশের উপর নির্ভর করে; তাহার মুদ্রণ ও শোধন কতদূর সতর্কতার সহিত হওয়া উচিত, ইহা অনেকেরই বোধ নাই। সংস্কৃতের একটি সামান্য বিন্দুবিমর্গেরও ব্যতিক্রমে যে কিরূপ অর্থান্তর ঘটে, তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। একটি পাঠান্তরের দ্বারা যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে সমস্ত গ্রন্থ অতি প্রাচীন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ঐ সমস্ত গ্রন্থের কতদূর পদপাঠের ব্যত্যয় হইয়াছে, ও কত অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইসকল হিতকর বিষয়ে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি না করিয়া যাহারা কেবল ব্যবসায়ের অনুরোধে পুস্তক মুদ্রিত করেন, তাহাদের দ্বারা জগতের প্রবঞ্চনা ভিন্ন কোন উপকার দেখিতে পাই না। সংস্কৃত মূলগ্রন্থের মুদ্রাস্থল যে প্রকারই হউক না কেন, উহাতে সাধারণের অপকারের সম্ভাবনা কম। কেননা সংস্কৃত মূল গ্রন্থ পণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকে প্রায় পাঠ করেন না, কিন্তু সাধারণ লোকেরা বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের হাতুড়িয়ারা প্রায় অনুবাদ পাঠ করিয়া তদনুসারেই চিকিৎসা দি করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অনুবাদের রহস্য বা উপকার অপকার বুঝিয়া লইতে পারেন না।

যাহারা বরাবর কোন বিষয়াস্তরে লিপ্ত ছিলেন তাহাদিগকে আয়ুর্বেদের অনুবাদক হইয়া হঠাৎ কৃতনামা হইতে হইবে। আয়ুর্বেদের ‘মা বাপ কেহই নাই’, কেইবা দৃষ্টিপাত করে। সুতরাং একজন সামান্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাড়াতাড়ি

অনুবাদ আরম্ভ হইল । আয়ুর্বেদের সঙ্কেতানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বাবুর নাম প্রচার করিবার জন্য “উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া” অতি দ্রুতবেগে অনুবাদ সমাপন করিলেন । তৎপরে সর্বজ্ঞ সমালোচকগণ দীর্ঘ সমালোচন আরম্ভ করিলেন । আর গ্রন্থের গৌরবের সীমা থাকিলনা, উহা বেদের ন্যায় অকাটা ও প্রামাণিক হইয়া পড়িল ।

এক দিন আমাদের কোনও বিশ্বস্ত আত্মীয় কোন পুরাতন অনুবাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাশয় যে গ্রন্থের অনুবাদ করিলেন উহা কিরূপ বুঝিলেন ? অনুবাদক বলিলেন আমি গ্রন্থের অল্পই বুঝিয়াছি । তবে এখনকার বাজার বিলক্ষণ বুঝিয়াছি । আমাদের আত্মীয় পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন । বাজার বিলক্ষণ বুঝিয়াছি ইহার অর্থ কি ? অনুবাদক উত্তর করিলেন, এ বাজারে যে অধিক পণ্ডিত নাই, যাঁহারাও আছেন, তাঁহারাও যে নিদ্রিত, ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি । কেননা আমি আয়ুর্বেদ কখনও আলোচনা করি নাই, উহার ভিতরে কি আছে, তাহাও জানি না । তুই একখানি অভিধানের সাহায্যে যাহা অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যখন অনেকে প্রশংসা করিতেছেন, তখন আর উক্ত কথা বুঝিবার বাকী কি ? এইরূপ উত্তর শুনিয়া আমাদের আত্মীয় অবাক হইয়া গেলেন । ফলতঃ এই সমাজে যেমন গ্রন্থলেখী অনুবাদক, তেমন ভূমিকাপাঠী সমালোচক, আবার তেমনই মলাটদর্শী পাঠক । এই তিনের সুন্দর রাজযোটক হইয়াছে । সুতরাং ইহাতে অনেক সময়ে কিরূপ সর্বনাশ ঘটে, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ ও সামাজিক লোকের মনোনিবেশ করা আবশ্যিক । চিকিৎসাশাস্ত্র কাব্য নয়, সাহিত্য নয়, ইতিহাস নয় অথবা কাল্পনিক কোন উপন্যাস নয়, ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য । সত্যের কোনরূপ স্বজন হইলেই বিপদ । বিশেষ আয়ুর্বেদের ভাষা অতি জটিল ও সন্দিক্ত, অনুবাদক বা ব্যাখ্যাতার অনবধানে

হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে। আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, গাউণীর কোন পাচনে “বিষ” শব্দের উল্লেখ আছে, বিষ শব্দে যে মৃণাল বুঝায়, তাহা ব্যাখ্যাতা জানিতেন না। কাঠবিষই জানিতেন, তদনুসারেই তিনি কাঠবিষ প্রয়োগ করিয়া গর্ভপ্রাব করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অল্পপিত্তের কোন পাচনে মার্কব শব্দের উল্লেখ আছে, মার্কব শব্দে যে ভৃঙ্গরাজ বুঝায় তাহা অনুবাদক জানেন না, তিনি উক্ত শব্দকে অর্কশব্দমূলক মনে করিয়া আকন্দের ক্ষীর অর্থ করিয়াছেন। আকন্দের ক্ষীর একটি উগ্র বিষ; উহা যে অল্পপিত্তরোগে কোন অংশেই উপযুক্ত হইতে পারে না, ইহা তাহার বুদ্ধিতেই উপস্থিত হয় নাই। আমরা জানি, এক ব্যক্তি উক্ত অনুবাদ দেখিয়া পাচন প্রয়োগ করায় বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অল্পদিন হইল কোন প্রসিদ্ধ গায়ক পঞ্চকোল পাচনের অযথোচিত অনুবাদের দোষে উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিতস্থানে এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ কে জানে। বিশেষ পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিজ্ঞ কবিরাজের সংখ্যা কম থাকায় হাতুড়িয়ার হস্তে অনেকেই জীবন সমর্পণ করেন। তালিকা বা অনুবাদই হাতুড়িয়ারদিগের প্রধান সম্বল। ইহাদের সংস্কার আরো কিছু অদ্ভুত। ছাপান কাগজ দেখিলেই বিশেষ কলিকাতায় মুদ্রিত উত্তম কাগজ উত্তম বাধান ও রহদাকারের কোন পুস্তক পাইলে ইহাদের ভক্তির পরিসীমা থাকেনা। তাহাতে যদি পুস্তকের ভূমিকায় দুই একটি আখ্যায়িকার প্রয়োগ দেখে, দুই এক বার ভারতের পূর্বাবস্থার বর্ণনা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা সেই আনন্দে একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে। এইরূপ গ্রন্থের লেখক যে একজন অবতার বিশেষ বা অভ্রান্ত পুরুষ, এবিষয়ে তাহাদের কোনও দ্বিধাই থাকে না। সুতরাং এরূপ অনুবাদ দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে কত ব্যক্তির অকালে প্রাণনাশ হইতেছে,

তাহার বিশেষ শাসন হওয়া উচিত কিনা ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য। অঙ্গীলতানিবারণের জন্য যদি আইনের একটি ধারা হইতে পারে, তাহা হইলে অনেকের প্রাণরক্ষার্থ কোন প্রকার ব্যবস্থা হওয়া বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অনুবাদক বা প্রবন্ধকারদিগের পক্ষে যে বিশেষ শাসন আছে তাহা এদেশে নাই। হইতেও অনেক বিলম্ব আছে। তদ্রূপ সুসভ্য দেশ সকলে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসা, দর্শনপ্রভৃতি প্রত্যেক শাস্ত্রের অনু-শীলন ও উন্নতির জন্য এক বা অধিক সমাজ বা সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়-সমূহ স্বদেশ ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিগণই ইহাদিগের সভ্যশ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্মানিত হইলে, তিনি যে সভ্য জগতে সম্মানিত হইলেন তাহার আর সন্দেহ কি? প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। উক্ত পত্রিকাসকলে শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনা, নূতন আবিষ্কৃত বিষয়ের আন্দোলন ও প্রচারিত বিষয়সকলের সমালোচন হয়। নূতন রচনা বা নূতন অনুবাদ তাঁহাদিগের নিকট সমালোচনের জন্য প্রেরিত হইলে, তাঁহারা উক্ত কার্য্য সর্বদা নিরপেক্ষভাবে এবং বিশেষ যত্ন ও বিজ্ঞতার সহিত সম্পন্ন করেন। এই কারণেই তাঁহাদিগের প্রতিপত্তির লোপ হয় না, এবং তাঁহাদিগের প্রকাশিত মতের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ ব্যক্তি-সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। আগাদের দেশের সমালোচকদিগের প্রকৃতি অন্যরূপ, তাঁহাদিগের ভয়ের বিষয়ও অতি অল্প এবং তাঁহারা সর্বদা শ্রমবিমুখ। এই জন্য তাঁহাদিগের সমালোচনকার্য্য সর্বথা সমুচিত মত নির্বাহ হয় না। অপিচ এদেশের সমালোচকদিগের সকল প্রকার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা

সকল সময়ে ঘটে না। স্বার্থ বিসর্জন করিয়া কোন বিষয়ে একান্ত মনে সত্যানুসন্ধানে ভ্রতী হওয়া একরূপ এবং সামান্য যশো লিপ্সার অনুগত হইয়া উহাতে হস্তার্পণ করা অশুভরূপ। যাহাহউক যে কোন কারণে প্রচারিত বা অনুবাদিত পুস্তক সকলের যথাযোগ্য সমালোচন থাকিলে গ্রন্থকারক ও অনুবাদকদিগের একরূপ শাসন হইতে পারে।

অন্যবিষয়ে যাহাই হউক, অন্ততঃ আয়ুর্বেদীয় অনুবাদের কোন-রূপ ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি হওয়া উচিত। নতুবা অলক্ষ্যভাবে চিকিৎসা দোষে মূর্খের হস্তে কত শত ব্যক্তির যে প্রাণ-বিয়োগ হইতেছে, তাহার স্রোত নিবারণের অন্য উপায় নাই। একেত চিকিৎসার অধিকাংশ ব্যাপারই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আনুমানিক। অতি স্পৃহিত ব্যক্তিকেও অনেক সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অতি সূক্ষ্মনির্মলবুদ্ধি ব্যক্তিরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত এবং আকুলিত হয়, সেস্থলে বিদ্যা, বুদ্ধি বা চেষ্টার অসাধ্য বলিয়া মীমাংসা করা যায়। কিন্তু মূর্খ অর্থলুপ্ত অনুবাদকগণের দৌরাভ্যে যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে তাহা আর ঐরূপ মীমাংসার যোগ্য নহে। যাহারা ঐরূপ অনুবাদক, তাঁহাদের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু যাহারা পণ্ডিত হইয়া উদাসীন্য অবলম্বন করেন, সাধারণকে উহা বুঝাইয়া না দেন তাঁহারাও উক্ত পাপের কিঞ্চিৎ অংশভাগী কি না সভ্যসমাজ তাহার বিচার করুন।

আমরা যাহা বলিলাম, ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ আমাদের লক্ষ্য নহে, কিংবা বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ কাহার কোন দোষোদ্ঘাটন করা উদ্দেশ্য নহে। কেবল দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং অনুবাদকের মঙ্গল চিন্তাই উদ্দেশ্য। আমাদের বিবেচনায় অনুবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ অবলম্বন করিলে, সাধারণের উপকার হইতে পারে।

১। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহ প্রধানতঃ দুই প্রকার। মূলগ্রন্থ ও সংগ্রহ গ্রন্থ। সংগ্রহ গ্রন্থ আবার তিন প্রকার; বৈদিকসংগ্রহ, তান্ত্রিকসংগ্রহ এবং মিশ্রসংগ্রহ। মূল গ্রন্থে সূত্রাংশ এবং ঔষধকাণ্ড উভয়ই সমান ভাবে আলোচিত হইয়াছে, সংগ্রহগ্রন্থে সূত্রাংশ অল্প এবং ঔষধের কাণ্ড (ঔষধের তালিকা) ই অধিক দৃষ্টি-গোচর হয়। এই হিসাবে অধিকাংশ মূল গ্রন্থকে শাস্ত্রীয়তাপ্রধান এবং সংগ্রহ গ্রন্থ গুলিকে তালিকাপ্রধান বলা যাইতে পারে। তবে সংগ্রহগ্রন্থে শাস্ত্রীয়তা নাই এমন নহে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঔষধের ফর্দই অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। সংগ্রহকারকের মধ্যে যাহারা দৃষ্টফল ঔষধ যত বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংগ্রহই তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বৈদ্য সমাজে আদৃত। মূল-গ্রন্থসমূহ শাস্ত্রীয়তাপ্রধান বলিয়া সংগ্রহগ্রন্থ অপেক্ষা দুর্বল, এবং সংগ্রহগ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বলিয়া মূলগ্রন্থ অপেক্ষা দুর্বল। কেন না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত জানিতে না পারিলে পরস্পর-বিরোধী মতসমূহের মীমাংসা বা সমাবেশ করা যাইতে পারে না। সুতরাং মূলগ্রন্থের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা কোন কোন অংশে সংগ্রহগ্রন্থ অপেক্ষা কঠিন, এবং সংগ্রহ গ্রন্থের অনুবাদ বা ব্যাখ্যাও মূলগ্রন্থ অপেক্ষা কোন কোন অংশে কঠিন।

২। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা হইল, অতঃপর অনুবাদের বিষয় বলা আবশ্যিক। অনুবাদও সাধারণতঃ দুই প্রকার; স্বাধীন অনুবাদ এবং আক্ষরিক অনুবাদ। কোন গ্রন্থ অধ্যয়নান্তে তাহার মর্ম সুন্দর রূপে অবগত হইয়া গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বিষয় নিজের ভাষায় বিশদ করার নাম স্বাধীন অনুবাদ। অপর, গ্রন্থের লিখিত ভাষার অবিকল অনুবাদ করার নাম আক্ষরিক অনুবাদ। উভয় অনুবাদের মধ্যে পূর্বেক্ত অনুবাদই

কঠিন । কঠিন হইলেও উহা প্রকৃত ভাবব্যঞ্জক । আয়ুর্বেদের যে যে গ্রন্থ বা অংশ সূত্রপ্রধান বা শাস্ত্রীয়তাপ্রধান সেই সেই গ্রন্থে বা অংশে স্বাধীন অনুবাদই প্রাপ্ত । কেন না আয়ুর্বেদীয় সূত্রসকল দার্শনিক সূত্রের ন্যায় স্বলক্ষণে প্রথিত, বহুচিন্তা ও পরীক্ষা ভিন্ন সহসা ঐ সকল সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্যগ্রহ হইতে পারে না । সুতরাং “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” করিয়া অনুবাদ করিলে উহাতে কোন পাঠকের উপকারের সম্ভাবনা নাই । কোন কোন অঙ্কলোক মনে করেন, গ্রন্থের প্রতিশ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে যদি মূলের সহিত ঐক্য না রহিল, তাহা হইলে অনুবাদ কি ? কিন্তু তাহাদের ইহা বুঝা আবশ্যিক, সকল গ্রন্থের শব্দ-চর্চণ আবশ্যিক নহে, ক্রিয়াপ্রধান বা ফলপ্রধান শাস্ত্রের ভাব বা তাৎপর্যই আবশ্যিক । সেই তাৎপর্যবোধের যদি ব্যাঘাত ঘটিল, তাহা হইলে অনুবাদে বিশেষ লাভ কিছু নাই । অন্ধ অনুবাদ হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই ভাল । স্বাধীন অনুবাদে শ্লোকাক্ষরের মিল সর্বত্র রাখিলে ভাল হয় না । কখন কখন একটা শ্লোককে চারি পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া অনুবাদ করিতে হয় । আবার মূলগ্রন্থে কতকগুলি এমন অংশ আছে, অনুবাদে যাহা পরিত্যাগ করিলেও কোন হানি নাই । বরং কিছু স্থান লাভ হয় যথা—প্রায় অনেক অধ্যায়ের শেষ অংশে “তবন্তি শ্লোকাঃ” এইরূপ উল্লেখের পরে কতকগুলি শ্লোক আছে । ইহার তাৎপর্য এই যে, পূর্বে যে বিষয়গুলি গদ্যে লিখিত হইয়াছে, সেই গুলি পুনর্বার শ্লোকে লিখিত হইল । কেন না, শ্লোকে বা কোন ছন্দে লিখিত বিষয় শীঘ্র কণ্ঠস্থ হয় এবং অনেক দিন স্মরণ থাকে । যিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে গিয়া এখানে “শ্লোকে কহিতেছেন” প্রতিজ্ঞা করিয়া গদ্যে অনুবাদ করিলেন, ইহাতে গ্রন্থের শব্দের অনুবাদ হইল বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনসারে অনুবাদ হইল না । তবে উহা পদ্যে অনুবাদ

করিতে পারিলে অভিপ্রায় রক্ষিত হইতে পারে । তালিকাপ্রধান গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ প্রশস্ত ।

মূল গ্রন্থেরই হউক আর সংগ্রহ গ্রন্থেরই হউক, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে গুরুপদেশ, ব্যাখ্যা, বিয়তি, উদাহরণ প্রভৃতি থাকা চাই । তাহা হইলে গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদগত হইতে পারে এবং ফল-প্রধান শাস্ত্রের কার্য্যগত দৃষ্টিও জন্মিতে পারে ।

৩। আয়ুর্বেদের সর্বাংশে ব্যুৎপন্ন লোক বিরল । যিনি বচন মাত্রের অর্থ বা আয়ত্তি করিতে পারেন, কিন্তু ক্রিয়া জানেন না, তাহাকে ব্যুৎপন্ন বলিতে পারি না । যিনি ক্রিয়া জানেন, কিন্তু বচন জানেন না, তিনি অনেক অংশে পূজনীয় । অতএব অনুবাদ কালে ক্রিয়ানিপুণ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করা চাই । আয়ুর্বেদের অনেক ভাব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল ভাব শীঘ্র উদ্ধার করার উপায় নাই । এমন স্থলে “মাছিয়ারা” কেরানীর ন্যায় অনুবাদ না করিয়া সন্দেহবোধক কোনরূপ চিহ্ন বা উক্তি থাকা প্রয়োজনীয় । কেন না ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশিত হইলে কোন না কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিবেন ।

৪। ঔষধবোয় নাম এবং অর্থবোধও একটি কঠিন ব্যাপার । এরূপ অনেকগুলি শব্দ আছে অভিধান গ্রন্থে যাহাদের বহুবিধ অর্থ উল্লেখ দৃষ্ট হয় । সুতরাং গ্রন্থকার কোন অর্থ লক্ষ্য করিয়া কোন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অসংশয়ে নির্ধারণ করা সহজেই দুঃসহ । তাহাতে আবার ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির অনুরোধে শব্দের আকার ও প্রকারগত বিকৃতি বা বৈলক্ষণ্য ঘটায় সমধিক সন্দেহ জন্মে । এমনস্থলে পরীক্ষা করিয়া দ্রব্যার্থনির্ণয় করাই সর্ব্বথা কর্তব্য । তাহা না ঘটিলেও ব্যবহারনিপুণ শিক্ষিত বহুব্যক্তির মত সংগ্রহ করিয়া অর্থ নির্ণয় আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ শব্দের অর্থ বোধ হইলেও ঐ সকল শব্দে কোন বস্তু বুঝায়, তাহা সাধারণকে বুঝান

নিতান্ত সহজ নহে । কেন না এক বাজালা প্রাদেশেই একই বস্তু নানা নামে ব্যবহৃত হইতেছে । এমন স্থলে কোন প্রাধান স্থানের নাম গ্রন্থে ব্যবহার করিলে ভুল হয় । কলিকাতা ভারতের প্রাধান রাজধানী, এইস্থানে শিক্ষিত এবং সভ্য লোকের সংখ্যা বেশী, সুতরাং কলিকাতার শিক্ষা প্রভৃতি সকলেই অনুকরণ করিতে প্রস্তুত অতএব কলিকাতার বাজারে ব্যবহৃত নাম ব্যবহার করিলে অনেকের আপত্তি না হইতে পারে । গ্রন্থশেষে একটি আভিধানিক সূচী প্রস্তুত করিয়া সেই সূচীতে প্রাধান প্রাধান স্থান-সকলের নাম যোজনা করিলে সুন্দররূপে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব ।

৫। আয়ুর্বেদ এক প্রকার নষ্ট শাস্ত্র উহার সর্বাংশের ক্রিয়া সুন্দররূপে কাহারও বিদিত নাই । কতকালে যে ইহার প্রকৃত উচ্চার হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই । ইহার পদে পদেই সন্দেহ উপস্থিত হয় । সন্দিহান বিষয় সকল বিনা পরীক্ষায় সাধারণের (বিশেষ অনভিজ্ঞ লোকের) নিকটে প্রচার করা ন্যায্য-বিরুদ্ধ ও ধর্ম্যবিরুদ্ধ । সুতরাং উহার ভাল মন্দ বিচারের ভার উপযুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা উচিত । তন্মিত্ত তাঁহার সমাজে পাণ্ডিত বলিয়া গণনীয় তাঁহাদের নিকটেও গুণ দোষ অনু-সন্ধানার্থে গ্রন্থ অর্পণ করা কর্তব্য । যদি তাঁহারা কোন উপকারি ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রন্থে যোজনা করা কর্তব্য । এবং যে সমস্ত ভ্রম প্রদর্শন করেন, তদনুসারে শুদ্ধিপত্র প্রচার করা আবশ্যিক ।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঈশানচন্দ্র বিশারদ যে মণিক মানুবাদ চরকসংহিতার প্রচার উদ্দেশে অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন । অনুবাদসম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহাদের মতের কতদূর ঐক্য হইবে বলা যায় না । তথাপি তাঁহাদের গন্তব্যপথে ইহা যদি কিঞ্চিৎ

আলোক প্রদান করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশে এত কথা বলিলাম । বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে চরকের ন্যায় চক্ৰহ গ্রন্থ আর নাই । সুতরাং ইহার অনুবাদ বিষয়ে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে ষড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে । আমরা বিশারদদ্বয়ের পাণ্ডিত্যের উপর যতদূর বিশ্বাস করি, তাহাতে বোধ হয়, চরকের ভাবী অনুবাদ লক্ষ্যাদিসুন্দরই হইবে ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

আমরা বস্তুবিদ্যা (১) নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম । কিছুদিন পূর্বে পাইকপাড়া নগর হইতে এই শ্রেণীর আর একখানি পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল । এক্ষণে তাহার তিরোভাবে বস্তুবিদ্যাই উক্ত পত্রিকার স্থান অধিকার করিল ।

বস্তু বিদ্যার অবতরণিকা ভাগে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
“ইংরাজ রাজত্ব প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ভারতবাসী আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লইত । কিন্তু আজ কাল আর সে সময় নাই, আমরা কেবল “হা ভারত যো ভারত ” করিয়া ভারত উদ্ধারে উদ্যত হইয়াছি । কিন্তু এদিকে বিলাতী দীপ শলাকা না হইলে গৃহে প্রদীপ জ্বলে না । কি বিড়ম্বনা ! আমরা প্রদীপ্ত জ্বালাশন ভ্রমে ভ্রমে যত নিষ্ক্ষেপ করিতেছি । যতদিন ভারতবাসী স্বাবলম্বী হইয়া আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতে না শিখিবে, ততদিন কোনক্রমেই শ্রেয়ঃ নাই । জগতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে আপনার ক্ষমতা সত্ত্বে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, মনুষ্য কখন

(১) গ্রীহরিপদ চক্রবর্তীকর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত । বার্ষিক মূল্য ২২ টাকা ।

উন্নতি-শৃঙ্গের উচ্চতম নিখরে আরোহণ করিতে পারে না । যাহাতে সকলে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য আপনি প্রাপ্ত করিয়া লইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রাযত্ন হওয়া একান্ত আবশ্যিক । আমরাও বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্ততের নিয়ম সরল ভাষায় বিশদরূপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব । বস্তুবিদ্যায় মুষ্টিযোগ, ইন্দ্রজাল ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তা-
ষও স্থান পাইবে । ভরসা করি তাহাতে আগাদিগকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে না । সে যাহা হউক, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং আধুনিক কয়েকখানি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থই আমাদের প্রধান অবলম্বন । আমরা ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব । কারণ এদেশের দ্রব্যাদি এই দেশের প্রধান উপ-
যোগী ।” সুতরাং ইহার উদ্দেশ্য অতিসুন্দর ও মহোপকারী তাহার সন্দেহ নাই । ইহাতে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় এবং সর্বদা ব্যবহার্য দ্রব্যের গুণ লিখিত হইতেছে । লিখিত বিষয়গুলির ভাষা প্রাঞ্জল সুতরাং সাধারণের বোধগম্য ও উপকারী হইবে ; আমরা এইরূপ ভরসা করিতে পারি । কিন্তু একটি বিষয়ের সঙ্গে আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখিতেছি । কেবল কতকগুলি বচন দেখিয়া বিনা-
পরীক্ষায় যে কোন বিষয় লিখিয়া পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না । পত্রিকার দ্বাদশ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে । মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিয়াছিলেন প্রিয়ে । অশোক, চিতার মূল, খজুর পক্ষীর বিষ্ঠা, ঘোটকের ফেনা, শোভাজন বীজ এবং স্বর্ণচাতক বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর নেত্র দ্বয় দ্বারা ধূপ দিলে লোকে দেবগণেরও অদৃশ্য হয় । মনুষ্যের কথাই বা কি ।।।

কেবল সংস্কৃত বচনমাত্র দেখিয়া ঐরূপ আজগবি বস্তুবিদ্যা লেখা অকারণ সময় নষ্ট করা মাত্র । আমরা আশা করি, গ্রন্থকার মহাশয় অতঃপর লেখিতব্য বিষয়ে যোগ্যযোগ্য বিবেচনা করিয়া দ্রব্যের গুণ প্রচার করিবেন ।

আয়ুর্বেদ কত কালের ?

চতুর্থ প্রস্তাব ।

প্রশ্ন শুনিলে বোধ হয়, প্রশ্ন কর্তার মনে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় বা কোনরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত নাই । প্রশ্ন কর্তা কেবল আয়ুর্বেদের প্রচার-কাল জানিতে চাহেন, অথবা উহার পুরাতনতার ইয়ত্তাবধারণ করিতে ইচ্ছুক । যাহাই হউক, আয়ুর্বেদের আবির্ভাব-কাল বা প্রচার-কাল নিঃসন্দিক্তরূপে নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য । আয়ুর্বেদ যে কোন্‌ স্মদূর অতীতকালে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা আজ আমরা কেহই বলিতে পারিব না, কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব না । যদিও আমরা অসমর্থ, তথাপি আজ ছুরাশার বশবর্তী হইয়া আয়ুর্বেদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান বা আলোচনা করিব ।

আয়ুর্বেদের আবির্ভাব-কাল অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমতঃ কতকগুলি প্রাচীনতম আর্ষগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয় । তদ্বারা কোন একটা কালকেন্দ্র স্থির করিয়া, কোন একটা নির্দিষ্ট কালকে কেন্দ্ররূপে বা বিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়া, অবশেষে তাহার পূর্বাপর প্রান্ত বা পূর্বাপর রেখা নিরীক্ষণ করিতে হয় । ঐরূপ করিলেই বোধ হয়, আয়ুর্বেদের আবির্ভাব-কাল আকর্ষিত হইবে, অন্ততঃ আংশিক তথ্য অবশ্যই প্রকাশ পাইবে ।

কালকেন্দ্র অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট কালকে মূল বা বিন্দু স্বরূপে Zero point গ্রহণ করিতে হইলে, মুখ্যকল্পে মহাভারত-কালকে গ্রহণ করা উচিত । মহাভারতকাল সুনির্দিষ্ট হইলে, তথা হইতে যে দিক ইচ্ছা সেই দিক নিরীক্ষণ করা যাইবে এবং প্রত্যেক পুরাতন গ্রন্থকাল নিকট হইয়া আসিবে । কিন্তু দুঃখের

বিষয় এই যে, কুরুপাণ্ডবকালের ওদিকে যাইতে বর্ষগণনা করা যায় না । বরং ১২২৩ এবং ক্রমে বর্ষগণনা করিয়া এদিকে আশা যায়, তথাপি তাহার উপরের দিকে পাওয়া যায় না । উপরে কেবল যুগ গণনা, বর্ষ গণনা ওদিকে নাই বলিলেও বলিতে পারি । না থাকুক, আমাদের অশ্বেষ্টব্য বস্তু প্রায়ই এ দিকে আছে, সুতরাং এই দিকটা দেখিলেই আমাদের যথেষ্ট কার্য্য হইবে ।

মহাভাবতকালই যদি প্রথম অশ্বেষ্টব্য হইল, তবে, তদ্বিময়েই মনোনিবেশ করুন । কোন্ সময়ে ভাবত যুদ্ধ হইয়াছিল, কুরু-রাজ যুদ্ধিষ্ঠির কোন্ সময়ে রাজ্য করিয়াছিলেন, তদ্বৃ্তান্ত পরিপূর্ণ মহাভারত গ্রন্থ কোন্ সময়ে প্রচারিত হইয়া ছিল ?—এ সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে আমাদের বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না । তাহার কারণ এই যে, পূর্ন পূর্ন বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা অনেক বার উহার অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন, এবং অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য সকল লিপিবদ্ধ করিয়াও ছিলেন । সেই সকল লিপি আমরা অদ্যাপি পাইতেছি, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেই আমরা সহজে মহাভারত কাল জানিতে সক্ষম হইব ।

আট শত বৎসরের যুদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকঙ্কণ মিশ্র অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়া ছিলেন যে, কলির ৩৫৩ বৎসর অতীত হইলে পর, পৃথিবী কুরুপাণ্ডবগণের শাসনাধীন হয় । তাঁহার উদ্ভাবিত যুক্তিপ্রণালী এস্থলে উল্লেখ কবিরার তত প্রয়োজন নাই বলিয়া, তাঁহার বিনির্গীত সিদ্ধান্তমাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । বোধ হয় তল্লিখিত সিদ্ধান্ত শ্লোকটাই আমাদের ঈপ্সিত বিষয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হইবে । যথা—

“—যট্শু সার্কেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলৈর্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, পৃথিবীতে কুরুপাণ্ডবগণ আধিপত্য করিয়াছিলেন। *

কল্পণ পণ্ডিতেব এই নির্ণয় যে ভ্রান্ত নির্ণয় নহে, তৎপ্রতি অনেক কাবণ আছে। সে সকল কারণ উল্লেখ কবিত্তে গেলে প্রবন্ধকায়া বাড়িয়া যায় এবং অপ্রাসঙ্গিকতুল্য হয়। তবে যদি কাহারও ইচ্ছা হয় ত তিনি কল্পণ পণ্ডিতেব কাণ্ডোবেব ইতিবৃত্ত দেখিবেন, দেখিলেই তাঁহার মন্দেহ অপনীত হইবে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ প্রণেতা বিষ্ণুশর্মা অপেক্ষা ও পূর্বোক্ত কল্পণ পণ্ডিত অপেক্ষা বহুপ্রাচীন প্রধানতম জ্যোতির্বিৎ আচার্য্য বরাহমিহিব মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াগিয়াছেন। তিনি স্বকৃত বৃহৎসংহিতানামক জ্যোতির্গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে,

“আমন্ মঘাস্থ মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।

যড্ধিক পঞ্চ দ্বিযুতঃ শককালন্তয়া বাজ্ঞশ্চ ॥”

রাজা যুধিষ্ঠিব যখন পৃথিবীশাসন করেন, মণ্ডর্মিণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) তখন মঘানক্ষত্র ভোগ করিতেছিল। মণ্ডর্মিচাব গণনার দ্বারা স্থিৎ হইয়াছে যে, তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর পবে শকান্দ প্রচারিত হইয়াছিল। এখন বিবেচনা করুন, বর্তমান বৎসর বা আমরা আর রাজা যুধিষ্ঠিব, এই উভয়েব অন্তরালে কি পরিমাণ কাল পাড়িয়া আছে। ২৫২৬ আর শকান্দ ১৮০৬ একত্রিত করিলে অবশ্যই ৪৩৩৪ বৎসর হইবে। জ্যোতির্বিৎ শ্রেষ্ঠ মহামান্য বরাহমিহির যদি মিথ্যা বাদী না হন, যদি তাঁহার গণনা কবিত্তে ভ্রম না হইয়া থাকে, তবে, তাঁহার দোহাই দিয়া আগবা বলিতে পারি, রাজা যুধিষ্ঠির আজ হইতে ৪৩৩৪ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

* অন্যান্য প্রমাণেব দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, এই কালটী কুরুপাণ্ডবগণেব জন্মকাল, রাজ্যকাল নহে।

যতকাল এদেশে পঞ্জিকার সৃষ্টি হইয়াছে—তত কালই তাহাতে কল্যাদ লিখিত হইয়া আনিতেছে । এ বৎসরের পঞ্জিকায়, নিয়মানুসারে, ৪৯৮৫ কল্যাদ লিখিত আছে । যুধিষ্ঠির যদি সত্য সত্যই ৬৫৩ কল্যাদ অতীত করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পঞ্জির নিয়মটি অব্যভিচারিত হয় । অর্থাৎ পঞ্জিকার লিখিত ৪৯৮৫ কল্যাদের সহিত হিনাবী কল্যাদের ঐক্য হয় ।

প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত জ্যোতির্গণনা অনুসারেও উক্ত কুরু-পাণ্ডবকাল নির্ণীত হইতে পারে । প্রধানতম জ্যোতির্বিৎ বরাহমিহির সপ্তর্ষিচার গণনাব নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে—

“একৈকস্মিন্নক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্ ।”

ঐ সপ্তর্ষিগণ (সাত ভেয়ে তাবা) শত বৎসর ধরিয়া এক এক নক্ষত্র ভোগ করে । অর্থাৎ সপ্তর্ষি নামক জ্যোতিষ্ক শ্রেণীব এক অঙ্গগতি যে এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতে উহাদের একশত বৎসর লাগে ; সুতরাং সমস্ত রাশি পরিভ্রমণ করিতে ২৭০০ সাতাইশ শত বৎসর অতিবাহিত হয় । এবস্তূত সপ্তর্ষিগণল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এখন তাহা মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগ করিতেছে । জ্যোতিষ্ক সাতেরই মন্দগতি ও শীঘ্রগতি হইয়া থাকে । সুতরাং সপ্তর্ষিগণের গতিও কখন মন্দ কখন বা শীঘ্র হইয়া থাকে । এই গতিমূলক স্ফুট গণনা হইতে ভুক্তি আনয়ন করা হইয়া থাকে । তদ্বাচা নির্ণীত হইয়া থাকে যে, সপ্তর্ষিগণের গতিমাত্র প্রত্যেক রাশি ভোগেব অন্তবে অন্তবে হইয়া থাকে , তদনুসারে প্রত্যেক সহস্র বৎসরে এক এক শত বৎসর করিয়া ভুক্তি বৃদ্ধি লক্ষ হয় । পুনরপি সহস্র বৎসরান্তে তাহাদের শীঘ্র গতি আরম্ভও হয় । সেই বৃদ্ধি সঞ্চলন করিলে এবং মধ্যে অন্য একবার মঘা গতি ধরিয়া লইলে, উল্লিখিত কাল পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যাও মিলিয়া যায় ।

উল্লিখিত গণনার দ্বারা, উক্ত জ্যোতিষ প্রমাণে দ্বারা, ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির ৪৩৩২ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির লিখিত চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যকাল গণনা করিলেও উল্লিখিত কাল পাওয়া যায়।

মহারাজ পাণ্ডুর পরলোক হইলে অনাথিনী কুন্তী শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করেন। যুধিষ্ঠিরের বয়স তখন ১৬ বৎসর হইয়া ছিল। ইহার পর ঋতুগৃহ দাহ পর্যান্ত ২০ বৎসর কাল অরণ্যানী ভ্রমণ করেন। অনন্তর দ্রৌপদীবিবাহের পর, ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া ১৮ বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন। পরে, পাশক্রীড়ায় নির্জিত হইয়া ১৩ বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করেন। সেই ১৩ বৎসর অতীত হইলে ভারত মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সর্দাস্তকর মহাযুদ্ধের শেষ হইলে তিনি বীরশূন্য পৃথিবীতে রাজা হন এবং ৫৭ বৎসর রাজ্য পালন করিয়া অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদে নির্বিঘ্ন হইয়া মহা প্রস্থান গমন অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। অতএব, লিখিত সংখ্যা সকল একত্রিত করিলে, অর্থাৎ ১৬, ২০, ১২, ১৮, ১৩, এবং ৫৭ বৎসর একত্রিত করিলে যুধিষ্ঠিরের জীবন ১৩৬ বৎসর অবধারিত হয়। ইহার পরেই তদীয় সিংহাসনে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ উপবিষ্ট হন। লিখিত আছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ ৯৬ বৎসর বয়সে সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে পরীক্ষিতের দেহোপরম পর্য্যন্ত গণনা করিলে, কলিগতাব্দ তখন ৮৮০ সমাপ্ত হইয়াছিল, ইহা নির্ণীত হয়। এই সময় হইতে মগপেশ্বর পদ্মপতি নন্দ এবং তৎসন্তৃত নব নন্দের শেষ নন্দ বা তাহার চাণক্য কর্তৃক নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত গণনা করিলে ১৭২৮ বৎসর পাওয়া যায়।

(জনগন পুত্র)

সহদেব,

।

মার্জ্জাবি,

।

অতশ্রবা,

।

যুতায়ু,

।

নরগিহ,

।

সুনক্ষত্র,

।

রূহৎসেন,

।

কর্মজিৎ,

।

সুতঞ্জয়,

।

বিদ্যা,

।

শুচি,

।

ক্ষেম,

।

সুত্রত,

।

ধর্মসুত্র,

।

নম,

।

দূরসেন,

।

সুমতি,

।

সুবল,

।

সুনীথ,

।

সত্যজিৎ,

।

বিশ্বজিৎ,

।

রিপুঞ্জয় বা পুরঞ্জয় ।

এই ২২ জন রাজা(১০০০)সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন ।

নন্দ ও নব নন্দ ৩০০ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন ।
নব নন্দেব শেষ নন্দ চাণক্য কর্তৃক নষ্ট হইলে, গৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত
তৎসিংহাসন অধিকার করেন ।

এই গণনা অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত রাজা কলি ২৬৮৩ বৎসর পবে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বর্তমান কল্যক পূর্বণার্থ উক্ত সংখ্যা
যোগ করিলে চন্দ্রগুপ্তেব আয়ু এক্ষণে ২৩০২ বৎসর অতীত
হইয়াছে, ইহা অবধানিত হয় । *

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, কলিপ্রারম্ভ কাল হইতে যুধিষ্টি-
রাদির জন্মকাল অবধি গণনা করা যাইতে পারে কি-না । কলির
৩৫৩ বৎসর পবে যুধিষ্টিব, তাঁহার জীবন ১৩৬, তাঁহার ভ্রাতৃপোত্র
পরীক্ষিতেব জীবন ৯৬, তৎসমকালিক জরাসন্ধপুত্র মহদেব হইতে
চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৭৯৮, এবং চন্দ্রগুপ্ত হইতে বর্তমান অব্দ ২৩০২ ।
* সমুদায়ে ৪৯৮৫ ।

“ আয়ুর্বেদ কত কালের ? ” এই প্রশ্নোপলক্ষ্যে আমরা কলি
প্রাবস্ত, কলিগতান্দ, যুধিষ্টিবাদির জন্মকাল এবং তাঁহাদের রাজ্য
কাল অনুসন্ধান করিলাম । প্রাচীন শাস্ত্রেব সাহায্যে যাহা লব্ধ
হইবার সম্ভাবনা তাহাও এই প্রস্তাবে বিন্যস্ত করিলাম । এক্ষণে
মহাভারতকাল অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেন না মহাভারত কালটী
নির্ণীত হইলেই আয়ুর্বেদ-কালটী সহজবোধ্য হইয়া আসিবে ।

মহাভারত সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার জল্পকথা উল্লেখ
করিয়া থাকেন । কেহ বলেন, মহাভারত এক জনের লিপি নহে ;

* ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ চন্দ্রগুপ্তেব জন্মকাল বা রাজ্যকাল খ্রীঃ পূঃ
আনুমানিক ৩২৪ বৎসর হইয়াছে, একপ স্থি কবেন । কিন্তু উল্লিখিত
প্রমাণ দ্বারা উল্লিখিত কালই পাওয়া যায় ।

* এই সকল সিদ্ধান্তেব প্রমাণ ভাগবত, বিষ্ণুপুর্বাণ, মহাভারত ও হরি-
বংশে আছে । আবশ্যক হইলে পাঠকগণ অন্বেষণে দে য়া লইতে পারেন ।

কেহ বলেন, বর্তমান মহাভারত ব্যাসের নহে; অন্য বলেন, মহাভারত ব্যাসের বটে; পরন্তু যাহা ব্যাসের, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বর্তমান মহাভারত তাহার ছায়া মাত্র। এ কথা উচিত প্রত্যুত্তর থাকিলেও সে সকল প্রত্যুত্তর এ প্রবন্ধের অবিষয়। যাহাই হউক, বিদ্যমান মহাভারত যখন ব্যাসের কৃত বলিয়া নিরূঢ় বা প্রসিদ্ধ, তখন আর সে পক্ষে সংশয় উত্থাপন করা আমাদের বিবেচনায় নিষ্ফল। বিদ্যমান মহাভারতের মধ্যে যতই গোলো-যোগ ঘটুক, প্রক্ষেপ নিক্ষেপ থাকুক, ইহার অনেকাংশই যে ব্যাসের, তৎপক্ষে অনেক অকাট্য প্রমাণ দেখান যাইতে পারে; পরন্তু তাহা অনুদ্দেশ্য বলিয়া এ প্রবন্ধে বিস্তার করিলাম না। স্কল কথা এই যে, বিদ্যমান মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত থাকিলেও এক সময়ে ইহা যে বিশুদ্ধ ছিল এবং সেই বিশুদ্ধ অংশ যে ভগবান্ বেদ-ব্যাসের মুখ হইতে নির্গত, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

প্রক্ষেপ নিক্ষেপ বর্জিত বিশুদ্ধ মহাভারত ব্যাসের কি না, যদি তাহা ব্যাসের হয়, তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল এ সকল তথ্য নির্ণয় কবিবার জন্য সমধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না। অত্যান্ন মনোনিবেশ করিলেই ঐ সকল তথ্য জানা যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলে পর, অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ তদীয় রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। তিনি ৯৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎপরে তদীয় পুত্র জনমেজয় তদীয় রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। এই জনমেজয় রাজা ৪৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন এবং ইহারই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।

রাজা জনমেজয় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াই মর্পসত্রে দীক্ষিত হন। ঐ অদ্ভুত মর্পে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ব্যাসকৃত মহাভারত শ্রবণ করান। তাহারই অত্যন্তকাল পরে উগ্রশ্রবা নামক

অনেক মুনি নৈমিষাবণ্যে গমন পূর্বক শৌনক প্রভৃতি মুনিগণকে উহা শ্রবণ করান। তৎ শ্রবণে অনেক ঋষিই মুগ্ধ হইয়া মহাভারত গ্রন্থ শিক্ষা করিতে ও পঠন পাঠন করিতে উদ্যোগী হন। ক্রমে তাহা সর্বত্র প্রচারিত ও জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠে। স্মরণীয় বিবেচনা করিতে হইবে যে, মহাভারত প্রচারের কাল অনধিক চতুঃ সহস্র বৎসর। বিদ্যমান মহাভারত যতই প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত দোষাত্মক হউক, ইহার আধার ভাগটী সার্বত্রিক ত্রিসহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে। *

পানিনি অপেক্ষা বহু প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বকৃত ব্রাহ্মণ বিভাগে (উপনিষদে) ব্যাসকৃত মহাভারতকে পঞ্চম বেদ ও ইত-হাস-পঞ্চম নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পানিনির ত কথাই নাই। পানিনি মুনি ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মহাভারত জানিতেন, এই প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, মহাভারত গ্রন্থ কখনই উক্ত কালাপেক্ষা ন্যূন কালিক নহে।

স্থির হইল যে, মহাভারতকাল কিষ্কিন্দুয়ন ৪০০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে যে, এই কালের কোন্ প্রান্তে (পূর্বপ্রান্তে বা পরপ্রান্তে) আয়ুর্বেদ নামটী বিরাজ করিতেছে। আয়ুর্বেদ এমন যৎনামান্য বস্তু নহে যে, “যন্মাস্তি ভাবতে তন্মাস্তি ভারতে” এরূপ বিখ্যাত গ্রন্থে উহাব উল্লেখ পরিত্যক্ত হইবে। মহাভারতে যদি আয়ুর্বেদের উল্লেখ থাকে ত অবশ্যই উহাকে মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া স্থির করিতে হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত ; অবশিষ্টতথ্য আগরা আগামী মাসেব সঞ্জীবনীতে ব্যক্ত করিব।

ক্রমশঃ ।

* মহাভারতে ও অন্যান্য প্রত্যেক পুরাণে এই নির্ণয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

† ইংরাজ অধ্যাপকগণ একথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কিনা জানি না। বোধ হয় তাঁহারা এত কাল স্বীকার করিতে পারিবেন না। কেন না তাঁহাদের পুঁজী মোট ৬০০০ হাজার বৎসর।

আয়ুর্বেদে উদ্ভিদ্ধিদ্যা ।

প্রথম প্রস্তাব ।

উদ্ভিদ্ধিদ্যা” এই নাম শুনিয়াই পাঠকগণ হয়ত মনে করিয়াছেন আয়ুর্বেদে গর্ভ কেশর পরাগ কেশরের কথা আছে, নানা প্রকার কলম বাঁধার কথা আছে, বীজকোষ ও আবরণকোষ প্রভৃতির বর্ণনা আছে । বস্তুতঃ ইহাতে তাহা নাই, আয়ুর্বেদ ও সকল কথায় যান না, ঐ সকল অকর্মণ্য অসার কথায় তিনি দৃকপাত করেন না, জীবের যাহাতে হিত হয়, আয়ুঃস্থাপন হয়, আয়ুর্বেদ সেই সকল কথাই বলেন, সুতরাং শীর্ষকস্থ “উদ্ভিদ্ধিদ্যা” শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে বিদ্যার দ্বারা বা উদ্ভিদ বিষয়ক যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ এই ভৌতিক-কায়ার ক্রাস বৃদ্ধির বা ক্ষতি পূরণ সংশোধিত করিয়া লইতে পারে, সাম্য বিধানের অধীন করিতে পারে, সেই বিজ্ঞা বা সেই জ্ঞান উপদেশ করাই আমাদের আয়ুর্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য সুতরাং ইনি গর্ভ কেশর পরাগ কেশর নির্ণয় করিবেন না ; তিনি উদ্ভিদের জাতি, শ্রেণী, তাহাদের সহিত মানুষ কায়ার সম্বন্ধ, তাহার ফল, পত্র, পুষ্প ও রসাদির বিভাগ, এই সমস্ত নির্ণয় করিবেন । আজকাল যাহাকে আপনারা উদ্ভিদ্ধিদ্যা বলিয়া জানিতেছেন, এ সে উদ্ভিদ্ধিদ্যা নহে, এ একটি পৃথক্ প্রকারের উদ্ভিদ্ধিদ্যা ।

এই ভৌতিক দেহের একটি পুরাতন নাম পুদ্গল ” ।

“পূর্য্যন্তে গলন্তি চ” কখন পূরিতেছে, কখন বা গলিতেছে ; সুতরাং ইহার নাম “পুদ্গল ।” ইহার বৈদিক নাম “অন্নময় কোষ ।” অন্ন ইহার উপাদান, অন্ন ইহার ক্রাস বৃদ্ধির হেতু, অন্ন ইহার কোষ পরিণাম, তৎ কারণে ইহা “অন্নময়” । অন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ

পৃথিবী ও পার্থিব উদ্ভিদ ; তৎ কারণে ইহার সহিত পৃথিবীর ও পার্থিব উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ইহা রুদ্ধি পক্ষে কার্য্য কারণ ভাব আছে । পার্থিব উদ্ভিদের বা পার্থিব প্রায়োগের উপ-
যোগে ইহার পুরণ হয়, ইহা দেখিয়া “পুৰী” এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে ।
এই পুরে যিনি শয়ান—তিনিই পুরুষ ; নিদ্রুঃখ স্বভাব হইলেও
তিনি পুরীর দোষে দুঃখিতের ন্যায় হন, কাজে কাজেই যাহাতে
আমাদের পুরীর উত্তমতা রক্ষা হয়, আয়ুর্কেদ তাহা দেখিবেন ।
দেহে পার্থিব উদ্ভিদের পরিণাম আছে, পার্থিব উদ্ভিদের প্রভাবেই
ইহার ক্ষয়, উদয়, রক্ষা, স্থিতি, উত্তমতা, ও পুরুষে আরোপিত
দুঃখের বিঘাত ; এই সকল পারস্পর্য্য ক্রম সম্বন্ধ, বা সম্পর্ক পর্য্যট-
লোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা আয়ু-
র্কেদের একটি প্রধানতম অংশ, এবং তাহা আমাদের অবশ্য
জ্ঞাতব্য বস্তু । সেই জন্যই চরক মুনি বলিয়াছেন ।

“মূল-ত্বক্-সার-নির্ধাস-নাল-স্রস-পল্লবঃ ।

ক্ষারঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভক্ষ্য তৈলানি কণ্টকাঃ ।

পত্রাণি গুল্মাঃ কন্দাশচ প্ররোহশ্চৌষ্ঠিদোগণঃ ॥”

উদ্ভিদ সংক্রান্ত মূল, ত্বক্, সার, নির্ধাস, নাল, স্রস, পল্লব, ক্ষার,
ক্ষীর, ফল, পুষ্প, ভক্ষ্য (অক্ষার) তৈল ও কণ্টক, এই গুলিই পুদ্গল
দেহের বিশেষ উপকারী ও অপকারী ; আমাদের আয়ুর্কেদ এই সকল
পদার্থের তথ্য অনুসন্ধান ও তথ্য নির্ণয় করিবেন, পরাগকেশর
গর্ভকেশর কি তাহা বলিবেন না ।

লক্ষণ ।

উদ্ভিদ কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এক কথায়, অথবা “উদ্ভিদস্তরূপ
গুল্মাদ্যাঃ” এই অত্যন্ত কথায় সমাপ্ত হয় না, পর্য্যাপ্তও হয় না ।
ইহার উপর অন্যান্য কথাও বলিতে হয়, তবেই উহার স্বরূপ জানা
যায় ও লক্ষণ নির্ণয় হয় ।

“উদ্ভিদা ভূমিঃ নির্গচ্ছেদুদ্ভিদঃ শ্বাবরস্তমঃ ।

নির্দিষ্টঃ শ্লক্ক-বিটপ-পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ ॥” [বিশ্ব প্রপঞ্চসার ।

পূর্বোক্ত কথার সঙ্গে এ সকল কথা যোগ না করিলে উদ্ভিদের লক্ষণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কথাটির বা বচনটির অক্ষরার্থ এইরূপ,— যাহা ভূমির উদ্ভিদ, যাহা ভূমিতেদ করিয়া নির্গত হয়, যাহা ভৌম-বিকার বীজ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ শ্বাবর বলিয়া গণ্য এই শ্বাবর নামক উদ্ভিদ শ্লক্ক, বিটপ, পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থাৎ ইহা অমুক, উহা অমুক, ইত্যাদি প্রকার নির্ণীত বা শ্রেণীকৃত হইয়া আছে।

শ্লক্ক ঐড়ি । বিটপ=শাখা, প্রশাখা । নির্যাস, রস, ও সার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উন্নয়ন করিবেন ।

শ্লক্ক, বিটপ, পত্র, পুষ্প, ফল, নির্যাস, রস, সার, প্রভৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, এই সূচক কথায় অর্থ অনেক দূর যায়, অনেক দূর বিস্তৃত করা যায়। উদ্ভিদের জাতি, শ্রেণী, নাম, লক্ষণ ইত্যাদি সমুদয় তথ্য বা সমুদয় বিভাগ এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সূচক কথার তাৎপর্য মধ্যে আছে। উহার ছায়াই আয়ুর্বেদের উন্নতি, এই গুলিই আয়ুর্বেদীয় উদ্ভিদ্ধিদ্যায় প্রতিপাদ্য; চরক মুনি এই গুলিকেই ঔষধোপ-যোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । (বচনটি পূর্বে বলা হইয়াছে) ।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রাঘবভট্ট বলেন,—

“উদ্ভিদঃ শ্বাবরা জেয়াস্তৃণ-গুল্মাদি-রূপিণঃ ।”

উদ্ভিদ এক প্রকার শ্বাবর জীব, তাহারা তৃণ ও গুল্ম প্রভৃতি বহুরূপে অবস্থিত ।

রাঘবভট্ট তৃণাদি শ্বাবর পদার্থকে জীব বলিলেন কেন ? জীব বিশেষণে বিশেষিত করিলেন কেন ? তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা আবশ্যিক । হিন্দু পণ্ডিতেরা শ্বাবর দ্বিবিধ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া

থাকেন । এক সজীব স্থাবর, অপর নির্জীব স্থাবর ; এবিভাগ বর্ণন করা অথবা এতদ্রূপ বিভাগের হেতু প্রদর্শন করা আয়ুর্বেদীয় উদ্ভিদ্বিদ্যাব অঙ্গ নহে, উহা প্রাণিবিদ্যারই অঙ্গ, সুতরাং এক্ষণে উক্ত বিভাগের কারণ বর্ণনা কি কোন বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যাউক ।

উদ্ভিদের উৎপত্তি ।

উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত শাস্ত্র কথা আছে । সে কথায় এখনকার নব্য পণ্ডিতগণের মতের একতা নাই । নব্য পণ্ডিতেরা বলেন, উদ্ভিদ বীজ অনাদি, অথবা উহাদের আদিম বীজ ঈশ্বর সৃষ্ট । সেই অনাদি প্রবাহাগত বীজ-পরম্পরা হইতে ক্রম পারম্পর্য্যে সেই সেই উদ্ভিদের জন্ম হইয়া আসিতেছে । ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, ঈশ্বর সৃষ্ট আদিম বীজ হইতে তাহার প্রবাহ সেই প্রবাহ হইতে পুনর্বার বীজ, এতদ্রূপ ক্রম পারম্পর্য্য উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রবাহ চলিতেছে । বীজ সংযোগ হইলনা, অথচ ভূমি হইতে উদ্ভিদজাতি জন্মিল, উদ্ভিদের অভিনব জন্ম হইল এরূপ হয়না । জলাশয়ের জল শুকাইল, অগ্নি তথায় উদ্ভিজ্জ জন্মিল, ইহা দেখিয়া মনে করিবেননা যে, তথায় সেই সেই উদ্ভিদের বীজ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এই বহমান বায়ুই তথায় অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিজ্জ বীজ বপন করিয়াছে, আনিয়া ফেলিয়াছে ইহাই মনে মনে করিবেন । পত্র রেণু, দ্রব ও দ্রবস্থিত রেণু, ফল ও ফলমধ্যগত সূক্ষ্মকণা সমস্তই যখন বীজ তখন আর উক্ত সিদ্ধান্তে সন্দেহ জন্মিবার কোন কারণ নাই । বহমান বায়ু বীজ রেণু মৃত্তিকোপরি নিক্ষিপ্ত না করিলে কোন ক্রমেই তথায় ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জাতির জন্ম হইতে পারিত না তাহার সেই অগুরুপ বীজ তোমরা দেখিতে পাওনা বলিয়াই আপনা আপনি ঘাস উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছে বলিয়াই অবধারণ করিয়া থাক, পরন্তু মাইক্রস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই

সেই সূক্ষ্ম বীজ দৃষ্ট হইয়া থাকে কাজে কাজেই আমবা নির্বীজ সৃষ্টি নাই বলিয়াই অবধারণ করি। ইহার অকাট্য প্রমাণও আছে।

এইত গেল নব্য পণ্ডিতের মত; এক্ষণে পুরাতন ঋষিপণ্ডিতের মত কি? তাহা বলিতেছি, শুনুন।

পুরাতন ঋষিপণ্ডিতেরা বলেন যে, নির্বীজ সৃষ্টি অর্থাৎ অভিনব উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি হয়। বীজ ব্যতীত প্রায়ই জন্মে না সত্য, পরন্তু কখন কখন ভৌম বিকারও উদ্ভিজ্জ সৃষ্টির বীজ হইয়া থাকে। তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ।

“তত্র সিজ্ঞা জলৈভু মিরস্তুরুষবিপাচিতা।”

বায়ুনা বুহমানাতু বীজতং প্রতিপদ্যতে ॥

তথা ব্যক্তানি বীজানি সংসিজ্ঞাশ্চতুসা পুনঃ।

উচ্ছুনতং মৃদুতঞ্চ মূলভাবং প্রযাতিচ ॥

ভল্লাদকুরোপত্তি বকুরাৎপর্ণসম্ভবঃ।

পর্ণাকং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং পুনঃ ॥”

রাঘব ভট্ট।

জলক্রিয় ভূমি স্বাভ্যন্তরস্থ উষ্ণার দ্বারা পচ্যমান হইলে, বিপাক প্রাপ্ত হইলে, সেই বিপাক জনিত বিকার বিশেষে যখন বায়ু কর্তৃক বুহমান অর্থাৎ সংগৃহীত বা সংঘাত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা উদ্ভিজ্জ জন্মের বীজ অর্থাৎ মূল কারণ বা উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। এই অব্যক্ত বীজ হইতে যে প্রবোহ জন্মায়, সেই প্রবোহ হইতে কখন কখন ব্যক্ত বীজের জন্ম হইয়া থাকে। ব্যক্ত বীজ হইতে প্রবোহ জন্মিবার প্রণালী প্রায় ঐ রূপ। ব্যক্ত বীজ সকল সংলিপ্ত অর্থাৎ জলক্রিয় হইলে প্রথমতঃ তাহা উচ্ছুন হয়, (ফুলিয়া উঠ) মৃদু বা কোমলত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্রমে তাহা ভবিষ্যদকুরের মূল স্বরূপে পরিণত হয়। সেই মূল হইতে অকুর, অকুরের পরিণামে পত্রাবয়ব, তাহা হইতে তাহার আঙ্গা বা দেহভাগ অর্থাৎ কাণ্ড (শাখা), এবং কাণ্ড হইলে তাহা হইতে প্রসব (পুষ্প প্রভৃতি) জন্মে এবং ক্রমেই জলক্রিয় ভূমি হইতে উদ্ভিজ্জ জাতির জন্ম হইয়া থাকে।

“স্বেদজঃ শিলামানেভ্যো ভূবহাস্তাঃ প্রজায়তে ।

মুক-মৎকুণ-কীটাদ্যা য়ে চান্যো ক্ষণভঙ্গুরা ॥”

প্রাপঞ্চসাব ও বিশ্বগার নামক গ্রন্থে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জীবের প্রভেদ বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে—

শ্লিদ্যমান আর্থাৎ অস্তরঙ্গার দ্বারা বিপচ্যমান ভূ, বহ্নি ও জল হইতে চুক, মৎকুণ ও বিবিধ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষণ ভঙ্গুর প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে * ।

টীকাকার এই শ্লোকের এইরূপ বিম্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

যাহাই হউক, “বায়ুনা বাহ্যমানাতু” এই পাঠের পরিবর্তে যদি “বায়ুনা বাহ্যমানাতু” পাঠ সত্য হয়, ঋষির অভিপ্রোত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, পুরোক্ত নব্য মতের সহিত পুরাতন আর্ষমতের কিয়ৎ পরিমাণে ঐক্য হইলেও হইতে পারে । ফল, উদ্ভিজ্জ জাতির জন্ম যে প্রকারেই হউক, আয়ুর্বেদ তাহার অনুসন্ধান করিবেন না । কি কারণে তিনি নিষ্ফল অনুসন্ধান করিবেন ? করিয়া তাঁহার কি ফলোদয় হইবে ? যে প্রকারে হয় হইয়াছে, আগবা উহার উৎপত্তি দেখিবনা, উৎপন্ন উদ্ভিজ্জের ব্যবহারোপযোগী বিভাগ বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব যাহা আয়ুর্বেদের নিত্যন্ত উপযোগী যাহার সহিত এই পুদ্গল দেহের ক্ষতি পূরক সম্বন্ধ অকাট্য সূত্রে বাঁধা আছে, আয়ুর্বেদ কেবল তাহাই দেখিবেন ।

ক্রমশঃ ।

* আওণে পোকা হয়, কথাটী বড় সহজ কথা নহে । আগবা জানিবা পরীক্ষার অযোগ্য কথা কতদূর সত্য তাহা আগবা বুঝিতে অক্ষম ।

বায়ু কখন পচা গোবরে বীছার বীজ নিষ্কিপ্ত করেনা, তথাপি তাহাতে বীজ জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত । পচা গোবরে যদি বীছার জন্ম হইতে পারে ত পচা মাটিতে ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম না হইবার পুঙ্কল কারণ কি ?

ঔষধ-সূত্র ।

(পূৰ্ণপ্রকাশিতের পৰ ।)

পূৰ্বে যে হেতু-বিবোধী, ব্যাধি বিরোধী এবং উভয়-বিবোধী ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধ যথেষ্টভাবে অর্থাৎ যে স্থলে যেমন ইচ্ছা হইল, তদনুসারে প্রয়োগ করিলেই চিকিৎসার সফল করিতে পারে না । ইহাতে অনেক বিচার্য ও বিবেচ্য বিষয় আছে । ইহাদের প্রয়োগের স্থলসকলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ । সেই সকল বিষয় ও স্থল প্রাণিধানপূর্বক পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই সূচিকিৎসকের কর্তব্য । আজ কাল আমাদের দেশে যে ভাবে বৈদ্য চিকিৎসা চলিতেছে, অধিকাংশ বৈদ্য যে হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার আভ্যন্তরিক বিবরণ অনুসন্ধান করিলে হতশ্রদ্ধ হইতে হয় । শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে উহার গুঢ় অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য লুপ্ত হওয়ায় ‘ডেলিয়ারা’ চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । আয়ুর্বেদশাস্ত্র পূর্ণ-বিজ্ঞানময় হইয়াও ব্যবহার দোষে প্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে । প্রতিযোগী চিকিৎসকগণ অন্যর ও অপদার্থ বলিয়া উপহাস করিতেছেন, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে ? যতদিন দেশীয় চিকিৎসকগণ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্মাননা না করিতেছেন, প্রকৃত ভাব কার্যে পবিত্র না করিতেছেন, ততদিন উক্ত কলঙ্ক অপনোদনের পন্থা নাই । আয়ুর্বেদীয় পণ্ডিতগণ উক্ত ত্রিবিধ ঔষধ প্রয়োগেব নিম্নলিখিত স্থল সকল নির্দেশ করেন ।

১ম হেতু-বিবোধী ঔষধের প্রয়োগস্থল ।

রোগের হেতু অনেক প্রকার । সংক্ষেপে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা,—বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু ।

আহার, আচরণ, শীত, গ্রীষ্মপ্রভৃতিকে বাহ্য হেতু এবং কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, মল, মূত্র প্রভৃতিকে আভ্যন্তর হেতু বলা যায় । কোনও রোগই হেতু বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না । এবং হেতুসংঘটন হওয়া মাত্রই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-বিশেষ-ব্যতিরেকে কোন রোগই জন্মিতে পারে না । বীচিতরঙ্গন্যায়ে অনেক গুলি ক্রিয়ার অপেক্ষা করে । একটীর পরে আর একটী ক্রিয়া, তৎপরে অপর একটী ক্রিয়া, এইরূপ পরস্পরিত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া জন্মাইয়া পরিণামে যে ক্রিয়া বা ফল প্রকাশ করে, তাহারই নাম রোগ । যে সমস্ত রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও প্রায় ইহার ব্যভিচার নাই । তবে শতপত্রবেধের ন্যায় অতি অল্প সময়েই উৎপন্ন হয়, বলিয়া সর্বদা অনুভূত হয় না । ঐ সমস্ত ক্রিয়ার যথাক্রমিক নাম (১) সঞ্চয়, (২) প্রকোপ, (৩) প্রসর, (৪) স্থানসংশ্রয়, (৫) অভি-
ব্যক্তি, এবং (৬) ভেদ । এই ক্রিয়া গুলিকে শরীরের এক একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে ঐ সকল অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় । * অগাধ-গতি, সূক্ষ্মদর্শী আখ্য ঋষিগণ ঐ সকল লক্ষণ

* যদি ও সঞ্চয় প্রকোপ প্রসরপ্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ নিদানকাণ্ডে আলোচিত হইবে, তথাপি উহাদের সংক্ষিপ্ত অর্থ এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক । কোন কারণ বশত শরীরে বায়ু পিত্ত প্রভৃতির অতিরিক্ত বৃদ্ধির নাম “সঞ্চয়” এবং ঐ সঞ্চিত বায়ু প্রভৃতি যৎকালে উদ্বেল বা প্রবলভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকে “প্রকোপ” বলা যায়, প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতির স্থান ভাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনের নাম “প্রসর” এবং স্থানান্তর আশ্রয় করিলে সেই অবস্থাকে “স্থানসংশ্রয়” বলে, স্থানসংশ্রিত বাত বা পিত্তপ্রভৃতি যৎকালে কোন রোগের ধর্ম প্রকাশ করে, সেই অবস্থাকে “অভিব্যক্তি” এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ করার পরে বায়ু পিত্ত প্রভৃতির স্পষ্ট ধর্ম প্রকাশ করার নাম “ভেদ” বলা যায় ।

অবগতির জন্য যেরূপ গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়রসে প্লাবিত ও ভক্তিভাবে বিগলিত হয় । সেই সকল লক্ষণ, লক্ষণসূত্রে এবং নিদানকাণ্ডে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে । তাঁহাদের চেষ্টা কেবল লক্ষণানুসন্ধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় না, প্রত্যেক অবস্থার চিকিৎসারও বিধান করিয়াছেন । এক এক অবস্থার চিকিৎসাসময়কে এক এক ক্টিচিৎসা-কাল বলে, তদনুসারে প্রথম চিকিৎসাকাল, দ্বিতীয় চিকিৎসাকাল ইত্যাদি সংজ্ঞা বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

পূর্বোক্ত দোষের সঞ্চয় হইতে স্থানসংশয় পর্য্যন্ত এই চারিটি অবস্থায় অর্থাৎ যতদিন রোগ অভিযুক্ত না হয়, পূর্বরূপ অবস্থায় থাকে, কিংবা প্রবলাকার ধারণ না করে, তত দিন হেতুবিরোধী ঔষধই যুক্তিসম্মত । অপিচ যে স্থলে কারণের সহিত রোগের অবিনাশ্য সন্মত অর্থাৎ কারণের ধ্বংস হইলে, রোগেরও বিনাশ হইতে পারে, পক্ষান্তরে কারণের অবস্থিতিবশতঃ রোগের স্থায়িত্ব অনুভূত হয়, সেই স্থলে হেতুবিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । এই কথা গুলি উদাহরণ দ্বারা নিম্নে বিবদ করা যাইতেছে ।

১ম । মনে কর হিমসম্পর্ক, দধিসেবন বা এইরূপ কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে, ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মা প্রাকোপপ্রভৃতি ক্রমোক্ত অবস্থান্তর সকল প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা কোন প্রকার রোগের সূচনা করিয়াছে, এমন স্থলে বমন, লজ্বন বা এইরূপ কফনাশক উপায় দ্বারা শ্লেষ্মানিঃসারণ বা শোষণ করা । এইরূপ প্রতীকার দ্বারা রোগের হেতু বা মূল কারণ বিনষ্ট হয়, সুতরাং রোগের ভবিষ্যদাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না । মহর্ষি সূক্তান্ত এইরূপ প্রতীকারের নিম্নোক্তরূপ প্রমাণসা করেন । তিনি বলেন,—

'সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থান-সংশ্রয়ম্ ।

ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং স ভবেত্তিযক্ ॥

সঞ্চয়েহপহতা দোষা লভন্তে নোত্তরা গতাঃ ।

তাস্মত্তরাস্ম গতিযু ভবন্তি বলবত্ত্বাঃ ॥" শ্রুতস্থান ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়ু, পিত্ত প্রভৃতিব সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদেব স্বরূপ ও লক্ষণ সুন্দর রূপে অবগত আছেন, এবং তৎসাময়িক প্রতিকারে সক্ষম, তিনি সূচিকিৎসক । যৎকালে শরীরে দোষের সঞ্চার হয়, সেই সময়েই উহা সমূলে বিনষ্ট হইলে আর উত্তরোত্তর গতি অর্থাৎ প্রকোপ, প্রসর প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে না । দোষ যত উত্তরোত্তর গতি (Degree) লাভ করে ততই তাহার প্রবলতা হয়, ফলতঃ দোষের সঞ্চার হওয়া মাত্র তাহার প্রতিবিধান করাই উত্তম কল্প । এইরূপ ক্রিয়াম গহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী রোগের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায় ।

২য় । রোগের অপ্রবল অবস্থায় অর্থাৎ যত দিন সামান্যাকার লক্ষণ সকল প্রকাশ করে । বৈদ্যাণাজ্ঞে যে অবস্থাকে বিশিষ্টপূর্বরূপ বলে, সে অবস্থায়ও হেতুবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । কিন্তু এই গত সর্কবাদিসম্মত নহে ।

৩য় । যে স্থলে হেতুর সহিত রোগের অবিনাতাব সম্পর্ক সে স্থলে হেতুবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যিক । মনে কর যেমন ক্রমি বা মলসঞ্চয়বশতঃ উদরে বেদনা জন্মিয়াছে, এমন স্থলে বেদনানিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোন উপকার-লাভেব প্রত্যাশা নাই, যাহাতে বেদনার কারণীভূত ক্রিমি বা মল নিঃসারিত হয়, তদনুরূপ ঔষধের প্রয়োগ করিতে হইবে ।

৪র্থ । কেহ কেহ রোগের হেতুত্যাগকেও হেতুবিরোধী চিকিৎসা বা ঔষধের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন । কেননা নৈদানি

কেরা বলেন “যেসকল আহার ও আচরণাদি বোগের নিদান তৎসমুদয় পবিত্যক্ত না হইলে রোগের উপশম হয় না । কারণ ঐরূপ আহার বিহারাদি দ্বারা দোষের বলবৃদ্ধি হয়, দোষ, বল পাইয়া রোগের বলবৃদ্ধি করে অথবা আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মায় ।

এমন স্থলে ঔষধ দেওয়া না দেওয়া তুল্য । এজন্য অনেক বোগী সুবিজ্ঞ বৈদ্যকর্তৃক চিকিৎসিত হইয়াও এক মাত্র নিদান-সেবনের দোষে আরোগ্যলাভে বঞ্চিত হইয়েন । অতএব আহার, আচরণ প্রভৃতি যে প্রকার নিদানই কেন না হউক প্রথমতঃ তৎসমুদায় পরিত্যাগ করা আরোগ্যার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । অনেক সময়ে কেবল নিদান পরিত্যাগ করিয়াও অনেক ব্যক্তিকে রোগ হইতে মুক্তি পাইতে দেখা যায় । এজন্য আয়ুর্বেদের পণ্ডিতেরা নিদান পরিত্যাগকে এক প্রকার চিকিৎসা বলিয়াছেন । নিদান পরিত্যাগের প্রসিদ্ধ নাম নিদানপরিবর্জন । আয়ুর্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসার প্রাবল্লে নিদান পরিবর্জন রূপ চিকিৎসার উপদেশ করিয়া থাকেন ।” পবিত্র এই মতটি হেতুবিপরীত বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না ।

ব্যাদি-বিপরীত ঔষধপ্রয়োগের স্থল ।

রোগের অভিব্যক্ত বা প্রস্ফুট অবস্থায় ব্যাদি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । এমন অনেক ঔষধ আছে, রোগ যে কারণেই কেন উপস্থিত না হউক, সেই সমস্ত ঔষধ প্রাবল্লে বজ্রশক্তিবশতঃ কারণনির্বিশেষে রোগপ্রাতীকারে সক্ষম অর্থাৎ রোগ, বায়ু পিত্ত বা যে কোন হেতুতেই কেন উৎপন্ন না হউক তৎপ্রতি ঔষধের লক্ষ্য থাকে না, কেবল রোগ প্রশমনের প্রতিই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায় । ইংরাজী ভাষা ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন ঔষধকে স্পেসিফিক মেডিসিন (Specific Medicine) বলা যাইতে পারে । এরূপ ঔষধের সংখ্যা অতি অল্প ।

পরন্তু এ প্রকার ঔষধপ্রয়োগ করিতে চিকিৎসকেব চিন্তা এবং জ্ঞানের লাঘব বলিয়া লোকহিতৈষী ঋষিগণ উহাদের অনুসন্ধানে সমধিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং অনেক পৰিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন । বর্তমান ঔষুবোপীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাদের ফার্মাকোপিয়া গ্রন্থে যেমন ক্রিয়ানুসারে অল্টোবেটিব পারগেটিভ্ (Alterative, Purgativo) ইত্যাদি শ্রেণীভেদে ঔষধ সমূহের বিভাগ করিয়া থাকেন, আয়ুর্বেদীয় পণ্ডিতগণও তেমন দাহনাশক, শীতনাশক ইত্যাদি ভেদে ঔষধের শ্রেণীভাগ করিয়াছেন । পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ ঔষধগুলি উদ্ধৃত হইল । কেহ কেহ বলেন, যখন হেতুবিপরীত ঔষধ কার্য্যকারী না হয় অর্থাৎ ব্যর্থ হয়, সেই সময়েই ব্যাধিবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় ।

১ । বমন-নিবারক—জামের পল্লব, আত্রপল্লব, ছোলদুনেবু, টককুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেনারমূল, গৌরাষ্ট্র-মুত্তিকা, তৈখ ।

২ । ভৃষ্ণা-নাশক—শুঠ, ছুরালভা, মুখা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ, পাথরকুচি, ধনে, পলতা ।

৩ । হিক্কা-নাশক—শাঠী, পুষ্করমূল, কুলের আঠা, কণ্টকানী, ব্যাকুড়, বন্দা, হরীতকী, পিপুল, ছুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী ।

৪ । মল-বোধক—প্রায়ক্ষু, অনন্তমূল, জামের কেশী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাহক্রাস্তা, ধাইফুল, বামন-হাটী, পদ্মকেশব ।

৫ । মূত্র-রোধক—জাম, আত্র, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞদুস্কুর, অশ্বথ, ভেলা, অল্ললোটক, খদির ।

৬ । মূত্র-কারক—বন্দা, গোম্মুর, বক, ছড়ছড়ে, পাথরচুন, কুশের মূল, শরের মূল, কাশের মূল, গুড়ুচীর মূল, ইকড়ের মূল ।

- ৭। কাসনাশক—কিস্মিস্, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, ছুবা-
লভা, কাকডাশৃঙ্গী, বন্টকারী, শ্বেত পুর্নর্বা,
বক্ত পুর্নর্বা, ভুঁই আমলা ।
- ৮। শ্বাসনাশক—শচী, পুষ্কবমূল, থৈকুল, এলাচী, হিঙ্গ, অগুরুচন্দন,
ভুলসী, ভুঁই আমলা, জীবন্তী, চোবপুষ্পী ।
- ৯। শোথনাশক—পাকুল, গনিয়ারি, বিষ্ণু, শ্যোনা, গাস্তাবী,
কন্টকারী, ব্যাকুড়, শালপানি, চাকুলে,
গোক্ষুব ।
- ১০। শ্ববনাশক—অনন্তমূল, শর্করা, আকন্দ, গঞ্জিষ্ঠা, কিস্মিস্,
পীলু, ফলসাকল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ।
- ১১। দাহনাশক—থৈ, চন্দন, গাস্তাবীফল, যষ্টিমধু, শর্করা, নীলোৎ-
পল, বেনাবমূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, পাথবকুচি ।
- ১২। শীতনাশক—তগবপাছুকা, অগুরুচন্দন, ধনিয়া, শুঁঠ, যমানী,
বচ, কন্টকারী, গনিয়ারী, শ্যোনা, পিপুল ।
- ১৩। উদর্কনাশক—গাব, পিয়াল, বদর, খদির, বিটখদির, ছাতিম,
শাল, অর্জুন, পীতশাল, গুইয়াবাবলা ।
- ১৪। অঙ্গবেদনানাশক—শালপানি, চাকুলে, ব্যাকুড়, কন্টকারী,
এবড়, কাকলা, চন্দন, বেনাঙ্গমূল, এলাচী
যষ্টিমধু ।
- ১৫। শূলনাশক—পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ,
জোয়ান, ফৌকান্দী জোয়ান, কৃষ্ণজীরা,
শালখীশাক ।
- ১৬। তৃপ্তিনাশক—শুঁঠ, চিতা, চৈ, বিড়ঙ্গ, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, বচ,
মুত্, পিপুল, পটোল ।

১৬। তৃপ্তি এক প্রকার শ্লেষ্মজ রোগ, এই রোগে আহার না করিলে ও
রোগী আহার করার স্থায় বোধ করে

- ১৭। অর্শোনাশক—কুটজ, বেল, চিত্তা, শুঠ, আতিষ, হরীতকী, ছুনালতা, দারুহরিদ্রা, বচ, চৈ ।
- ১৮। কৃষ্ঠনাশক—খদিব, হরীতকী, আগলবী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিম, সোঁদাল, করবীব, বিড়ঙ্গ, জাতিপল্লব ।
- ১৯। কণ্ঠনাশক—চন্দন, জটাগাম্বী, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম, কুটজ, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, মুতা ।
- ২০। ক্রিমিনাশক—সজনা, মরিচ, শালিকী, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিমিন্দা, কড়ভী, গোক্ষুব, রূষকণী, ইন্দুঁবকানী ।
- ২১। বিষনাশক—হরিদ্রা, মাজুষ্ঠা, হাপরগালি, ছোটএলাচী, শ্যামলতা, চন্দন, নির্মলৌকল, শিবীষ, কুড়, নিমিন্দা ।
- ২২। জীবনোষ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু ।
- ২৩। বৃংহণীষ—ক্ষৌবলতা, দুষ্কিকারক্ষ, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বন-কার্পাসী, ভুইকুমড়া, বিস্তাবক ।
- ২৪। লেখনীয়—মুত, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতিষ, কটুকী, চিত্তা, করঞ্জ, শ্বেতবচ ।

২২। জীবনীয়প্রভৃতি বৈদ্যকগংজা । এই সকল গংজা স্বল্ল্যাক্ষরে প্রথিত ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা অবিকল গ্রহণ করিলাম । ভবিষ্যতে ও প্রয়োজনানুসারে আমরা ঐ সমস্ত গংজাই ব্যবহার করিব । আমরা গংজাগুলির যে স্থলে বেক্রপ অর্থ বলিব । তাহা পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন । যে সমস্ত দ্রব্য বা ক্রিয়ায় জীবনীশক্তি বা আয়ুষাক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের আয়ুকূলা সম্পাদন করে, তাহাদের নাম জীবনীয় ।

২৩। যে সমস্ত দ্রব্য বা ক্রিয়ায় শরীরের রসবক্তাদি বৃদ্ধি করিয়া পুষ্টি সাধন করে, তাহাদের নাম বৃংহণীষ ।

২৪। ঘর্ষণ দ্বারা ঈষৎ চর্ম উত্তোলন বা বিদারণের নাম লেখন । এই ক্রিয়ার উপযোগী দ্রব্যকে লেখনীয় বলে ।

- ২৫ । ভেদক—তেয়ড়ী, আকন্দ, (শ্বেত ও রক্ত) এবণ্ড, ভেলা, দস্তী, চিতা, কবজ, শংখপুষ্পী, কটকী স্বর্ণক্ষৌরী ।
- ২৬ । সন্ধানীয়—যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, আকন্দ, চাকুগে, ববাহকাস্তা, মোচবন, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, কটফল ।
- ২৭ । দীপনীয়—পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঠ, ভেলাব অঁঠি, থৈকুড, মবিচ, যমানী, হিঙ্গ ।
- ২৮ । বলকাবক—গোরক্ষকর্কটী, শুকশিশ্বী, শতমূলী, ভুঁইকুমড়া, অশ্বগন্ধা, শালপানি, কটকী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, মাযাণী ।
- ২৯ । বর্ণকারক—চন্দন, বকম, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারমূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শর্কবা, মঞ্জিষ্ঠা, ভুঁইকুমড়া ।
- ৩০ । কণ্ঠ্য—অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, কিম্বিসু, ভুঁইকুমড়া, কটফল, খুলকুড়ী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ।
- ৩১ । হৃদ্য—আত্র, আমড়া, ডছ, করমর্দ, সেকুল, অম্লবেতস, বড়বদন, ছোট বদন, দাড়িম, ছোলঙ্গনেবু ।
- ৩২ । স্তন্যজনক—বেনারমূল, শালিধান্য, যেটেধান, তালমাখনা, উল্লুরমূল, কুশোরমূল, কেশোর মূল, ইকড়ের মূল, গুলঞ্চ, গন্ধতৃণ ।
- ৩৩ । স্তন্যশোধক—আকন্দ, শুঠ, দেবদারু, মুতা, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিবতা, কটকী, অনন্তমূল ।

২৬ । যে সমস্ত দ্রব্য বা ক্রিয়ায় ভগ্নস্থান সন্ধান অর্থাৎ সংযোজন করিতে পারে, তাহাদেব নাম সন্ধানীয় ।

২৭ । যে সমস্ত দ্রব্য বা ক্রিয়ায় অগ্নির দীপ্তি সম্পাদন অর্থাৎ পবিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাদিগকে দীপনীয় বলে ।

- ৩৪ । শুক্রজনক—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মেদ, বন্দা, জটামারী, কাকডাশুঙ্গী ।
- ৩৫ । শুক্রশোধক—বুড়, এলবালুকা, কটফল, সমুদ্রফেনা, কদম্বের আঁঠা, ইক্ষু, কোকিলক্ষ, ক্ষুরক, বকপুষ্প বেনাবমূল ।
- ৩৬ । স্নেহোপগ—কিস্মিস্, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদ, ভুঁইকুমড়া, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবক, জীবন্তী, শালপাণি ।
- ৩৭ । স্নেদোপগ—মজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেতপুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, যব, তিল, কুলথকলাই, মাষকলাই, বদর ।
- ৩৮ । বমনোপগ—মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, হিজল, তেলাকুচ, ঘণ্টাববা, আকন্দ, প্রত্যক পুষ্পী (আপাঙ্গ) ।
- ৩৯ । বিরেচনোপগ—কিস্মিস্, গাম্ভারী, ফল্গা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় বদর, ছোট বদর, শেয়াকুল, পীলু ।
- ৪০ । আস্থাপনোপগ—তেয়ড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শলুফা, মদনফল, যষ্টিমধু ।

ক্রমশঃ ।

৩৬ । ঘৃত তৈলশ্লেষ্মা পদার্থ শরীরেব স্নিগ্ধতা কারক । যে সকল দ্রব্য ঘৃতাদির সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে উহাদেব স্নেহণী-শক্তির সহায়তা বা বৃদ্ধি করে তাহাদের নাম স্নেহোপগাস্নেদোপগ বমনোপগ বিরেচনোপগ এবং আস্থাপনোপগ শব্দেব ও এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে । কাথ পুষ্টি দ্বারা পিচ্কাবি দেওয়াব নাম আস্থাপন ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

আমরা সূত্রত-সংহিতা ১ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহা ডল্ল-নাচার্য্য প্রণীত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ মহাশয় কর্তৃক প্রাপ্তি খণ্ড ছয় ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইতেছে । সংস্কৃতভাগ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে ।

সূত্রত সংহিতা কি ? তাহা ভারতবাসীর অতি অল্পলোকেরই জানিবার অবশিষ্ট আছে । সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, শাস্ত্রচিকিৎসক সম্প্রদায়ের গুরু ধনন্তরি সূত্রতগ্রন্থ যেরূপ সমুদায় শিষ্যকে শল্যতন্ত্রপ্রধান আয়ুর্কর্মেদের উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু ভারতের ভাগ্য লক্ষ্যেব অন্তর্ধানের সহিত উক্ত গ্রন্থ গুলিরও অধিকাংশ অন্তর্হিত হইয়াছে । কেবল সূত্রত নামধের এই সূত্রাচীন সংহিতা খানিই তদানীন্তন শাস্ত্রচিকিৎসা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে । সূত্রবাং সূত্রত যে ভারত বাসীর অতিশয় আদরের এবং গৌরবের সামগ্রী, তৎপক্ষে সংশয় নাই ।

বহুকাল পূর্বে স্বর্গীয় মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় মূল সূত্রত সংহিতার সর্ব প্রথম মুদ্রাঙ্কন করেন । আজি আমরা যে সূত্রত গ্রন্থের এক্ষণে সূত্রাপ্যতা অনুভব করিতেছি, পণ্ডিত মধুসূদনই ইহার নিদান । পণ্ডিত মধুসূদন ইহার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে দৈর্ঘ্য যত্ন এবং সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি প্রথম বারেই অধিকাংশ বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল । সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকগুলির যেরূপ পাঠের বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহাতে কোন একখানি গ্রন্থ বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রাঙ্কন করা যে কিরূপ দুকহ, তাহা সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনকারী

ব্যক্তিগতই অবগত আছেন। এই অসাধারণ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের জন্য আমরা সেই স্বর্গীয় মূর্তির উদ্দেশে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রমাণ করিতেছি। অতঃপর শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বসাক এবং শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কন করেন এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অপিচ কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ও মূল, ডল্লনার্য্যপ্রণীত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত স্মৃতিসংহিতা মুদ্রাঙ্কন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধহয়, দৈবদুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অধুনা কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং কবিরাজ চন্দ্রকুমার দাস মহাশয় পুনরায় ডল্লনার্য্যপ্রণীত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত স্মৃতিসংহিতা মুদ্রাঙ্কন করিতে প্রবর্তমান হইয়াছেন। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করি, ইহাদের এই সাধু উদ্যম সুসম্পন্ন হউক। ইহাদের এই উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের জন্য ইহাদিগকে ধন্যবাদ।

অতঃপর প্রাপ্ত পুস্তকখানির সম্বন্ধে আগাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে।

আমরা আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনীর অবতরণিকায়ই বলিয়াছি যে, “ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রের শ্রীযুক্তি সম্পাদনার্থে বহুলগ্রন্থের প্রচার যেমন আবশ্যক, কতকগুলি অকর্মণ্য ও অসার পুস্তক দ্বারা সরস্বতী-ভাণ্ডার কলঙ্কিত না হয় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও বিজ্ঞমণ্ডলীর তেমন আবশ্যক, এই সাধু অভিপ্রায়েই অনেক কাল হইতে সমালোচন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সমালোচন গ্রন্থের পরীক্ষাগিস্বরূপ, গুণ দোষের দর্পণস্বরূপ, শাস্ত্রের শাণ্ডিল্যস্বরূপ, এবং জ্ঞানের রসায়ন স্বরূপ। ইহা দ্বারা পণ্ডিতগণ উৎসাহিত হইয়া নূতন চিন্তায় নিমগ্ন, নূতন আবিষ্কারে উদ্বীপিত এবং নূতনসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া, মূর্খদেরও অজ্ঞানভিমির তিরোহিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট সাধন

পক্ষে সমালোচনও একটি উৎকৃষ্ট উপায়।" গতএবছাত্র কিম্বা পুত্রের বাৎসল্য, বন্ধু কিম্বা আত্মীয়ের অনুরোধ এবং পিতা কিম্বা গুরুর আদেশে সঞ্জীবনী ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিবেনা। আপন জ্ঞানে সদসৎ যাহা বুঝিবে, সাধারণকে তাহা বুঝাইবে। সুতরাং কর্তব্যের অনুরোধে সমালোচনা প্রসঙ্গে অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইলেও কেহ দুঃখিত না হইবেন, ইহাই সঞ্জীবনীর মানুজয় প্রার্থনা।

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত মহোদয়ের মুদ্রাস্কনের পর এপর্যন্ত স্মৃতি-সংহিতার যে কয়েক খানি মূল মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একখানিরও মূলের কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই। আমাদের আশা ছিল, বর্তমান মুদ্রাস্কনে, তদ্বিষয়ের উন্নতি দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান মুদ্রণে ২১৪টি বর্ণ বিপর্যয় দ্বারা অশুদ্ধির ভাগ বৃদ্ধি করা ভিন্ন অন্য কিছুই উন্নতি হয় নাই। ডল্লন প্রণীত বিশুদ্ধটীকা নিরতিশয় দুর্লভ; সুতরাং টীকায় যে সমুদায় ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে, তজ্জন্য কোন প্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বরং কাগজ উৎকৃষ্ট, মুদ্রাস্কণও পরিস্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশকগণ ধন্যবাদার্থ।

বঙ্গানুবাদ অতিঅল্পই হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা স্থানে স্থানে প্রাঞ্জল এবং সুললিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

“তদল্লমপি নোপেক্ষ্যং শাস্ত্রে দৃষ্টং কথঞ্চন।

কিং বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন চুর্ভগং ॥”

“অর্থাৎ শাস্ত্রের অল্পপরিমাণ দোষও উপেক্ষার যোগ্য নহে, যেহেতু, অতিসুন্দর দেহও একটীমাত্র শ্বিত্রে অপবিত্র ও অপ্রীতিকর হয়। স্থানে স্থানে অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও এই ২১৪ পৃষ্ঠায়ই অনুবাদক মধ্যে মধ্যে স্তম্ভহৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা উহার ২১১ মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

“উক্ত আহারজব্যও ঔষধমধ্যে পরিগণিত। ঐ আহারীয়জব্য

স্থাবন ও জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার ; স্থাবর আবার চতুর্বিধ, যথা, বনস্পতি, রক্ষ, বীরুধ ও ওষধি ।

বনস্পতি—যাহাদের কেবল ফল হয়, পুষ্প হয় না, তাহাদিকে বনস্পতি কহে । যেমন বট, অশ্বথ, উদ্ভুম্বর, (যজ্ঞডুম্বর) প্রভৃতি ।

রক্ষ—যাহাদের পুষ্প হইতে ফল হয় তাহাদিগকে রক্ষ কহে । যেমন আম্র, জম্বু, (জাম) তিস্তিড়ী (তেঁতুল) ইত্যাদি ।

বিরুধ—যাহাবা একত্রীকৃত তৃণগুচ্ছের ন্যায় শাখা পল্লব বিশিষ্ট এবং খর্ব্বাকার, তাহাদিগকে বিরুধ বা গুল্ম বলে ।

ওষধি—ফল পরিপক্ব হওয়া পর্য্যন্ত যাহারা বাচিয়া থাকে, তাহাদিগকে ওষধি কহে । যথা কদলী, ধান্য ইত্যাদি ।

জঙ্গম প্রাণীও উৎপত্তি ভেদে চতুর্বিধ, যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ । তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী মৎস্য প্রভৃতি অণ্ডজ, এবং বস্ত্র পচিলে, তাহা হইতে যে কীট জন্মে তাহাদিগকে শ্বেদজ কহে । যথা মশা, মাছি, চর্ম্ম, কীট ইত্যাদি । আর যে সমস্ত প্রাণী মৃত্তিকা মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ প্রাণী বলে । যথা মহীলতা, (কেঁচুয়া), ইন্দ্রগোপকীট প্রভৃতি ।

এতদ্বারা কি বুঝা যাইতেছে ? স্তম্ভাচার্য্য বট অশ্বথ হইতে মশা, মাছি, চর্ম্মকীট প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমুদায়ই আহারীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া উহার বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে । কিন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব এবং আচার্য্যের অভিপ্রায়ের একান্ত বিরুদ্ধ । এই স্থানের চক্রপাণির ব্যাখ্যা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে । চক্রপাণি বলেন,

“ইদানীমুক্তসংশোধনাদৌ স্থাববাদিভেদেন ঔষধদ্রব্যং নির্দেষ্টুং আহারমৈব প্রধান্যখ্যাপনার্থমাহ প্রাণিনামিত্যাदि ।”

স্তম্ভাচার্য্য এই যে, পূর্বে যে সংশোধন ও সংশয়নের কথা বলা

হইয়াছে, উক্ত সংশোধনাদি ঔষধ স্বাবরাতিভেদে নির্দেশ করিয়া আহা-
রের প্রাধান্যথাপনের অভিপ্রায়েই প্রাণিনামিত্যাदि পাঠের অব-
তারণা হইয়াছে ।

সুতরাং চক্রপাণির ব্যাখ্যা ও আচার্য্যের অভিধায় প্রভৃতি অভি-
নিবেশ পূর্বক দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বট, অশ্বথ, মশা,
মাছি, প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ আহাবীয় জব্য বলিয়া নির্দেশ করা
আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে ।

অনুবাদক আর এক স্থলে বলিয়াছেন, “সেই স্থাবর এবং জঙ্গম
অগ্নি ও সৌম গুণ অধিক আছে বলিয়া, স্থাবর আগ্নেয় ও জঙ্গম
সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে” ।

জগতেব যাবতীয় স্থাবর পদার্থ আগ্নেয়, এবং যাবতীয় জঙ্গম
পদার্থ সৌম্য বলিয়া, নির্দেশ করা আয়ুর্বেদপাঠীর কথা দূরে
থাকুক, একজন সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে । বস্তুতঃ
পদার্থসমূহকে সৌমগুণের আধিক্য বশতঃ সৌম্য এবং অগ্নিগুণের
আধিক্য বশতঃ আগ্নেয় বলিয়া নির্দেশ করা এস্থলে আচার্য্যের
অভিপ্রের্ত । স্থাবর আগ্নেয়, জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত করা
সংহিতার তাৎপর্য্য নহে ।

এতদ্ভিন্ন মূলের অর্থ প্রতিপাদনের জন্য অনুবাদক স্থানে স্থানে
যে টিপ্পনী করিয়াছেন, অনেক স্থলে তাহাতে প্রকৃত তাৎপর্য্যের
ব্যাঘাত করা হইয়াছে । অপিচ অনুবাদক গণের কোন কোন
টিপ্পনী অন্যদীয় পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াও তাহার নামাদি
উল্লেখ না করা সুলভ্য হয় নাই ।

যাহাইউক, এই অত্যন্ত অংশেই অনুবাদকগণ যেক্রপ ভ্রম প্রমা-
দের পবিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র সংহিতার পরিণাম
চিন্তা করিয়া আমরা একান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি । আয়ুর্বেদের
বঙ্গানুবাদের দোষে এদেশের যে কিরূপ অনিষ্টাপাত হইতেছে,

তাহা আমবা চতুর্থ খণ্ডে আয়ুর্বেদানুবাদ শীর্ষক প্রস্তাবে দেখাই-
রাছি । যে গ্রন্থের সহিত জীবন যবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার অনুবাদ
কার্য্যে অনুবাদকগণ বাল্যক্রীড়া না করিয়া যাগাতে বিশুদ্ধরূপে
অনুবাদ কার্য্য সমাহিত হয়, তাহাই সম্পাদন করিয়া সুখী করিবেন ।

অতঃপর আমবা সমালোচ্য গ্রন্থের উৎসর্গপত্র সম্বন্ধে ২।১ টি
কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব । অনুবাদক মহাশয়েরা
আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনীর তত্ত্বাবধারক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন
সেন কবিরাজ মহাশয়েব নামে উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থখানিকে
সম্মানিত করিয়াছেন, তৎপক্ষে সংশয় নাই । কিন্তু উৎসর্গ
পত্রে তাঁহার সাহায্যে গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইতেছে এরূপ রূথা
পরিচয় প্রদান করা ন্যায় বহির্ভূত হইয়াছে । আমরা বিশেষ
জানি, ইহার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার কোন সাহায্য বা সহানুভূতি
নাই । তাদৃশ সুপণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য থাকিলে যে, গ্রন্থের এরূপ
পরিণাম সংঘটন হইত না, ইহা পরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই বিশ্বাস
করিতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই । আমরা আশা করি,
অনুবাদক দ্বয় এজন্য ত্রুটি প্রকার করিবেন ।

পত্রপ্রেরকের প্রতি ।

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন কবিরাজ রামকৃষ্ণ বাগছির লেন ১৭ নং নীচী
বিডনষ্ট্রীটঃ— তাঁহার মতে কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন এবং
চন্দ্রকুমার কবিভূষণ যে সুশ্রুত সংহিতা অনুবাদ করিয়াছেন তাহা
ভ্রমপূর্ণ এবং তাহাদের সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অধিকার তাহাতে
তাহাদের দ্বারা উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব । তর্করত্ন মহাশয়
যে কএকটি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সারাংশ পত্র পাইবার
পূর্বেই আমরা সমালোচন স্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছি । পত্রখানিদীর্ঘঃ
এবং কটাক্ষপূর্ণ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না ।

কালতত্ত্ব ।

(পূৰ্ণপ্রকাশিতেন পৰ)

ইতি পূৰ্বে ব্যক্ত কৰা হইয়াছে কাল স্বতন্ত্র কোন দ্রব্য পদার্থ নহে, সূৰ্য্যের গতি-ক্রিয়াবিশেষই “কাল”, অতএব জাগতিক জৈবিক অজৈবিক পদার্থ নিচয়ের আশ্চর্য্য কালিক পরিবর্তন এবং সাময়িক শীতোষ্ণাদির অনুভব যে সূৰ্য্যের গমনানুযায়ী কিরণ-সম্পাতের অধীন তাহা বলা বাহুল্য । লোক-লোচন প্রভাকর খগোল-দ্বয়ের যে গোলে বিচরণ পূৰ্ণক ধরণী-পৃষ্ঠে যে নিয়মে কর প্রদান করেন, ধরাশ্রিত জীবাজীব নিচরও তদনুসারে শীতোষ্ণাদি ফল ভোগ করিবে ।

অপিচ এই বাহ্য সম্ভাপেব অনুগ্রহে মনুষ্য প্রভৃতি জীবাজীবের অভ্যন্তর হইতে পৃথিবীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত অপনীত তাপাংশ সকল পরিপূৰ্ণ হইয়া যথানিয়মে ভৌতিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আগিতেছে ।

এই হেতু প্রাকৃতিক গতির অন্তস্তলানুগন্ধিঃসু আয়ুর্কৈদিক গণ দিনকবের কিরণ-পাতানুসারে সময়ে সময়ে মানবীয় প্রকৃতির এবং পার্থিব স্থাবর অস্থাবর বস্তুর ও ভৌতিক জল, বায়ু প্রভৃতির গুণ-গত এবং আকৃতি-গত অবস্থার পরিবর্তন দর্শনপূৰ্ণক পূৰ্ণোক্ত সম্বৎসর নামা খণ্ড কালের অয়ন, ঋতু, ঋতুগন্ধি প্রভৃতি ভেদ-কল্পনা কবিয়াছেন । এবং তদ্বারা মনুষ্য সমাজের শারীরিক মানসিক সুখস্বচ্ছন্দে আহাৰ, বিহার, এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের ঔষধ দ্রব্য আহরণ, ঔষধ-প্রস্তুতি-বিধান, সাময়িক প্রয়োগ এবং দোষাদির দৈনিক অংশাংশ বিভাগ দ্বারা সাময়িক অবস্থা বিজ্ঞান প্রভৃতির অতি উপাদেয় উপদেশ সকল যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্বিস্তারিত প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।*

* আমরা প্রথম হইতেই প্রকাশ করিতেছি যে আয়ুর্কৈদিক সম্প্রদায়ের

পূর্ক প্রান্তাবে বলা হইয়াছে ত্রিংশৎ দিবসে একমাস, বা এক রাশি, দ্বাদশ মাসে বা দ্বাদশ রাশিতে একবৎসর। এই বৎসরগণনা বৈশাখ মাস বা মেষ রাশি হইতে আরম্ভ হইয়া চৈত্রমাস বা মীন রাশি পর্য্যন্ত গণনায় বৎসর সম্পূর্ণ হয়। এই বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের নামকরণ নক্ষত্রের নামানুসারে হইয়াছে অতিপ্রাচীন কালে চন্দ্রের গতি লক্ষ করিয়াই খাগোলিক গণনা সম্পন্ন হইত, যে সময়ে বৈশাখ-নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমা হইবে ঐ সময়কে বৈশাখ মাস নাম দেওয়া হইয়াছে। এই মাস গণনা, কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ দিবস পূর্ণ করিতে হইবে। এই কারণে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যাহা প্রচলিত, সকলই তিথি-ঘটিত, তৎপর-বর্ত্তি-কালের জ্যোতির্বিদগণ বিজ্ঞান-নেত্র দ্বারা যে সময়ে সূর্য্যের গতি আরিফারের সঙ্গে সঙ্গে নাক্ষত্রিক রাশি চক্রের উপরিভাগে বিপরীত ক্রমে সূর্য্যকে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন ঐ সময় হইতে সৌরমাস এবং মেমাদি দ্বাদশ রাশি আবিস্কৃত হইয়াছে। সূর্য্যের এই দ্বাদশ রাশি ভ্রমণকাল সৌর সংবৎসর।

পৃথিবীর মধ্যস্থান কেন্দ্র করিয়া পূর্ক পশ্চিমে যে একটি রেখা কাশিত হইয়াছে ঐ রেখার নাম বিষুব রেখা বা নিরক্ষরুত *। এই বিষুব রেখা এবং ক্রান্তি বলয়ের (সূর্য্যের ভ্রমণ পথের) পরস্পর সমান্তরে উপর্যুপরি স্থিতির নাম ক্রান্তিপাত † প্রোক্ত মিলন বৎসরে

কালতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব ঐশ্বর্যজনীয় কিন্তু বলা বাহুল্য যে গণিত জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সূর্য্যের গতি বোধেও অনভিজ্ঞ, পুরাত্ন অস্বদেশীয় আয়ুর্বেদসম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই গণিত জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ অতএব প্রথমতঃ আমরা সূর্য্যের গতির বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া অপবশ্যক বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ বাহুল্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

* "সম রাত্রিদিবেকালে বিষুবদ্বিবৃকতৎ।" অমর সিংহ।

† "বিষুবক্রান্তি বলয়য়োঃ সূর্য্যম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃস্যৎ।।"

ডাঃ ভূগোলধ্যায়।

১। যে সময় সূর্য্য উত্তর গোলে মিতুনের শেষ (আষাঢ় মাসের শেষ) উত্তর অয়নান্ত রত্নের উপরে ভ্রমণ করিবে ঐ সময় পৃথ্বী মণ্ডলের উত্তর গোলে ২২ অংশে (কলিকাতা প্রভৃতিস্থানে) স্থিত “ক” নামক কোন ব্যক্তি তাহার বামে এবং দক্ষিণে মানচিত্রের ৬৬ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পাইবে, সুতরাং তাহার ক্ষিতিজ রত্ন ঐ ৬৬ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত, এই মানচিত্রে যে সূর্য্যের “অহোরাত্ররত্ন” অঙ্কিত আছে তৎ প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে “অহোরাত্ররত্নের” “দিদি” স্থান ক্ষিতিজ দ্বারা কর্তন হইয়াছে, পূর্বে বলিয়াছি ক্ষিতিজের অধস্থ “রাত্রি” সুতরাং এই রত্নের “দিদি” দ্বারা কর্তিত অধোভাগ অতিকম, উর্দ্ধ দিবার ভাগ প্রায় ত্রিভাগ। বস্তুতঃ আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির পূর্ক্ণ সপ্তাহে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানিক লোকদিগের সম্বন্ধে দিবা মান নিতান্ত বেশী।

২। এই প্রকার দক্ষিণ গোলে সূর্য্য যখন ধনুরাশির অন্তে (মাঘমাসে) মকরের প্রথম দক্ষিণায়ণের চরম সীমায় ভ্রমণ করিবে, সেই দিন সূর্য্যের “অহোরাত্ররত্নের” উ, উ স্থান ক্ষিতিজ দ্বারা কর্তিত হইয়াছে দেখিবে, সুতরাং পৌষমাসের শেষ মাঘ মাসের প্রথম কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দিবামান অতিঅল্প, রাত্রি মান বৃহৎ হইবে।

৩। প্রথমোক্ত স্থানে ভ্রমণশীল সূর্য্যকে যদি ভূকক্ষার ৬৬ অক্ষাংশস্থিত “শ” নামক দণ্ডায়মান ব্যক্তি দর্শন করে, তবে তাহার ক্ষিতিজ দ্বারা সূর্য্যের অহোরাত্ররত্নের “ম” বিন্দু স্পর্শ মাত্র করিলে, সুতরাং তাহার পক্ষে ঐ সময় রাত্রি দর্শন বিরল, কেবল অস্তোমুখ সন্ধ্যার ন্যায় ঘোরমাত্র দেখিয়াই পুনরায় সূর্য্য দেখিতে পাইবে।

রত্নে ক্ষিতিজাদধঃস্থে রাত্রির্যতঃ স্যাৎদিনমান মুর্কঃ । সদা সমবৎস্থানিশো
মিরঞ্চে” ইত্যাদি। গোলাধ্যায়।

এই প্রকার দক্ষিণ গোলস্থ ৬৬ অক্ষাংশ বাসির পক্ষে “চ” বিন্দু স্পর্শ করায় কেবল উদয়োন্মুখ দর্শন করিয়াই অন্ধকার দেখিবে ।

বিশ্বনিয়ন্ত। করুণাময়ের অব্যাহত নিয়তির অধীন অনন্ত জগতে প্রতি অনুপলে কত যে অনন্ত ফল ফলিতেছে তাহা পরিমিত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়, কেবল বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদগণ এবং আয়ুর্কৈদিকগণ অপরিমিতজ্ঞান প্রবাহের সহায়তায় অতি সামান্যাকারে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি উপস্থিত করিয়া প্রবল তমসাস্থন্ন গিরিগহ্বরে দীপালোক প্রদানের ন্যায় বিজ্ঞান-বিমুখ ব্যক্তিগণের হৃদয়ক্ষেত্রে অন্ধকার দূরীকরণ-মানসে অজ্ঞান-তিমির-পহারক প্রদীপ শিখার ন্যায় যে কিছু লিপি নিবন্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই মহাত্মগণের উপদেশাত্মক বচন-পরম্পরা অবলম্বন পূর্বক সাধারণের অববোধার্থ জ্যোতিষিক মৌরিক ব্যাপার যৎ-কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম । বাস্তবিক বিশ্বগোলকের ক্রিয়ার সহিত মৌরিক ক্রিয়ার অবিভাবাবে আয়ুর্কিজ্ঞানের সমন্বয় বা প্রাণি-নিচয়ের শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়া নির্বাহের অভিন্নতা প্রদর্শন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য রহিল ।

পৃথিবীর দৃঢ়াকর্ষণে কর্ষিত জল এবং বায়ু কদম্বকুশুমের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে ওতপ্লোতভাবে সংস্কৃত । সুতরাং জাগতিক স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সকলও প্রোক্তবিধ জল ও বায়ুর অভ্যন্তরে ডুবিয়া থাকার ন্যায় রহিয়াছে । এই আবহমান ভূবায়ু ভূমণ্ডলের উর্দ্ধে দ্বাদশ কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এই বায়ুর আশ্রয়েই বারিসমূহ শূন্য মার্গ অবলম্বনে গগনচারী অভ্র নামে অভিহিত, এই বায়ুই মেঘের নেতা ও জীবগণের জীবন * ।

(ক্রমশঃ)

* “আকৃষ্টশক্তিচ্চ মহী তথা যৎ যন্তঃ গুরুধাতিমুখং স্বশক্তিঃ । আকৃষ্যতে”০০০ । ভাস্করাচার্য্যবৌদ্ধবিচার ।

“ভূমের্বহিষ্কাদশযোজনানি ভূ-বায়ুরতাসুদবিদ্যাদাধ্যৎ” । ভূগোলাধ্যায় ।

আয়ুর্বেদ কত কালের ?

(পূর্বানুবৃত্তির শেষ)

পূর্বের অনুসন্ধানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আয়ুর্বেদীয় বস্তু-নিচয় বেদ-সমকালিক অথবা অনাদি। কিন্তু, সেই সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়া কোন সময়ে “আয়ুর্বেদ” আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত বা প্রচারিত হইয়াছিল—তাহার কোন ইয়ত্তাবধারণ বা স্থনির্ণয় করা হয় নাই। সুতরাং আজ আমরা এতৎ প্রবন্ধে ঐ অংশেরই অনুসন্ধান করিব।

তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও মূল-বেদ-মধ্যে “আয়ুর্বেদ” এই সংজ্ঞাশব্দ দেখিতে পাইবেন না। কাষে কাষেই স্বীকার করিতে হইবে, আয়ুর্বেদ শব্দটি বেদ শব্দের পরভবিক এবং আয়ুর্বেদ নামক সংহিতা গ্রন্থ, মূল বেদ প্রচারের অনেক কাল পরে আত্মলাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ উপবেদ এই নাম শুনিলেও উপবেদকে মূল বেদের পরজন্মা বলিয়া প্রতীতি হয়।

বেদে আয়ুর্বেদ শব্দ নাই বলিয়া আয়ুর্বেদ মূলবেদের পরবর্তী, এই সিদ্ধান্তে বোধ হয় কাহারও কোন প্রতিবাদ কি কোন আপত্তি উপস্থিত হইবে না। আপত্তি না হউক, কিন্তু প্রশ্ন হইবে। “আয়ুর্বেদ তবে কত কালের ? মূল বেদের কত কাল পরে আয়ুর্বেদ সংহিতার জন্ম ? ” এইরূপ প্রশ্ন হইলে তাহার প্রত্যুত্তরার্থ যাহা বলিতে হইবে তাহা এইঃ—

বেদমধ্যে আয়ুর্বেদ শব্দ না থাকুক, কিঞ্চিৎনূন ৪০০০ বৎসরের মহাভারত গ্রন্থে, উক্ত শব্দের ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। যথা—

“আয়ুর্বেদবিদস্তস্মাৎ ত্রিধাতুং মাং প্রচক্ষতে।” শান্তি, মোক্ষ, ১৩৭।

“কচিতে কুশলা বৈদ্যা অষ্টাঙ্গৈচ চিকিৎসিতে।” সভা ৩৫।

“দে বর্গিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাঙ্গৈরশ্চিকিৎসিতম্।” শান্তি, মোক্ষ, ১৩৭।

এই কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা জানা গেল যে, আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র,—আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র, অন্যান ৪০০০ হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়াছে । মহাভারতপ্রাণেতা ব্যাস, তৎশিষ্য অক্ষপাদ গোতম ; ইনিও স্বকৃত ন্যায়শূত্রে আয়ুর্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন । যথাঃ—

“মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যং তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যং ।” ২, ১, ৬৭ ।

এই প্রমাণটি আয়ুর্বেদের মহাভারত অপেক্ষা বহু পুরাতনতা পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এমন কি আমরা এই সকল প্রমাণের দ্বারা আয়ুর্বেদের যতদূর ইচ্ছা ততদূর পুরাতনত্ব সমর্থন করিতে পারি । (ইহা বুঝিতে হইবে যে মহাভারতাদি গ্রন্থের পূর্ব হইতে বেদ সংহিতা পর্য্যন্তই আমরা যাইব) ।

তিষ্ঠতু । এ-ত গেল মূল আয়ুর্বেদের কথা । প্রজাপতিকৃত মূল আয়ুর্বেদ এখন নাই ; সুতরাং তৎপ্রাসঙ্গে অধিক বাক্য ব্যয় করা এক্ষণে রুথা । এখন আমরা যাহাকে আয়ুর্বেদ বলিয়া অভিহিত করি, তাহাও অল্প পুরাতন নহে । প্রজাপতিকৃত মূল আয়ুর্বেদ প্রচারের পর, ধন্বন্তরি-শিষ্য সুশ্রুত প্রভৃতি কতিপয় ঋষি এবং পুনর্ধন্ব শিষ্য অগ্নিবিশ প্রভৃতি অন্য ছয় জন ঋষি পৃথক পৃথক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া ছিলেন । সেই সকল সংহিতাই আমরা পাইতেছি এবং সেইগুলিকেই আমরা এখন আয়ুর্বেদ নামে অভিহিত করিতেছি । এই সকল সংহিতার মধ্যে সুশ্রুত সংহিতা ও চরক-সংহিতা এক্ষণে সুপ্রাপ্য ও সর্বোৎকৃষ্ট ; সুতরাং এই দুই সংহিতার উৎপত্তিকাল আমাদের অনুসন্ধানের । এই দুই সংহিতার কাল নির্ণীত হইলে, তৎসঙ্গে অন্যান্য সংহিতারও কাল নির্ণীত হইবে ।

সুশ্রুত ও চরক এই দুই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে । সুশ্রুত অথবা চরক অথবা রচিত হইয়াছিল, ইহার গীমাংসা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য । সুশ্রুত গ্রন্থ খানি কতকালের ? এ প্রশ্নের

সদুত্তর দান করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহাই হউক, এই সকল তথ্য লাভের জন্য আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিব ; তাহাতে যতদূর সম্ভব লাভের সুসম্ভাবনা, এ প্রবন্ধে ততদূর সম্ভাই লক্ষ্য হইবে।

প্রথম স্মৃতিত সংহিতা।—স্মৃতিত সংহিতা সম্ভবতঃ মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন। স্মৃতিতগুরু ধন্বন্তরি যখন মহাভারতবক্তা ঋষির নিকট সম্মুখিত পুরাতন বলিয়া গণ্য, তখন আর ধন্বন্তরি-প্রোক্ত ও স্মৃতিত-গুরু উপদেশ মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন নহে ; ইহা বলা যায়না। মহাভারত বক্তা ঋষি ধন্বন্তরিকে ও তৎশিষ্য ঋতকে পুরাতন বলিয়াই জ্ঞাত ছিলেন। যথা—

“ ধন্বন্তরিস্তুতো দেবো বপুশ্চানুদতিষ্ঠত ।

শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ।” আদি, ১৫ অঃ।

“ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।

ক্ষত্রিয়ঃ সৌহৃদ্যং তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ ॥

তস্য পুত্রো মহাত্মানো ব্রহ্মবংশবিবর্জনাঃ ।

তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্র কৰ্ত্তার এব চ ॥

মধুচ্ছন্দশ্চ ভগবান্ দেবরাতশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

অক্ষীণশ্চ শকুন্তশ্চ বজ্রঃ কালপথস্তথা ॥

* * * *

শ্রামায়নোহথ গার্গশ্চ জাবলিঃ স্মৃতিতস্তথা ।

বিশ্বামিত্রাশ্রজাঃ শর্কো মুনয়োব্রহ্মবাদিনঃ ॥” অল্পশাসন ৪ অঃ।

মহাভারত বক্তা ঋষি ধন্বন্তরিকে সমুদ্ভবমুহূর্ত্ত সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধন্বন্তরি তাঁহার মতে বহু পুরাতন এবং স্মৃতিত মুনিকে বিশ্বামিত্রাশ্রজ বলিয়া বর্ণন করায় তন্মতে ইনি দ্বাপর যুগের লোক, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেন না উক্ত মহাভারতের অন্য এক স্থানে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র

মুনি ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে জীবিত ছিলেন । * অতএব, মূল সূত্রসংহিতা যে মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন, তৎপক্ষে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই ।

আমরা মহাভারত পর্যালোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিলাম ; সে সিদ্ধান্ত পাণিনিরূপত গ্রন্থাবলির দ্বারা অবিচাল্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে পারি । ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন, ব্যাকরণসূত্রপ্রণেতা পাণিনি মুনি বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের পূর্ববর্তী । ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গোল্ডষ্ট্রুকের অনুমান করেন, পাণিনি মুনি খৃঃ অন্যান ৯০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন । তন্মতানুসারে ইনি অন্যান ২৮০০০ আটাইশ শত বৎসরের পুরাতন হইতেছেন ; কিন্তু আমরা ইহাকে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পুরাতন বলিতে ইচ্ছুক । যাহাই হউক, ত্রিশহস্র বৎসরের পুরাতন পাণিনীয় গ্রন্থে আমরা যখন “সূত্রতেন প্রোক্তং সৌত্রতম্” এতদ্রূপ নির্বচন দেখিতে পাই, তখন আর আমরা মহাভারতোক্ত সূত্রত মুনিকে আয়ুর্বেদবেত্তা সূত্রতমুনিকে এক বা অভিন্ন না বলিয়া থাকিতে পারি না এবং উহাকে মহাভারত গ্রন্থ অপেক্ষা বহু প্রাচীন মনে না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না । যদিও “সূত্রতেন প্রোক্তং সৌত্রতম্” এই নির্বচন সাক্ষাৎ পাণিনিরূপত নহে, যদিও উহা কাত্যায়নরূপত বার্ত্তিকোক্তি ; তথাপি, উক্ত নির্বচন আমাদের উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে অন্তরায়িত নহে । কেননা, পাণিনি ও কাত্যায়ন, ইহঁরা এক সময়ের লোক । প্রথমে ইহঁরা উভয়েই উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন, একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; পরে শিব আরাধনা ফলে পাণিনি কিছু অধিক ক্ষমতালালী হইয়াছিলেন ; এইমাত্র প্রভেদ ।†

* “ত্রেতাযাপরয়োঃ সর্কো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।” অনুশাসনপর্ক ।

† বৃহৎ কথ্য ও কথ্য সরিৎসাগরে দেখ ।

স্বতরাং পাণিনির কথা আর কাব্যায়নোক্তি কালপ্রমাণকতা পক্ষে সমান বা তুল্যবল, ইহা বিনাসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উল্লিখিত প্রমাণসমূহের দ্বারা এই মাত্র জানা গেল যে, ধন্বন্তরি-শিষ্য ও বিশ্বামিত্র তনয় শ্রুত মুনি এবং তৎকৃত আয়ুর্কেদসংহিতা মহাভারতাদি গ্রন্থের পূর্ববর্তী এবং বেদপ্রচারের পরবর্তী। ত্রেতার পরে এবং দ্বাপরের প্রারম্ভে উক্ত সংহিতার প্রচার ছিল; স্বতরাং তাহা অন্যান্য দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন। “দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন” ইহা শুনিয়া মনে করিবেন না যে, আমরা বর্তমান শ্রুত-সংহিতাকে দশ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া সম্ভ্রামণ করিতে পারিব। কোন ক্রমেই আমরা বর্তমান শ্রুত-সংহিতাকে অত অধিক পুরাতন বলিতে সক্ষম নহি। তাহার কারণ এই যে, বর্তমান শ্রুত-সংহিতায় ব্যাসপ্রণীত শৌনকের ও শাক্যসিংহশিষ্য সুভূতির মত সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুই অপেক্ষাকৃত নবীন মতের প্রবেশ থাকায় বর্তমান শ্রুতকে আমরা ব্যাসের কিম্বা মহাভারতের পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করিতে পারি না। ব্যাসকৃত মহাভারত ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন দ্বারা রাজা জনমেজয়ের রাজ্য কালে প্রচারিত হইয়াছিল। অনন্তর সৌতি নামক জনৈক পুরাণ বক্তা মুনি নৈমিষারণ্যবাসী শৌনক মুনিকে উহা শ্রবণ করান। এই শৌনক মুনি ব্যাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ও অশ্বশিষ্য। যথা—

ব্যাস

।

শ্রুত

।

কবন্ধ

।

বেদদর্শ

।

পথ্য

।

শৌনক

এই শৌনক মুনি ব্যাসের অথর্ষবেদীয় শ্রমস্ত নামক শিষ্যের শিষ্য এবং ইনিও একজন প্রধান শাখাভেদপ্রবর্তক। ইনি এক জন প্রধান আথর্ষগণিক ও অথর্ষসম্প্রদায়ের গুরু অথবা শাখাপ্রবর্তক স্বয়ি। ইনিই বর্তমান “শৌনকী সংহিতা” নামক অথর্ষ সংহিতার প্রণেতা। আজ যি আমরা মুদ্রিত অথর্ষবেদ দেখিতেছি তাহা সেই শৌনকীসংহিতা। বর্তমান শ্রুত গ্রন্থে যখন শৌনকীসংহিতার মত ও তৎ প্রণেতা শৌনকের উল্লেখ আছে, তখন আর আমরা কোন ক্রমেই বর্তমান শ্রুত-সংহিতাকে মহাত্মারত্নের পূর্ববর্তী বলিয়া অবধারণ করিতে পারি না। যথা—

“শির ইত্যাহ শৌনকঃ।” শ্রুত, শারীরস্থান।

অর্থ এই যে, শৌনক বলেন, গর্ভজীবের সর্বাঙ্গে মস্তক গঠিত হয়। এই মতের অনুরূপ কথা আমরা মুদ্রিত ও হস্তলিখিত শৌনকী সংহিতাতেও দেখিতে পাই। যথা—

“প্রজাপতিষ্টাবদ্বাৎ প্রথমমস্তকং বীৰ্য্যায় কং।

তৎ ভে বদাম্যায়ুযে বর্চস ওজসে চ বলায় চাস্তৃতজ্জাভিরক্ষতু।

১৯, ৪৫, ৪৬, ৫ অনুবাক।

প্রজাপতি তোমাকে বন্ধন করিয়া ছিলেন, বীৰ্য্যের নিমিত্ত ও তেজঃ প্রভৃতির নিমিত্ত প্রথমে তোমার ক অর্থাৎ মস্তক স্তূত অর্থাৎ গঠিত করিয়া ছিলেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, বর্তমান শ্রুত গ্রন্থে যে শৌনকের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শৌনকও সে মত, শৌনকী-সংহিতা নামক অথর্ষসংহিতা প্রণেতা ও ব্যাসশিষ্য শৌনকের সহিত সমান কি না। শ্রুত সংগৃহীত শৌনক মত যখন শৌনকী শাখা সংহিতায় দৃষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে,

বর্তমান স্মৃতি শৌনকীসংহিতা হইতেই শৌনক মত সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। সুতরাং বর্তমান স্মৃতি বাসপশিয়া শৌনক অপেক্ষা অপ্রাচীন ; মহাভারত অপেক্ষা নবীন। বর্তমান স্মৃতির মহাভারত অপেক্ষা ও পাণিনি অপেক্ষা নবতা দেখাইবার আরও একটি প্রাবল্য চিহ্ন আছে। কি ? তাহা বলিতেছি।

বর্তমান স্মৃতি বলিতেছেন,—

মধ্যশরীর গতি স্ফুটিগোতমঃ। স্মৃতি, শরীরস্থান।

গোতম স্ফুতি বলেন, গর্ভশিশুর অগ্রে মধ্যশরীর হয়। বর্তমান স্মৃতি স্ফুতি গোতমের মত সংগৃহীত হওয়ায় ইহার বহুপ্রাচীনতা পক্ষ নষ্ট হইয়া গিয়া শাক্যসিংহের পরবর্তিতাই সম্ভব হইতেছে। বৌদ্ধ বৌদ্ধদিগকে গোতম বিশেষণ দিয়া উল্লেখ করেন, ইহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রই জানেন। অমরসিংহ যেমন বৌদ্ধ, তেমনি, বর্তমান স্মৃতির লেখকও বৌদ্ধ ; তাই তিনি আচার্য্য স্ফুতিকে গোতম বিশেষণে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য স্ফুতি কে ? যদি কাহার জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি বজ্রচ্ছেদিকা, মহাবস্তু অবদানং ও স্খাবতী ব্যুৎপত্তি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ দেখিবেন ; তাহাতে দেখিতে পাইবেন ; আচার্য্য স্ফুতি অথবা গোতম স্ফুতি ভগবান্ শাক্যসিংহের সাক্ষাৎ শিষ্য। গোতম স্ফুতি মহান্ জ্ঞানী ছিলেন। শরীরতত্ত্বে যে ইহার সমধিক নৈপুণ্য ছিল, তৎসম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই স্ফুতিই স্বশাস্ত্রে ও পরশাস্ত্রে অবিখ্যাত ; এতদ্বিন্ন অন্য কোন স্ফুতির অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই না। অতএব, বর্তমান স্মৃতি যখন শাক্য শিষ্যের মত সংগৃহীত থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আর ইহাকে মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন বলা দূরে থাকুক, পাণিনি অপেক্ষাও পুরাতন বলিতে পারি না।

তবে এ স্মৃতি কত কালের ? এরূপ প্রশ্ন হইলে তাহার সঙ্কট

প্রদানার্থ নিম্নলিখিত আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পাবে । বর্তমান
সুশ্রুতের প্রারম্ভপট্রেই লিখিত আছে যে,—

‘যথোবাচ ভগবান্ ধনন্তরিঃ সুশ্রুতায় ।’

ভগবান্ ধনন্তরিঃ সুশ্রুতকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেই
রূপই ব্যাখ্যা করিব ।

এই প্রতিজ্ঞা বাক্য বা প্রারম্ভ বাক্য শুনিবা মাত্র কাহার না
প্রতীতি হইবে যে, ধনন্তরি ও সুশ্রুতমুনি এই দুই ব্যক্তি ছাড়া
বর্তমান সুশ্রুত গ্রন্থের সহিত অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট আছে,
অবশ্যই কোন সুরোগ্য ব্যক্তি লুপ্তকল্প মূল সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার
করিয়া ছিলেন । যদিও টীকাকার চক্রপাণিদত্ত উক্ত বাক্যের
অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তথাপি তাহা বাক্য চাফুর্য্য ভিন্ন
অন্য কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের পরিপোষক নহে । সেই
জন্যই অন্য টীকাকার ডল্লনাচার্য্য বলিয়াছেন, “প্রতিসংস্কারকর্তা
নাগার্জুন এব ।” নাগার্জুন নামক আচার্য্যই মূল সুশ্রুত সংহিতার
প্রতি সংস্কার করিয়া ছিলেন ।

নাগার্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার্তা, এ কথা অনস্বব নহে ।
কেন না, লৌহার্ণব প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে নাগার্জুনের গ্রন্থ-কর্তৃত্ব
বোধক অনেক প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায় । বুদ্ধ শাঙ্গধর নামক
একখানি জীর্ণগ্রন্থে “ক্ষুদ্র বজ্রক নামানং গ্রাহ নাগার্জুনোমুনিঃ ।”
নাগার্জুনকে মুনি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । সর্গদর্শন
সংগ্রহ নামক সায়নীয় গ্রন্থেও নাগার্জুন মুনি পাণ্ডিত্যসূচক
মতের উল্লেখ আছে । অতএব, আচার্য্য নাগার্জুন যখন একজন
খ্যাত-নামা পণ্ডিত, তখন আর তাঁহাকে সুশ্রুত প্রতিসংস্কার্তা বলিতে
কোন রূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না ।

রাজতরঙ্গিনী নামক ইতিহাসের লেখক বঙ্কন পণ্ডিত বলেন,
নাগার্জুন এক জন কাশ্মীরদেশীয় মণ্ডলেশ্বর রাজা ; তিনি বৌদ্ধ-

ধর্মো দীক্ষিত হইয়া বনাম্রয়ী মুনি হইয়াছিলেন। ভগবান্ শাক্য-
নিংহের মৃত্যুর ১৫০ বৎসর পরে এবং মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের কিঞ্চিৎ
পূর্বে ইনি জীবিত ছিলেন এবং অনেক শত গ্রন্থ প্রচার করিয়া
ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীর নাগার্জুন আর স্মৃতিতপ্রতিসংস্কর্তা
নাগার্জুন যদি এক বা অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমরা
বলিতে পারি, বর্তমান স্মৃতিত সংহিতা, যাহা আমরা আজি কালি
অধ্যয়ন করিতেছি, মুদ্রাক্ষিত করিয়া প্রচার করিতেছি, তাহা
অন্য ২৪০০ চব্বিশ শত বৎসরের পুরাতন বস্তু এবং সেই জন্যই
বর্তমান স্মৃতিতে শৌনকের মত ও শ্বতুতির মত এবং অন্যান্য
অপ্রাচীন কথা উল্লিখিত বা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য
এক নাগার্জুন ছিলেন; তিনিও বৌদ্ধ, ও গ্রন্থকার। পরন্তু এ
নাগার্জুন অপেক্ষাকৃত নব্য।

সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত।

আয়ুর্বেদীয় বস্তু ও তদ্বিময়ক জ্ঞান জনাদি অথবা বেদসং-
কালিক। তাহার সংহিতাকারে প্রকাশ বেদসংহিতার পরে ও
মহাভারতাদি ইতিহাসগ্রন্থের পূর্বে। সেই প্রাচীন প্রাজাপত্য
সংহিতার মার সঙ্কলন স্বরূপ সৌত্রত সংহিতাখানিও মহাভারতাদি
অপেক্ষা পুরাতন। ইহার আনুমানিক কাল অন্যান্য ১০০০০ বৎসর।
সে পুরাতন স্মৃতিত সংহিতা প্রতিসংস্কৃত হইয়া নাগার্জুন মুনি কর্তৃক
চন্দ্রগুপ্তের কিছু পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বতরাং বর্তমান
স্মৃতিতসংহিতা অনধিক ২৪০০ চব্বিশ শত বৎসরের পুরাতন।

দ্বিতীয় চরকসংহিতা।—স্মৃতিতসংহিতার ন্যায় চরকসংহিতাও
বহু পুরাতন এবং তাহাও দৃঢ়বল নামক জটনক পঞ্জাবী পণ্ডিত
কর্তৃক এক প্রকার পুনঃ প্রতিসংস্কৃত। চরকের প্রাচীনত্ব বোধক

নিষ্পষ্ট প্রমাণ কাশীখণ্ড মধ্য পাওয়া যায়, * পাণিনীয় গ্রন্থে ও যথেষ্ট পাওয়া যায় । নিম্নে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইল, দেখুন, চরকসংহিতা কি পরিমাণে পুরাতন ।

চরক গুরু অগিবেশ, তদীয় গুরু পুনর্কশ্ব । মহাভারতবক্তা ঋষি পুনর্কশ্বকে (ইহারই অন্য নাম আত্রেয়) অথবা আত্রেয় ঋষিকে জানিতেন এবং আত্রেয়কৃত চিকিৎসা গ্রন্থও জ্ঞাত ছিলেন । যথা, —

“ দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্ ।” শান্তি, ১৬৭ ।

গার্গ্যমুনি দেবচরিত ও ঋষিচরিত বর্ণন করিয়াছেন, আত্রেয় মুনি চিকিৎসা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন ।

ভারত গ্রন্থে আরও এক কথা আছে । চিকিৎসক কাশ্যপ মুনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিতকে চিকিৎসা করিবার জন্য গমন করিলেন ।

এই কাশ্যপ যে আত্রেয় মুনির পরিচিত তাহা চরকসংহিতাতেই প্রত্যক্ষ আছে । অতএব, আত্রেয়ভাষিত, কাশ্যপকথিত, ও হারীতপ্রোক্ত চিকিৎসা শাস্ত্র সকল মহাভারত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পুরাতন অথবা মহাভারতের তুল্যকালিক বলিয়া অনুমিত হইতেছে ।

আত্রেয়ভাষিত শাস্ত্রই যে অগিবেশ মুনির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া ছিল, এবং তিনি যে আত্রেয় মুনির শিষ্য, ইহা বোধ হয় চরকপাণ্ডী মাত্রই অবগত আছেন । সুতরাং আত্রেয় ও অগিবেশ এক সময়ের ব্যক্তি, ইহা বলা বাহুল্য । পক্ষান্তরে ইহাও সম্ভাব্য হইতেছে যে, অগিবেশ-পরিচিত কাশ্যপ মুনি যখন রাজ্য পরীক্ষিতের চিকিৎসার্থ উদ্যোগী হইয়া ছিলেন, অবশ্যই তখন তাঁহার পরম্পর তুল্য কালিক । অর্থাৎ আত্রেয়, অগিবেশ ও কাশ্যপ, ইহারা সকলেই

* যথো দৃষ্টান্তনির্ভর চরকচরিতীহ ন ।

নাসত্যাবপি নো শক্তাবজ্জ চিন্তাজরে কিল ॥

কাশীখণ্ড ।

“রাজা পরীক্ষিতের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ইহাদের শাস্ত্রও তৎকালে প্রচারিত ছিল।

আত্রেয়-শাস্ত্র প্রথমতঃ অগ্নিবেশ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া প্রচার গামী হইয়াছিল। অনন্তর তাহা অর্থাৎ সেই অগ্নিবেশকৃত সংহিতা চরকমুনি কর্তৃক প্রতिसংস্কৃত হইয়া চরকসংহিতা নামে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই শেষ প্রতिसংস্কর্তা পুরুষ “অগ্নিবেশকৃতে তন্মৈ চরকপ্রতिसংস্কৃতে।” এই উল্লেখ করিয়াছেন।

আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক, ইহারা যে সমধিক প্রাচীন, অথবা ভারতবর্ষা খ্রিস্ট তুল্যকালিক, তাহা আপনারা ত্রিসহস্র বৎসরের পুরাতন পাণিনিয় শাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারিবেন। অনধিক ত্রিসহস্র বৎসরের পুরাতন পাণিনিমুনি স্বকৃত গণপাঠে আত্রেয় ও অগ্নিবেশ দুই মহামুনির উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রাচীনত্ব পক্ষ সমর্থন করিয়া দিয়াছেন। যথা—

“গর্গাদিগণ—গর্গ, বৎস, সংক্ৰতি, অজ, ব্যাজ্ঞপাত্, বিদভ্, প্রাচীন, যোগ, অগস্তি, পুলস্তি, রেভ, অগ্নিবেশ, শত্ৰু—” ইত্যাদি *।

“কঠচরকাস্মুক”—এই সূত্রের দ্বারা পাণিনি মুনি চরক শব্দের উত্তরে প্রোক্তার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া তাহার লোপ করিতে বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার উদাহরণে বলিয়াছেন, “চরকেন প্রোক্ত মধীতে চরকঃ।” অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি চরক প্রোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, সে চরক। অতএব, যে চরক ও যে অগ্নিবেশ পাণিনির নিকট পুরাতন, সে চরক ও সে অগ্নিবেশ যে মহাভারতের তুল্য কালিক, তৎপক্ষে কোন ও প্রকার সংশয় উত্থাপন করিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই। অপিচ, আত্রেয় শাস্ত্র, অগ্নিবেশের শাস্ত্র ও চরকের সংহিতা, এ সমস্তই যে কলিপ্রারম্ভে প্রস্তুত হইয়াছিল

* “কঠচরকাস্মুক।” সূত্র পাঠ দেখ।

“গর্গাদিভ্যোযজ্” এই সূত্রের কত্যাশ্রয় বার্তিক ও পাতঞ্জল ভাষ্য দেখ।

তাহা আমরা চরকোক্ত আয়ুঃপ্রমাণবিনির্গয় দেখিয়া অনুমান করিতে পারি। “বর্ষশতং ঋত্বায়ুযঃ প্রমাণ মস্মিন্‌কালে *।” এই উক্তির দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে সংহিতা যজ্ঞা ঋষি কলিকালের লোক। সুতরাং কলি প্রথমে কি কলি সন্ধিতে এই চরকশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

উল্লিখিত প্রমাণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্রেয়, কাশ্যপ ও অগ্নিবিশাদির শাস্ত্র, রাজা পরীক্ষিতের রাজ্যকালে প্রচারিত ছিল এবং চরকের শাস্ত্র তাহার অত্যন্তকাল পরে প্রস্তুত হইয়াছিল। চক্রপাণিদত্ত লিখিয়াছেন,—

“পাতঞ্জল কুত্বেভাযো—”

পাতঞ্জল মুনি চরক প্রতিসংস্কৃত শাস্ত্রের উপর একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কেবল চক্রপাণি লেখেন নাই, ভোজ রাজও একথা লিখিয়াছেন এবং মধ্য কোমুদী ব্যাকরণকারও উক্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং চরক সংহিতা পুস্তক, পাণিনি ও ভাষ্যকার পাতঞ্জলি মুনির পূর্বে বর্তমান ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভাষ্যকার পাতঞ্জলি পাণিনিমুনির অত্যন্তকাল পরেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অন্যান্য বহু প্রমাণের দ্বারা অনুগিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, প্রকৃত চরক সংহিতা গ্রন্থ, পাণিনির শাস্ত্রের পূর্বে মহাভারত শাস্ত্রের সময়ে জন্মলাভ করিয়াছিল। এখন আমরা সে চরক পাইতেছি না। কেন না, সে চরক আবার দৃঢ়বলনামক জনৈক পাণ্ডারী পণ্ডিতের দ্বারা পুনঃপ্রতি সংস্কৃত হইয়া সমধিক রূপান্তরিত হইয়াছে। যথা,—

“ইদমন্যুনা শব্দার্থঃ—দোষ বিবর্জিতম্।

অথওার্গঃ দৃঢ় বলোজাতঃ পঞ্চনদে পুরে ॥

কৃৎস্না বহুভাস্ত্রজ্যোতিঃ বিশেষাচ্চ বলোচ্চয়ম্ ।

সমুদর্শোষধাধায়ায়ান্ সিদ্ধিকঠৈরপূরয়ৎ ॥”

এই দুটো বল কে ? কোন্ সময়ের লোকে ? ইহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারিনাই । দুটো বলের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের অনেক সংশয় আছে * । তথাপি আমরা দুটো বল সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাতিমংস্কৃত চরকের অধ্যায় পুরক দুটো বল ১৩০০ বৎসরের পূর্বে কোন এক অনিশ্চিত কালে জীবিত ছিলেন । কেন ? তাহা বিবেচনা করুন ।

১৩০০ বৎসরের পূর্বে সাহসাক্ক নামক জনৈক বিখ্যাত রাজার সভ্য হরিচন্দ্র বর্তমান চরক সংহিতার উপর একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এই সংবাদ আমরা তদ্বংশীয় মহেশ্বর নামক বিশ্বপ্রকাশ গ্রন্থকারের নিকট শুনিতে পাই । চরক ব্যাখ্যাতা হরিচন্দ্রের পৌত্র মহেশ্বর স্বকৃত বিশ্বকোষের প্রারম্ভে হাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ।

“শ্রীনা হসাক্ক নৃপতে রণবেদ্যৈবদ্য বিদ্যাভরঙ্গ পদ মধ্যমগেব বিজ্ঞঃ ।

যশস্র চার-চরিতে হরিচন্দ্র নামা স্বব্যাখ্যয়া চরক তজ্জ গলগণকায় ॥”

* * * *

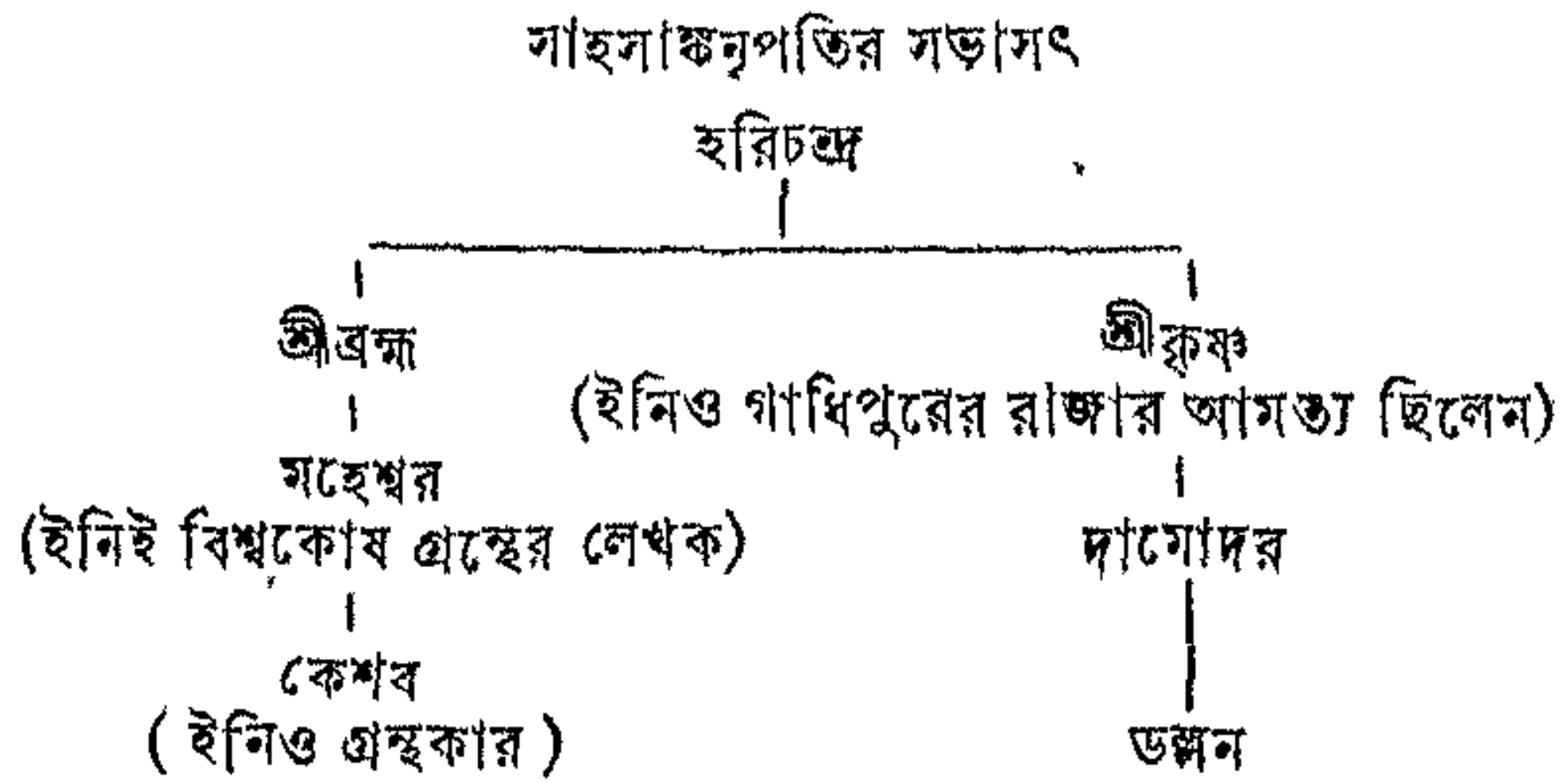
“তস্যাতবৎ শুল্কদারবাচা বাচস্পতি শ্রীললনা বিলাসী ।

সধৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ + শ্রীডল্লনঃ সৎকুম্বদাকরেন্দুঃ ॥” ইত্যাদি ।

বিশ্ব কোষের সমুদায় প্রারম্ভবাক্যের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিলে চরকটীকাকার হরিচন্দ্র বৈদ্যের বংশাবলি নিম্নলিখিত প্রকারে নির্ণীত হয় ।

* কেহ কেহ এই দুটো বল শব্দকে ব্যক্তি বোধক বলিয়া স্বীকার করেন না । তাহারা বলেন, দুটো বল শব্দ চরক ব্যক্তির বিশেষণ । আমাদের বিবেচনায় এ কথা অসঙ্গত ও শাস্ত্রীয়তার বহির্ভূত ।

+ “মহাগণঃ” “ডল্লনঃ” “উল্লগঃ” এই তিনপ্রকার পাঠ দৃষ্ট হয় ।



সিদ্ধান্ত সংগ্রহ ।

রাজা পরীক্ষিতের রাজ্যকালে অথবা রাজা জনমেজয়ের রাজ্যকালে চরকশাস্ত্র সংকলিত হইয়াছিল । সুতরাং চরকশাস্ত্রের বয়স ৪০০০ বৎসরের অধিক নহে । এখন আমরা যে চরক পাই-তেছি, পড়িতেছি, পড়াইতেছি, মুদ্রাঙ্কিত ও অনুবাদিত করিতেছি, সে চরক দৃঢ়বল নামক জনৈক পঞ্চনদ দেশীয় পণ্ডিতের প্রচারিত । এ চরকের জীবন ১৫০০ বৎসরের পূর্বে ও পতঞ্জলি মুনির পরে, কোন এক আন্তরালিক কালে লুপ্তায়িত আছে ।

আলোচ্য চরকশাস্ত্রের বিমানস্থানে একটি বচন আছে । যথা—

সংবৎসরশতে পূর্ণে যান্তি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্ ।

দেহিনা মাযুষঃ কালে যত্র যচ্চান মিয়্যতে ॥

এই বচন দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মানব সৃষ্টির সমকালিক ; সুতরাং ইহা অনূন ৩০০০০ বৎসর পূর্বে জন্ম লাভ করিয়াছিল । কিন্তু আমরা দেখিতেছি, উল্লিখিত বচনটি মানব কুলের আয়ু-নির্ণায়ক ভিন্ন শাস্ত্র জীবনের নির্ণায়ক নহে । মানব সৃষ্টির বহুকাল পরে শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল ; অবশ্যইঈশ্বাকার করিতে হইবে, আদি সৃষ্টিকালে আয়ুর্বেদোক্ত বস্তু ও তদ্বিময়ক যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান মানব মনে উদ্ভূত ছিল, ক্রমে কতকাল পরে

ভত্তাবৎ হইতে শাস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছিল। একপ বলিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু যেমন মানব তেমনি তাহাদের শাস্ত্র, একপ বলা নিতান্ত অসংগত।

উল্লিখিত বচনটির তাৎপর্য এই যে, সভ্যযুগের মানুষদিগের অর্থাৎ আদি স্থষ্ট মানবদিগের আয়ু ৪০০ বৎসর ছিল। ক্রমে তাহাদের আয়ু যুগপরিবর্তনের অথবা কাল পরিবর্তনের প্রভাবে শত বৎসর হইয়া পড়িয়াছে। ঋষি সেই ভ্রাগক্রম বুঝাইবার জন্য বলিলেন, এক এক শতবৎসর পূর্ণ হয় আর মানবায়ু এক এক বৎসর কমিয়া যায়, এবং ক্রমে ভ্রাগ হইয়া সম্প্রতিকালে (কলিকালে) মানবায়ু ১০০ বৎসর হইয়াছে সুতরাং কলি আরম্ভের পূর্বে অন্যান্য ৩০০০০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহা অবধারিত হইল। সেই অতীত ৩০০০০ আর কলিগতান্দ কিঞ্চিৎ ন্যূন ৫০০০ সমুদায়ে ৩৫০০০ বৎসর মাত্র বর্তমান যুগ কাল অতিবাহিত হইয়াছে ইহা অবধারিত হইতেছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এত অধিক কালের হইলে অবশ্যই বেদসংহিতা মধ্যে কোন না কোন উপলক্ষে উক্ত শাস্ত্রের উল্লেখ থাকিত এবং তদ্বোধক প্রমাণান্তরও পাওয়া যাইত। তাহা যখন যায় না ; তখন আর উক্ত শাস্ত্রকে এত অধিককালের বলিয়া অনুমান বা প্রমাণ করা যায় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, আয়ুর্বেদোক্ত বস্তুও তদ্বিময়ক যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান উক্ত সময় অবগাহন করিয়াছে মাত্র।

দেশীয় লোকের সংস্কার ও আয়ুর্বেদবিদ্যালয় ।

স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বাধীন চেষ্টা মনের স্বাভাবিক ধর্ম । স্বাধীন ভাবের ছায়া ভান বা অভিনয়ে ও হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে । তাই আজ সাধারণে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা লইয়া ব্যস্ত । ধর্ম বল, সামাজিক নীতি বল, রাজশাসন বল, সর্বত্র স্বাধীন ভাবের ছলছল পড়িয়াছে । আজ হিন্দুসমাজের চিররুদ্ধ অবলাগণ অক্ষুটভাষী বালকগণ ও স্বাধীনতার কোলাহলে উন্মত্ত । তাই কখন ও সুরেন্দ্রের কারাবাস কখন বা স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি ঘটনা লইয়া সামান্য কৃষক পঞ্জীতেও কলরব শুনা যায় । ভাবিয়া দেখিলে ইহা কিঞ্চিৎ উল্লেখ্য বিষয় বটে ; বহুকাল মূর্ছাপন্ন ভারত সম্ভ্রানগণের স্মারুশক্তি যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহার চিহ্ন বটে, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে না । ভারত সম্ভ্রান যে দেশের স্থায়ী মঙ্গল বুঝিতে পারিয়াছে, আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার পরিচয় ইহাতে অল্পই আছে । ইহা কেবল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা আবেগ মাত্র । প্রকৃত উন্নতির দিগে এক পদও অগ্রসর নয় । কেননা যাহা গৃহস্থগণের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার অভাবে একবেলাও গৃহ-কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে না তাহার জন্যও যদি আমাদের সর্বদা পর মুখাপেক্ষী হইতে হইল, তাহাহইলে আমরা আপন স্বার্থ কি বুঝিলাম ? ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইউনিভার্সিটির তাড়নায় প্রতিবৎসর শতশত পণ্ডিতের নাম শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের বিজ্ঞাশিক্ষা কেবল দাসত্ব শিক্ষারই অনুকূল । উচ্চবেতনের দাসত্ব জুটিলেই বিজ্ঞা সার্থক এবং জন্ম সার্থক বলিয়া যাহাদের ধারণা,

তাহাদের উন্নতি অনেকদূরে অবস্থিত । প্রাতি বৎসর রাশি রাশি পুস্তকের জন্ম হইতেছে বটে ; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার অধিকাংশই অন্যর উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি মাত্র । বিজ্ঞান বা শিল্প চর্চ্চা প্রায় দেখিতে পাইবে না । এতৎসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক বা কোন পত্রিকার আদরও নাই । যদিও কোন ব্যক্তি বিদেশ হইতে শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া আইসেন ; তিনি আবার উপযুক্ত অর্থসাহায্যের অভাবে অভ্যস্ত বিজ্ঞা কার্যে পরিণত করিতে পারেন না ।

ইহার কারণ কি ? আমাদের দেশ আজিও বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি কার্য্যকরী বিদ্যার সাহায্য বুঝিতে পারে নাই । ইংলও প্রভৃতিদেশ যে, কেবল বিজ্ঞানের বলে, শিল্পের কৌশলে, বাণিজ্যের সাহায্যে আমাদের দেশ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ও সৌভাগ্যবান ইহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না । একমাত্র বিজ্ঞানের শক্তিতে ভারতের অকিঞ্চিৎকর ভূণও যে তাহাদিগকে অসুখ্যরত্ন উপঢৌকন করিতেছে, ইহা কেহ জানিয়াও জানেন না । আমরা কেবল দেশোন্নতি, স্বাধীনতা ইত্যাদি কতকগুলি আপাত-প্রতিশ্রুত শব্দ লইয়া ছল প্লুগ বাধাইতে পারি, — বক্তৃতার ঘন গজনি শুনাইতে পারি ; কিন্তু প্রকৃত কার্য্যসাধনী বুদ্ধি আমাদের কোথায় ? দেশের প্রকৃত উন্নতি কি প্রকারে হয় ? প্রকৃত স্বাধীনতার বা পন্থা কি ? কি কি উপকরণ চাই ? এই সকল বিষয়ে আমরা কয়জন ব্যক্তি চিন্তা করিয়া থাকি ? একটা কোন ছজুক উঠিলেই দেশশুদ্ধ লোক কোন বিচার না করিয়া তাহার অনুবর্তী হই । আজ ম্যাডাম ব্লাভাঙ্কী যোগেন ছজুক দেখাইলেন, উচ্চ নীচ শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইলাম । কাল একজন বিজ্ঞানের ভাণ করিয়া ধর্ম্মের বক্তৃতা করিলেন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা একবারে অন্ধ হইলাম । অমুক দিন এক ফকির আসিয়া জলে ফুৎকার দিলেন সহস্র ব্যক্তি তাঁহার গোঁড়া হইলাম । আজ অমুক

সাহেব অমুক বিষয়েই স্মৃতি করিলেন আমরা তাহা অজান্তভাবে গ্রহণ করিলাম । আবার তাহার পর দিবসই আর এক সাহেব সেই বিষয় অকস্মণ্য বলিয়া মীমাংসা করিলেন, আমরাও তাহা অকাট্য বলিয়া গণ্য করিলাম । এইরূপ অদূরদর্শী অসারগ্রাহী অব্যবস্থিত-মতি দেশ যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরিত্যক্ত ভূমি হইবে, ইহা বিচিত্র কি? আমরা সকল বিষয়েই কেবল কালের গতি, ভারতের গ্রহবৈগুণ্য ইত্যাদি অযথা দোষারোপ করিয়া থাকি । কিন্তু আমরা স্বয়ংই যে অপদার্থ ও কুসংস্কারাক্ত তাহা এক বারও ভাবি না । ফল আমরা আত্মবিষয়ে নিতান্তই দৃষ্টিহীন । সে দিন ইংলণ্ডগতা বিদুষী রমা বাই যথার্থই বলিয়াছেন,--“দেশীয় যুবকেরা ম্যাটসিনিকে নিয়া আশ্রয় করেন, অথচ প্রতাপসিংহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপও করেন না ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় । কিন্তু আমি পূর্বে বলিয়াছি যে ভারতবাসী ‘আশ্চর্য্য’ মানুষ-জাতির স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে এই আশ্চর্য্য জন্তুর কোন সম্পর্ক নাই । হতভাগ্য ভারতের এ অবস্থা কতকাল থাকিবে বলিতে পারি না । আমাদের দেশীয়গণের মধ্যে দেশীয় লোকের বড় আদর নাই, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । শিক্ষিত ব্যক্তিরা মতের গবেষণার কথা বলিবার সময় অনেকাধিক বার গ্যালিলিউর গুণ-গান করেন, (তিনি স্তবের উপযুক্ত বটেন) কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের নাগ কয় জনের মুখে শুনা যায় ? কত কাল হইল ফ্রায়ের সাহেব লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার স্মরণ চিহ্ন রাখিবার জন্য বোম্বায়ে অল্পকালের মধ্যে অনেক সহস্র টাকা চাঁদা জমিয়া গেল, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক ছত্রের (ইনি বোম্বাই অঞ্চলের অদ্বিতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা ও অধ্যাপক ছিলেন) স্মরণ চিহ্ন কোথায় ? ইংরাজ প্রভুদিগকে বল্ (Ball) দিতে ধনিগণ উৎসুক, ভারতের উপকার করিতে তাঁহারা কিন্তু কুণ্ঠিত হন ।” কেবল রমাবাইর মুখেই যে আমরা একথা শুনিলাম, এমত

নহে । অনেক অনেক শিক্ষিত পুরুষ-প্রবর-মুখেও এরূপ কথা মনয়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় । অতি ৬ঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা বলেন, তাঁহারাও বিদেশীয় ভানে উন্নত এবং সেই দলেরই পোষক । অতরাং পণায়মান চোর ধরিতে গিয়া চোরও ধর ধর বলিয়া চোৎকার করার ন্যায় ভাব দাঁড়াইয়াছে । কবে যে আমাদের এই মোহান্তির দূর হইবে আশ্তিনিশার অবগান হইবে, তাহা বলা যায় না । কবে যে আমরা নিজ অভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার পূরণ করিতে পারিব, নিজ প্রয়োজনীয় উপকরণ সকল নিজেরা সংগ্রহ বা প্রাপ্ত করিতে শিখিব, তাহারও স্থিরতা নাই । ফলকথা আত্মানুভূতি, আত্মজ্ঞান ও আত্মনির্ভর না জন্মিলে কল্পিনকালেও কোনদেখ উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না । কেবল পরের বিদ্যা, পরের ধন ও পরের বলে জ্ঞানবান্, ধনবান্ ও বলবান্ কত দিন থাকা যায় ? দেবমাতৃক দেশের শস্য সম্পত্তির উপর বিশ্বাস কি ? দেশকে উন্নত ও আপনাদের অবস্থা ভাল করিতে হইলে আপনাদের সমুদায় আত্মশক্তির উৎকর্ষ করা অগ্রো আবশ্যক ।

“পরং প্রযজ্যমতিষ্ঠেৎ তস্মাৎ স্বত্ত্বং সম্পাদি”

এই মহামন্ত্রে সকলেরই দীক্ষিত হওয়া উচিত । কিন্তু আমরা আত্মদোষে মনুষ্যোচিত সমুদায় গুণে বিবর্জিত হইয়াছি । আজ আমরা যে বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই কথা গুলি উত্থাপন করিলাম, তাহা লইয়া আজকাল অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন । আমাদের দেশীয় চিকিৎসার যাহাতে পুনরুন্নতি হয়, দেশীয় ঔষধ সকল যাহাতে আমাদের উপকারে আইসে, দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার যাহাতে সুন্দর চর্চা হয়, আত্মশরীর রক্ষার্থে পরদেশের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, এই বিষয় লইয়া অনেকেই আন্দোলন করিতেছেন, আজ পনের বৎসর অতীত হইল এই কলিকাতা মহানগরীতে সনাতন ধর্মরক্ষণী নামে এক সভা সংস্থাপিত হয়, সেই সভায় অনেক ধনী এবং

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সংস্রব ছিল । উক্ত সভার সম্পাদক ও সভ্যগণ আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য একবার পরামর্শ ও চেষ্টা করেন এবং ক্রিয় উপায় অবলম্বন করিলে আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, এই বিষয়ে প্রাধান প্রাধান কবিরাজগণের মত সংগ্রহ করেন, কিন্তু সভার অন্তর্ধানের পূর্বেই তাঁহাদের পরামর্শ ও চেষ্টা অন্তর্হিত হয় । তৎপরে কিছু দিন এই বিষয়ে আর বিশেষ উচ্চবাচ্য ছিল না । তৎপরে আজ প্রায় ৫ বৎসর অতীত হইল অম্বষ্ঠ-সম্মিলনী নামে এক বৈদ্যসভা সংস্থাপিত হয়, এই সভার সম্পাদক এবং সভ্যগণও আয়ুর্বেদের পরীক্ষা ও উন্নতির জন্য কথঞ্চিৎ চেষ্টা করেন । কিন্তু ইহাদের চেষ্টাও আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ফলোপধায়িনী হয় নাই । ফলোপধায়ক না হওয়ার যে সকল কারণ আছে, তন্মধ্যে বৈদ্যভিন্ন জাতিকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার না দেওয়াও একটি কারণ । সভা এবিষয় লইয়া অনেক বৈদ্যের নিকটে ঐরূপ কার্যের মতও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিলেন না । যে সময়ে ব্রাহ্মণগণ ধ্যানে নিমগ্ন, ক্ষত্রিয়গণ রাজকার্য্য-পরায়ণ, শূদ্রগণ দাসত্বে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ের সহিত তুলনা করিলে, ভারতের পূর্বতন সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি কতদূর পরিবর্তিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । এক্ষণে ভারত এক নূতন কলোবর ধারণ করিয়াছে । সকল বিষয়েই ভারতের নূতনত্ব ; সকল জাতিই জ্ঞানলোলুপ, যে পবিত্রবেদে দ্বিজাতিগণেরই সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, এক্ষণে শ্বেচ্ছজাতি সেই বেদের অধ্যাপক । জ্ঞানের নিকটে জাতি-বিভাগ আর নাই । যাহার যেমন শক্তি তদনুসারে জ্ঞান উপার্জন করাই এক্ষণে গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ জাতি বিচারের ব্যবস্থা করা বোধ হয় অম্বষ্ঠ-সম্মিলনীয় উচিত হয় নাই । তবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন ক্রটি-

সম্পন্ন, তাঁহাদের একরুচিতা সম্পাদনার্থে উক্ত সভা চেষ্টা করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। এখনও বৈদ্যদের মধ্যে এমন কুসংস্কারাপন্ন লোক আছে যে, তাঁহাদের সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিলে বিগ্নিত হইতে হয়। আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা বিবেচনা করিয়া সহজেই এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তিই নাই। শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উপস্থিত রোগের প্রতীকার করাই আয়ুর্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য, যখন পবিত্র ব্রাহ্মণ অবধি অস্পৃশ্য স্নেহু পর্য্যন্ত সকল জাতিই শরীরী এবং সেই শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগনিবারণ সকল জাতির আবশ্যক, তখন শরীরদারী মাত্রেরই এই অমৃতময়ী বিদ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে শরীর সর্ব কার্যের প্রধান সাধন, তাহার হিতাহিত পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য অশ্রু ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হওয়া অসভ্য সমাজের লক্ষণ বলিলেও বোধ হয় অত্যাুক্তি হয় না। মানব সমাজের কথা দূরে থাকুক, বনচর পশু, জলচর মৎস্য ও খেচর পক্ষীদিগকেও যদি আয়ুর্বেদের নিয়ম শিক্ষা দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় জগতের আরও মঙ্গল সাধিত হইত। অতএব আয়ুর্বেদশাস্ত্র, আয়ুর্বেদপরীক্ষা অথবা আয়ুর্বেদীয় সভায় মনুষ্য সমাজের সর্বসাধারণ জাতির প্রবেশের কোন বাধাই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যাতার সৃষ্ট চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির উপভোগে যেমন জাতিনির্কিশেষে অধিকার আছে, তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমূহের তত্ত্ব পরিজ্ঞান বিষয়েও সর্ব সাধারণের অধিকার তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। চিন্তা করিয়া দেখিলে আয়ুর্বেদশাস্ত্র পদার্থ-বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বিশেষতঃ বাঁহারা কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার বা লুপ্তপ্রায় বিষয়ের উদ্ধার সাধনে যত্নশীল হইলে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধি অথবা ক্ষমতা যতই সংগ্রহ করিতে পারেন ততই

তাঁহাদের কার্য্য-সৌকর্য্য হইয়া থাকে । আয়ুর্বেদ মূলতঃ শাস্ত্র ; ইহাও এক এক অঙ্গ এত বিস্তীর্ণ, এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ ও এমন জটিল, যে, পৃথিবীর সমুদায় লোক সৰ্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল আয়ুর্বেদের চিন্তা করিলেও কোন কালে এই বিদ্যা পূর্ণাবয়ব হইবে বোধ হয় না । সুতরাং কতিপয় পরিমিত ব্যক্তি এই অপার সাগরের একটি বালুকা কণাও সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল ।

যাঁহারা মনে করেন, পূর্বকালে আমাদের দেশে যে কোন বিদ্যা, জাতি সাধারণগত ছিল না, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই কঠিন নিয়ম বা এই দোষই সমুদায় শাস্ত্রের লোপ পাওয়ার অন্যতম কারণ । যদি বিদ্যা সাধারণজাতিগত হইত, তাহা হইলে উহা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত ; সুতরাং এতদূর বিলয়ের সম্ভাবনা ছিল না এবং তাহার অনুসন্ধানের জন্য এত লালায়িত হইতেও হইত না । আজ সমুদায় ভারত পর্য্যটন এবং তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও বৈদ্যশাস্ত্রে একটি প্রকৃত পণ্ডিত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ স্থল ।

যাঁহারা মনে করেন চিকিৎসা অশ্বষ্ঠগণেরই হুত্তি, ইহাতে অন্যের অধিকার নাই, অন্য জাতি এই হুত্তি অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের নিয়ম-লঙ্ঘনজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে, শাস্ত্রের বাবতীয় নিয়ম আমাদের মঙ্গলের জন্যই নিবদ্ধ হইয়াছে, আবশ্যকতা অনুসারে দেশকাল পাত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পুরাতন নিয়ম পরিবর্তন এবং তাহার স্থলে সংসারের মঙ্গল-জনক নূতন নিয়ম স্থাপন করা সুস্বক্ষেণ আমাদের শাস্ত্রের অতি সরল অনুমতি আছে । নূতন নিয়ম প্রচলন করায় শাস্ত্রের কোন রূপ অবজ্ঞা করা হয় না ; বরং তদনুসারে কার্য্য করিলে শাস্ত্রের গৌরবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এমন দিন গিয়াছে

যে সময় এই ভারতবর্ষে বিবাহের নিয়ম ছিল না ; গোমাংসও পবিত্র উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল । তৎপরে ঋষিগণ ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া বিবাহের বিধিস্থাপন ও গোমাংস ভোজন রহিত করিলেন । অতি প্রাচীন কালে ইত্যাকার যে সকল আচার অতি গৌরবের বিষয় বা অনিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল বর্তমান কালে তাহার উল্লেখও পাপের আশঙ্কা হয়, মুখে আনিলে অনেকের নিকট তিবস্তার ও উপহাস ভোজন হইতে হয়, কিন্তু জগৎ এগনই পরিবর্তনশীল যে, কালে অন্যান্য পদার্থের ন্যায়, ইহার আচার ব্যবহারেরও পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, যখন পরিবর্তনের এইরূপ প্রয়োজন অনিবার্য্য হয়, তখন সমাজ অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে । এইরূপে পূর্বকাল প্রচলিত অনেক নিয়মের পরিবর্তন বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় । সমাজের মঙ্গলার্থে সময়ে সময়ে এইরূপ কতশত নূতন নিয়ম স্থাপন এবং পুরাতন নিয়মের পরিবর্তন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই । চরক এবং সুশ্রুতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভূক্তেরই আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার দেখা যায় ; হয় ত সেই সময়ে অশ্বষ্ঠজাতির উদ্ভাবনই ছিল না । শ্বতিশাস্ত্রের প্রাবল্য হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্র অশ্বষ্ঠগণের হস্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় । সুতরাং ইহাও যে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত নিয়ম, তাহা চিস্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন । ফলকথা বেদ, পুরাণ, শ্বত প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহে যে সকল বিধি বা নিষেধ দেখা যায়, সংসারের মঙ্গলসাধন ভিন্ন সেই সকলের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই । আমরাও যদি সাধারণ জাতির প্রতি বৈদ্যশাস্ত্রের অধিকার দান করিয়া শাস্ত্রের উন্নতি এবং সমাজের হিত সাধন হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ?

কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার আছে, যে, নূতন নিয়ম সংস্থাপন এবং পুরাতন নিয়ম পরিবর্তন বিষয়ে ঋষিগণেরই

ক্ষমতা ছিল আমাদের সেই ক্ষমতা কোথায়? তাঁহাদের ইহা বুঝা উচিত, যে, জ্ঞানের প্রবাহ অনন্ত। যতকাল নরসমাজ বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল ইহার বিশ্রাম নাই। আধুনিক ব্যক্তিগণের দ্বারাও এমন কত বিদ্যা, কত পদার্থ, কত নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা ঋষিগণ চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। সেই সমস্ত দ্বারা কি জগতের উপকার হইতেছে না? অতএব জটাবঙ্কল ইত্যাদি বেশ-ভূষাকে ঋষি না বলিয়া কেবল মঙ্গলময় বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগকে ঋষি বলিলেই কি ভাল হয় না? জ্বরের শক্তি বা নিয়মের গুণ বক্তৃভেদে কখনও প্রকাশ পায় না। তাহার নিজের যে শক্তি বা গুণ আছে তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বৈয়য়িক নীতিবেত্তারা বলেন যে,—

(১) কোন বিদ্যা বা ব্যবসায় কোন নির্দিষ্ট জাতিগত হইলে অন্য জাতির মধ্যে যাহারা সেই বিদ্যা বা ব্যবসায়ে প্রাভাবিক প্রতিভা-সম্পন্ন, তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। সুতরাং এরূপ নিয়মের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হয়।

(২) পরিমিত ব্যক্তি বা জাতির প্রতি কোন বিদ্যা বা ব্যবসায় নির্দিষ্ট থাকিলে তাহা বিস্তারিত হইতে পারে না। কায়েই উহার মূল্যও অধিক হয়, সুতরাং ইহাতেও সমাজের ক্ষতি হয়।

(৩) ব্যবসায় বা বিদ্যা জাতি-সাধারণ-গত না হইলে অর্থ সাধারণ-গত হয় না। এইরূপ যে কোন প্রকারে হউক চিকিৎসা জাতি-সাধারণ-গত হওয়াই উচিত। এই উদার নিয়মের অনুমরণ না করিলে অস্বপ্ন সন্মিলনের পক্ষে আয়ুর্কোদের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক সাধারণের মহানুভূতি পাইবেন কি না সন্দেহের বিষয়। আয়ুর্কোদ সমিতি যে গবর্ণমেন্ট সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠাপিত বিদ্যা মন্দিরের বিশাল দ্বার সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছে।

আমরা দেশীয় লোকের সংস্কারের কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। সুতরাং এস্থলে অশ্বষ্ঠ-গম্ভীর আয়ুর্বেদীয় সভার সঙ্কীর্ণ নিয়মের বিষয় উত্থাপন করা কেহ কেহ হয় শু অনধিকার চর্চা বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতে পারেন। তাহারা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত নহে। কেন না, যখন আয়ুর্বেদের সঞ্জীবন-সাধন আমাদের সঞ্জীবনীর উদ্দেশ্য, তখন তাহার উন্নতিসমক্ষে যাহা কিছু অন্তরায় আছে,——যাহা কিছু কষ্টক আছে, সামান্যই হউক আর বৃহৎই হউক, সে সমুদয়গুলি সাধারণকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু বিশ্বের ধ্বংস না হইলে কোন কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। তবে যদি আমাদের গত উক্ত সভার কোন সভ্যের মনঃপুত না হয়, অথবা আমাদের সংস্কার জাস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় আমাদের সহিত এ বিষয় লইয়া বিচার করুন। তাহা হইলে বিচার-মুখে সত্য নিষ্কাশিত হইলে, অনেকের ঐক্যপা মারণা তিরোহিত হইতে পারে।

উপরে কতক গুলি বৈদ্যের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এক প্রকার সংস্কারের উল্লেখ করা গেল। এতদ্বারা সকল সম্প্রদায়ের লোকের সংস্কারের বিষয় উত্থাপন করিতে গেলে সংস্কার-কাণ্ড নামে এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। সুতরাং এস্থলে আমরা বৈদ্যাচিকিৎসাসম্বন্ধে অনেকের মনে যে সকল সংস্কার জন্মিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্রের উল্লেখ করিতেছি।

অনেকে বলেন “বৈদ্যাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, সুতরাং উহার চিকিৎসা তৎকালীন মানবগণের পক্ষেই উপযুক্ত ছিল। এখন কালের পরিবর্তনে মনুষ্যের প্রকৃতি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে এবং অনেক প্রকার

নূতন রোগেবও সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং সেই বহুকালের পুরাতন শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা কোন প্রকারেই এখনকার মানবগণের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না ।*

আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র যে অতিপ্রাচীন, এমন কি অনাদি বা অপরিজ্ঞাত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ইহার আদি নির্ণয় হয় না বলিয়াই হিন্দুগণ ইহাকে অনাদি ও নিত্য বলিয়া থাকেন । পরন্তু ইহা অতি প্রাচীন হইলেও সৌত্রিক আকারে লিখিত । শাস্ত্রীয় সূত্র যত কেন প্রাচীন না হউক, যত কেন বয়ঃ-প্রাপ্ত না হউক, তাহাতে প্রকৃত দৃষ্টি জন্মিলে লক্ষ বৎসরের পূর্বের বা পরের ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করা যায় । এবং সূত্রাংশ দৃঢ়ীকৃত হইলে কোন ক্রমেই ইহার সত্য স্থলিত হইতে পারে না । শাস্ত্র সূত্রাকারে উপস্থিত হইলে কতদূর ক্ষমতাপন্ন হয়, ইহা আমরা ঔষধসূত্র নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি । চিকিৎসা-শাস্ত্র মানব-রচিত কাল্পনিক নিয়ম নহে । উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রাকৃতিক সত্যাংশের সংগ্রহ বা সমষ্টি । সুতরাং যত কাল প্রকৃতি, ততকাল ইহার কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকিবে । জলে পিপাসা-নিবারণ হয়, আহারে ক্ষুধিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি যেমন চিরদিনের জন্যে সত্য, তেমন তেওড়ীতে বিরেচন হয়, অহিফেনে কোষ্ঠ-রোধ হয়, ইত্যাদিও তেমন চিরদিনের জন্যে সত্য, তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সূত্র নির্মাণ হয় নাই এবং দেশ কাল প্রভৃতি অনুসারে কোন অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিতে হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য ।

সেই সকল পরিবর্তন বা পরিবর্তন কি কেবল অশ্রদ্ধাধারা—জকুটি বিক্ষিপ্ত দ্বারা সংশোধিত হইবে, না সকলের সমবেত চেষ্টায় বহুপরীক্ষাস্তে সাধিত হইবে? কোন বিষয়েই উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ জনগণের মত সংগ্রহ করিয়া

বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সাধন আবশ্যক, নতুবা কেবল মোষের উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে কিরূপে সে বিষয়ের উন্নতি হইবে ? যদি পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহার সংগ্রহ এবং সাধ্যানুসারে তাহার মীমাংসা জন্য চেষ্টা করিতে সঞ্জীবনী প্রাপ্ত আছে, অনুসন্ধিৎসু বর্গের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে সঞ্জীবনী কার্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে ।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে বৈদ্য শাস্ত্রের ঔষধ নিতান্ত 'অন্ধকারে ডেলা মারার ন্যায়' । বৈদ্যগণ শব্দচ্ছেদন করেন না, স্মৃতবাং শারীরিক যন্ত্র বা তাহাদের ক্রিয়ার বিষয় ইহারা কিছুই জানেন না । ইহাদের শাস্ত্রও কেবল অনুমানের উপরে লিখিত, শারীরিক যন্ত্রাদির প্রত্যক্ষের সহিত ইহাব কোন সংস্রবই নাই, অতএব উহাদের চিকিৎসা নিতান্ত অকর্মণ্য ।

যাহারা বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন বা স্পর্শ করেন নাই, তাহাদের এইরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে । যে সকল জাতি এইক্ষণে সভ্যতম বলিয়া গণ্য, ইহারা যৎকালে আগমাংস ভোজন করিয়া পশুর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত, চিকিৎসাশাস্ত্র কি ? উহাদের কল্পনায়ও উপস্থিত হয় নাই । তৎকালে হিন্দুগণ শারীরিক চর্চার নিমগ্ন ছিলেন । নরদেহ কিরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, শারীরিক যন্ত্রাদির আকার প্রকার গতিবিধি কিরূপ, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করেন নাই । *

* ভস্মাৎসমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধি-পীড়িতমবধশক্তিকং নিম্নেষ্টোজ-পুত্রীষং পুরুষম্ বহস্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং যুগ্মবল্কলকুশলগাদী-নামমৃতমেनावেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ সম্যক্প্রকৃৎ ততো ততো দেহং সপ্তরাত্রাচ্ছীরবালবেণুবল্কলকুচীনামমৃতমেন শঠৈঃশঠৈঃ-বর্ষয়ঃস্ গাদীনু সর্কানৈবধাভ্যাস্তরাস্ত্রোত্যদিশেযানু যথোক্তানু লক্ষ্যে-চ্ছব ।

যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ইংলণ্ড অল্পদিন মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, যদ্বারা ইংরাজীচিকিৎসার পূর্বপ্র্যোত পরিবর্তিত হইয়াছে । তাহা হিন্দুগণ অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে পরিজ্ঞাত ছিলেন । হিন্দুগণের শাস্ত্রযাহারা কাল্পনিক বলেন, তাহাদের ভ্রান্তি ভিন্ন কিছুই নহে ।

আজি কালি কতকগুলি ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, “বৈদ্যচিকিৎসা বৈজ্ঞানিক নহে । উহা যৎপবোনাস্তি ভ্রম-সঙ্কুল ।” যাহারা এইরূপ বলেন, তাহারা বৈদ্যশাস্ত্র কখন স্পর্শও করেন নাই, কেবল ছজুকের কলরবেই চালিত ও সাহেবী সিদ্ধান্তে অন্ধ । ইংরাজের ন্যায় স্বার্থপনায়ণ জাতি জগতে আর নাই বলিলেও হয় । ইহাবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য না করিতে পারেন এমন কার্য্য নাই । হিন্দুচিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইলে ইহাদের স্বার্থের হানি হইবে, ইংরাজীচিকিৎসার কল্যাণে প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিজেদের উদরমাৎ হইতেছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবেক, সুতরাং পাকে একারে যেক্ষেপেই হউক আমাদের চিকিৎসায় যে দোষারোপ করিবেন, অসার ও অপদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, ইহাও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ।

দৈহিক উপকরণের অযথা দ্বাগ রুক্ষি অথবা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দৈহিক তাড়িতের (পঞ্চোদ্ভাণঃ সনাভমাঃ) অসামঞ্জস্য (Disturbance of the Equilibrium of the Animal Magnetism) যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহা আর্য্য ঋষিগণ সহস্র বৎসর পূর্বে উপলব্ধি করিয়া সূত্রাকারে প্রথিত করিয়া গিয়াছেন । কালে বিদ্যার-জ্যোতিঃ যতই রুক্ষি পাইতেছে উক্ত জ্ঞান-গর্ভ বাক্যের মহিমা ততই প্রতিপাদন করিতেছে । যে যোগেন প্রতি দেখ না কেন উহা অসমতার পরিণাম মাত্র । শোণিতে জলীয় ভাগ অধিক হইলে উহা রোগ, লৌহের অংশ অল্প হইলে রোগ । পাকস্থলীতে অগ্নির আধিক্য

হইলে রোগ, অল্পের অল্পতাও রোগ । মস্তিষ্কে শোণিত প্রবাহ
অধিক হইলে রোগ, অল্প হইলেও রোগ—অধিক স্নিগ্ধতাও রোগ,
অধিক কৃষ্ণতাও রোগ ।

হ্রাসের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের হ্রাস, সমতার বিধান যে চিকিৎসার মূল
ভিত্তি, তাহা বিজ্ঞান সম্মত নয় কেন ? কোন অশিক্ষিত লোকের
মুখে স্বাস্থ্যাদি কোন রোগের উপস্থিতিবিষয়ক রূপকে লিখিত শ্লোক
বিশেষের ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা দৃষ্টতান কৰ্ম
ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? বৈদ্যক চিকিৎসার অষ্টাদ
অনুসন্ধান কর, দেখিবে শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অভাবই
ইহা অন্ধকারময় ও অজ্ঞানামুগ্ধ হইয়াছে । পৃথিবীর সকল জাতিতেই
কতকগুলি কুসংস্কারাপন্ন লোক আছেন । যে ইংরাজজাতি আজ
বিজ্ঞান লইয়া এত গৌরব ও আশ্চর্য্যজনক করিতেছেন, তাহাদের
মধ্যে চিকিৎসাবিষয়ে কতদূর কুসংস্কার আছে, তাহা শুনিলে হাস্য
সম্বরণ করা যায় না । একজন ইংরাজসমাজ-লেখক বলেন—

“শিরো-বেদনা-রোগ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের এই কুসংস্কার আছে
যে মাথার চুল কাটিয়া যদি কেহ পথে ফেলিয়া দেয় এবং একটা
পাখী যদি সেই চুলের কয়েকটা মুখে করিয়া উড়িয়া যায়, তাহা
হইলে ভয়ানক শিরো বেদনা হয় । সসেক্স জিলাব ইংরাজ ক্রমক-
দিগের মধ্যে এই কুসংস্কারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় । এই
কুসংস্কারে বিশ্বাসী ইংরাজগণ মাথার চুল কাটিয়া তাহা অনাবৃত
স্থানে ফেলিয়া দিতে দেয় না ।”

জীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধেও অনেক ইংরাজের
কুসংস্কার আছে । তাহাদিগের বিশ্বাস আছে যে অনেক ঔষধে
এ রোগের কিছু হয় না । তুচ্ছ তাকই ইহার প্রকৃত ঔষধ । এ
রোগের আরোগ্য জন্য তুচ্ছ তাক করিতে পারে, ইংলণ্ডের পাড়া-
গাঁয়ে এরূপ স্বাস্থ্য জীলোক দেখা যায় । এ রোগের আরোগ্য

সম্বন্ধে আব একটা কুসংস্কারাত্মক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে । রোগী কয়েকটা পুরুষের নিকট হইতে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া যদি একটি অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া পরিধান করে, তাহা হইলে হিষ্টিরিয়া-রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক আরোগ্য হয়, এ কুসংস্কার ইংলণ্ডের অনেক স্থলে প্রচলিত দেখা যায় ।

পাণ্ডুরোগের আরোগ্য জন্য কোন কোন ইংরাজ এই কুসংস্কার-মূলক উপায়টি অবলম্বন করিয়া থাকেন ;—ছাই ও মাটি লইয়া কতকগুলি গোলা পাকাইয়া তাহা গোবরের গাদার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিতে হয় । এই প্রক্রিয়া দ্বারা পাণ্ডুরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, এরূপ বিশ্বাসসম্পন্ন ইংরাজ আজও অনেক দেখা যায় ।

কর্ণওয়াল জিলার লোকের বিশ্বাস যে খোঁড়া ব্যক্তি যদি এক রাত্রি একটা প্রস্তরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সে আর খোঁড়া থাকে না । আজও ঐ জিলার কোন কোন খোঁড়া লোক ঐ উপায়ে আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে ।

অত্যাপি ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে কোন কোন রক্ষা স্ত্রীলোকে তুক্ তাক্ করিবার ক্ষমতার ভাণ করিয়া থাকে । অনেকে ইহাদিগের কথা বিশ্বাস করিয়া ইহাদিগের নিকট রোগ আরোগ্য হইবার জন্য আসিয়া থাকে । শরীরে কোন স্থানে বেদনা হইলে ইহারা মস্ত-পুত এক প্রকার পুঙ্খ রজ্জু দেয় । সেই রজ্জু যেখানে বেদনা হয়, সেই স্থানে পরিধান করিতে হয় ।

পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলে অনেক ইংরাজ ভিক্ষালব্ধ অর্থে অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়া থাকে । পেটবেদনা হইলে পেটের উপর ক্রশ্ রক্ষা করা আরোগ্যের একটি উপায়, ইহাও অদ্যাপি অনেক ইংরাজের বিশ্বাস । কোন স্থানে আঘাত লাগিলে

আহত স্থানের উপরে একটি সুতা বাঁধিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে, এই কুসংস্কার ইংলণ্ডের অনেক স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত,—

Our Saviour rado,
His forefoot slade,
Our Saviour lighted down ;
Sinew to sinew—joint to joint,
Blood to blood, and bone to bone,
Mend thou in God's name.

চক্ষুতে আঁজনি হইলে তাহা আনোয়া করিবার জন্য কুসংস্কারাপন্ন ইংরাজগণ নিম্নলিখিত প্রকার উপায় অবলম্বন করেন,—
শুল্কপক্ষের দ্বিতীয়ার চক্ষু দেখিয়া একটি কুম্ভকায় বিড়ালের লেজ ধরিয়া তাহার গাত্র হইতে একটা লোম তুলিয়া লইয়া তাহা আঁজনির উপর মর্দন করিতে হয় । দস্তশূল রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক ইংরাজ মৃত ব্যক্তির একটি দস্ত লইয়া তাহা গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত এক খানি বাইবেল গ্রন্থের এক পাশ্বে খীষ্ট কর্তৃক পিটারের দস্তশূল রোগের আনোয়োর রক্তাশ্রু লিখিয়া তাহা সঙ্গে রাখিলে দস্তশূল রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়, অনেক ইংরাজ এই কুসংস্কারানুসারে কার্য করিয়া থাকেন ।

ইংলণ্ডের কোন কোন স্থানের লোকদিগের বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তি বিকার বোগাক্রান্ত হইলে তাহার পাদদেশে ভেড়ার চামড়া রাখিলে তাহা রোগীর শরীর হইতে সকল রোগ আকর্ষণ করিয়া লইবে । আবার কোন কোন স্থানের ইংরাজগণ ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাদদেশে মৃত গরুর খীরা রাখিয়া দেয়, বিশ্বাস ঐরূপ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে । কোন কারণে উদর স্ফীত হইলে

অনেকে গির্জাঘরে অর্থ যাচঞা করণার্থ ব্যবহৃত কাচপাত্র উদরের উপর রাখিয়া দেয় । নরফোক জিলার লোকদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস কিছু অধিক প্রচলিত দেখা যায় ।

ঘুঙারি কাশী ছেলেদিগের একটি প্রধান রোগ । এই রোগ আরোগ্য করণার্থ অনেক ইংরাজ নানা কুসংস্কারাক্রম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন । ইংলণ্ডের কোন কোন জিলার লোক কোন ছেলের ঘুঙারি হইলে তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য একটি গাধার পৃষ্ঠের উপর ও উদরের তল দিয়া তাহাকে তিন বার ঘুরাইয়া লয় । আবার কোন কোন স্থানে এইরূপ কুসংস্কার আছে ;—যে ছেলের ঘুঙারি হইয়াছে, তাহার পিতা একটি মাকড়সা ধরিয়া আনিয়া তাহা রোগীর মস্তকের উপর রাখিয়া তিন বার এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে ;—

“Spider, as you waste away

Hooping-cough no longer stay.”

তৎপরে মাকড়সাটি একটি থলির মধ্যে পুরিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হয় । লোকের বিশ্বাস যে মাকড়সা মরিয়া যেমন তাহার দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, তেমনি ছেলের ঘুঙারি আরোগ্য হইতে থাকে । চেশায়ার জিলার লোকদিগের বিশ্বাস যে একটা বেণ্ড বা বেণ্ডাটির মুখ রোগীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে আরোগ্য হইয়া থাকে । আবার নরফোক জিলাবাসিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে ঘুঙারি কাশী রোগাক্রান্ত ছেলেটিকে গুজ্জবেরী বৃক্ষের চতুর্দিকে তিন বার টানিয়া লইয়া বেড়াইলে সে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে । নরফোক জিলাবাসিগণের কুসংস্কার আছে যে, এক বাড়ীতে যদি চারি পাঁচটি শিশুর ঘুঙারি কাশী হয় তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে যে শিশুটি সকলের অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক, তাহার মাথার কয়েকটি চুল কাটিয়া চুন্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাটার অন্যান্য শিশু ও

বালক বালিকাদিগকে সেই দুগ্ধ খাওয়াইলে রোগাক্রান্ত শিশুগুলি অল্পকাল মধ্যে রোগমুক্ত হয়। আবার অনেক স্থানের লোক গামার পুষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণ চুল লইয়া তাহা একটি গাছুলির মধ্যে রাখিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দেয়।

গলগণ্ড রোগের আরোগ্য করণ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অনেক লোকের অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। এখানে দুই একটার উল্লেখ করা যাইতেছে। নর্থম্পটন ও অন্যান্য কয়েকটি জিলার লোকের দৃঢ় সংস্কার যে মৃত ব্যক্তির হস্ত দ্বারা গলগণ্ড স্পর্শ করাইতে পারিলে সেই মৃত ব্যক্তির হস্ত যেমন ক্রমে ক্রমে মৃত্যুকায় পরিণত হইতে থাকে, তেমনি গলগণ্ড আরোগ্য হইতে থাকে। গ্লষ্টার জিলায় ঘোড়ার লেজের চুলের হার প্রস্তুত করিয়া তাহা গলদেশে পরিধান করাই গলগণ্ড রোগের প্রাধান ঔষধ বিবেচিত হইয়া থাকে।

আঁচিল সম্বন্ধে ইংরাজদিগের মধ্যে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। দক্ষিণ হস্তে আঁচিল থাকিলে তাহা বড় মৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, আর মুখে আঁচিল থাকিলে তাহা বড় দুঃখ কষ্টের চিহ্ন বিবেচিত হয়। মুখে ও শরীরের কোন স্থানে আঁচিল থাকিলে তাহা দেখিতে বড় বিম্বী হয় বলিয়া অনেক ইংরাজ তাহা আরোগ্য করিবার জন্য নানা কুসংস্কার মূলক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। যাহার শরীরে যতগুলি আঁচিল সে ততগুলি প্রান্তর খণ্ড একটি কাগজের মধ্যে পুরিয়া তাহা এক স্থানে নিক্ষেপ করে, বিশ্বাস এই, যে, যে ব্যক্তি সেই কাগজের মোড়কটি উঠাইয়া লইবে, তাহার শরীরে সেই কয়েকটি আঁচিল হইবে এবং ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বনকারী লোক আঁচিল হইতে মুক্ত হইবে। কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে, পূর্ণিবার রাতে আঁচিলের উপর নয় বার ফুঁ দিলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইরূপে রোগের আরোগ্য-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ইংরাজদিগের যে

কত হাস্যকর কুসংস্কার আছে, তাহা বলা যায় না । ইংরেজদিগের মধ্যে যখন এই প্রকার নানা কুসংস্কার প্রচলিত, তখন তাঁহারা আফ্রিকা বা ভারতবাণীদিগকে কি প্রকারে কুসংস্কারপন্ন বলিতে পারেন ?”

পরের দোষ প্রদর্শন করিলে, আত্ম-দোষ কখনও ক্ষালিত হয় না, অথবা নিজের গোঁসবও বৃদ্ধি পায় না । আমরা এইরূপে নিজের মর্যাদা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহি তবে কিনা কুসংস্কারাপন্ন অনির্জিত ব্যক্তি সকল সম্প্রদায়েই আছে । কাল ক্রমে কোন কাবণ বশতঃ সেই সকল ব্যক্তিবশত যদি কোন গ্রন্থে প্রবিষ্ট বা লিপি-বদ্ধ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা যাউতে পারে না । প্রাচীন-তম হিন্দু জাতির সভ্যতার সূত্রপাত হইতে এই পর্য্যন্ত কত বিপ্লব, কত বিপ্লব, কত বিপর্যায় ইত্যাদি ঘটয়াছে, কে বলিতে পারে ? সেই বিপ্লবাদি-সঙ্কুল অসীম কাল প্রবাহে কত প্রকার বিভিন্ন সংস্কার ও রুচি-সম্পন্ন লোক হিন্দু সম্প্রদায়ে জন্ম লাভ বা প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারই বা ইয়ত্তা কি ? ইহাদের কোন ব্যক্তি-কর্তৃক বিশেষ কোন ভ্রমাত্মক মতে কোন শাস্ত্রে প্রবিষ্ট না হওয়ার কোন কথাই নাই । একপ ঘটে বলিয়া স্মৃষ্কদর্শী ঋষিগণ মৎ ও অমৎ শাস্ত্র পরীক্ষার উপদেশ এবং পদ্ধতি দেখাইয়াছেন, আমরা সেই পবীক্ষা পদ্ধতি স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম । যাহা হউক আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান বল, যন্ত্র বল, অথবা যাহাই বল সকলেরই উদ্দেশ্য চিকিৎসা । বিজ্ঞান, চিকিৎসার সর্বাংশে প্রবেশ করিতে পারে না । যন্ত্রও ইহার সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারে না । সরল কথায় বলিতে গেলে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার উপর ইহার সত্যাংশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে । ইংরেজ ! তোমরা বিজ্ঞানের অভিমান করিতেছ, যন্ত্রের বল দেখাইতেছ, কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞান, যন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি

এবং চিকিৎসা যে স্থলে বিমুখ হইতেছে এমন সমস্ত স্থলে নিরীহ এবং তোমাদের নিকটে কাণ্ডজ্ঞান-হীন কবিরাজগণ ক্রিপণ রূপে কার্য্য হইতেছেন, তোমাদের অনুসন্ধান এবং স্মরণার্থে আমি কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি এই সকল দৃষ্টান্ত অতি অল্প দিনেই ঘটিয়াছে, তোমরা স্বার্থের প্রলোভনে, কুতর্কের কুহকে কাকতালীয়-সংযোগ বলিবে কি না বলিতে পার না ।

আমার ঘোষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বঙ্কবিহারী মুনসীর তিন বৎসর বয়সের সময় জ্বর হয় এবং জ্বরের সহিত উদরাময় থাকে ; প্রথমে মথন পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হয়, সেই সময় এই স্থানের বিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ সেন ডাক্তার মহাশয় চিকিৎসা করিয়া একপ্রকার আরোগী করেন, কিন্তু সে আরোগী অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । কিছু দিন পরেই পুনরায় জ্বর উদরাময়, মর্ফদা পেটের ফাণ, কাস, ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ ও উপসর্গ উপস্থিত হইয়া প্রায় দুই বৎসর যাতনা পদান করে । এই অবস্থায় যে যে ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয় দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল, এবং ঔষধ দ্বারা যে পরিমাণে উপকার হইয়াছিল তাহা নিম্নে লিখিতাম ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন ওপ্তা হাং সাং কলিকাতাস্থিত কমলিনী-টোলা ; ইনি বাঙ্গালী চিকিৎসা করেন । ইহঁদেরই সূচিকিৎসা দ্বারা ও জগদীশ্বরের কৃপায় দুই বৎসরের পর আমার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি । ইনি চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে উপকার দেখা-ইয়াছিলেন । চারি মাস চিকিৎসা দ্বারা এবং ঔষধ ও সুপথোর ব্যবস্থা দিয়া পুত্রটিকে নীরোগ করিয়া আমার শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সাধকতা করিয়াছেন এবং পুত্রটি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে আমার পুত্রটির বয়ঃক্রম সাত বৎসর ।

শ্রীমদ্রচন্দ্র মুনসী

সাহে উত্তরপাড়া । জগন্নি ।

সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়

চিকিৎসাশাস্ত্র-পারগতেষু—

নিবেদনমিতঃ

মহাশয় ! আমার পরিবারের চক্ষুর পীড়া প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল হওয়াতে আমাকে যারপরনাই বিজ্ঞত ও বাতিব্যস্ত হইতে হয়, এবং রোগীকেও উত্তরোত্তর উৎকট যজ্ঞণা ভোগ করিতে হয়। যখন রোগের প্রথম সূচনা প্রকাশিত হয়, তখন কেবল চক্ষু হইতে জলস্রাব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং সামান্য ও সহজে আরোগ্য হইবে বলিয়া অবধারণ করি; কিন্তু ক্রমে উহা যেমন বহুকালব্যাপক হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যজ্ঞণাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ক্রমশঃই চক্ষু রক্তবর্ণ ও উহাতে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। শেষে অবস্থা—এমনি দাঁড়া হইল যে দৃষ্টিহীন হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমার ও কতিপয় আত্মীয়-দিগের চিরসংস্কার ও বিশ্বাসানুসারে ইংরেজি চিকিৎসাই চক্ষুরোগের উপকারী ও বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং তদনুসারে এখানকার প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু যখন দীর্ঘকাল চিকিৎসায়ীনে থাকিয়াও কিছুমাত্র উপকার লাভিত হইল না, তখন আপনার হস্তে চিকিৎসাতত্ত্ব প্রদান করা হয়। আপনি আপনার অসাধারণ ব্যবসায়-নৈপুণ্য-প্রভাবে অবস্থা আদ্যোপান্ত শ্রবণ ও সূচক্ষে দর্শন করিয়া শ্রমদিনে সামান্য সামগ্রী দ্বারা যেমতপে এই যজ্ঞণাদায়ক উৎকট রোগ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ ও অভূতপূর্ব ব্যাপার। বলিতে কি, আপনার ন্যায় অল্পবয়স্ক স্থিরগতি সূচিকিৎসকের দীর্ঘ জীবন আমাদের মতত প্রার্থনীয়। ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ হুঃসাধ্য রোগের হস্ত হইতে রোগীদিগের জীবন রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকটে যশোভাজন, ঈশ্বর নিকটে আশীর্বাদলাভ, ও আপনার কর্তব্য কার্য সাধন করিতে থাকুন। বলা বাহুল্য যে, আমি যত দিন জীবিত থাকিব, আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী রহিলাম। এক্ষণে দেশবিদেশীয় পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুরোধ, যাঁহাদের দেশীয় চিকিৎসা-

সায় বিশেষ ফলোপধায়কতা নাই এবং ঐকিলেও সেইরূপ চিকিৎসক নাই বলিয়া সংস্কার আছে, তাঁহারা একবার আপনারা বা আপনাদের কোন আত্মীয় পক্ষ দ্বারা কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈখুণা, গভীর দৃষ্টি, ও রোগীর প্রতি বিশেষ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান পরীক্ষা করিলেই, তাঁহাদের পূর্ব সংস্কার অপনয়নের পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না, এবং আৰ্য্য-চিকিৎসা-গৌরবও অনায়াসে প্রকাশিত হইতে পারিবেক । কিমধিকমিতি—

শ্রীমথুরানাত দত্ত দাস

মহারানী হরশ্রুঙ্গরীত যুগ্মী,

যোড়াকো,

একটি মারাত্মক রোগ আমাকে প্রায় গ্রাস করিয়াছিল ; প্রতিদিন দুঃখের নায় প্রস্রাব হইত তাহার সহিত কোন কোন দিন প্রচুর রক্তও নিগত হইত, কখন বা ঐ পদার্থ জমা হইয়া প্রস্রাব-দ্বার বন্ধ করিয়া বেদনায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিত । এই ভয়ানক রোগে আমার শরীর এমনত অবসন্ন হইয়াছিল যে কেহই আমার প্রাণের প্রত্যাশা করেন নাই । ইংরাজি চিকিৎসায় আশু উপকার হইবেক এই আশায় আমি এখানকার প্রধান প্রধান বাঙ্গালি ও ইংরাজ ডাক্তারদিগের মত গ্রহণ করিয়া ঔষধ সেবন করি ; কিন্তু উক্ত চিকিৎসায় আমার কোন ফল লাভ দূরে থাকুক উত্তরোত্তর দুর্দ্ধি পাইতে লাগিল । এই অবস্থায় কোন বিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসায় নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, ইহা ভুতড়িয়া বোগ, কখনই আরোগ্য হইবে না । এই কথা শুনিয়া জীবন-আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার শরণাগত হই । তাঁহার কৃপায় অল্প দিনের মধ্যেই সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করাতে আমার যুয়ু-দেহে জীবন-সংস্কার হইয়াছে । ইতি

শ্রীব্রজমোহন ঘোষ

সাহ নৈহাটী । সাং সাং শোভা-বাজার রাজবাটী ।

একদা আমার একটি পুত্রের উদবে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয় । তাহার প্রতিকারার্থে ইংরেজি চিকিৎসা অবলম্বন করা হয় । চিকিৎসকগণ নানারূপ প্রতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বেদনা নিবারণার্থে উপর্যুপরি বমন ও বিরেচনকারক ঔষধ ও অবশেষে পিচ্কারি পর্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন । কিন্তু তেই কোনরূপ প্রতিকার দেখা গেল না । ক্রমশঃ বেদনার আধিক্য, উদর ফীতি এবং বমন আরম্ভ হইল । এই চিকিৎসায় অজ্ঞতা প্রধান প্রধান সিবিল সার্জনগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন । অবশেষে ইহারা স্থির করিলেন যে, এই বালকটির আর কোন উপায়ই নাই, কেবল একটীমাত্র উপায় যে মলদ্বারের উপবে আর একটী মলদ্বার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া । এই কৃত্রিম মলদ্বার প্রস্তুত করিয়া দিলেও এক শতের মধ্যে দুই একটি রোগী বাঁচিতে পারে । এই বিবেচনা করিয়া বৈকালে অস্ত্র প্রয়োগ করিব বলিয়া তাঁহারা তখন চলিয়া গেলেন । তৎপরে আমি নিকপায় ও হতাশ হইয়া শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নিকট গেলাম । তিনি রোগী দেখিয়া বায়ুর বিকৃতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং কোন মতেই অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নহে স্থির করিলেন । তাহার পর অস্ত্র কোন ঔষধ না দিয়া কেবল মিশ্রিত পান্য ও ডেলা মিশ্রি একটুক একটুক করিয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করা গেল । সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার সাহেবদের আসিবার পূর্বে অস্ত্র দান্ত হইল । তাঁহারা সকলে আসিয়া রোগীকে দেখিয়া কৃত্রিম মলদ্বারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন । ক্রমে ক্রমে দান্ত হইতে লাগিল এবং অবশেষে নানাপ্রকার বিরেচক ঔষধ ও প্রবল পিচ্কারির ফলস্বরূপ উদরাময়ের অবির্ভাব হইল । প্রত্যহ ৭০।৮০ বার দান্ত হইতে লাগিল । মল তরল শুভ্রবর্ণ ও পুঞ্জসংযুক্ত । ডাক্তারি ঔষধ প্রায় মাসাবধি সেবন করান হইল । কোন উপশম না হইয়া বোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল । শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ সেবন করাতে উদরাময় আরোগ্য হইল । কবিরাজ মহাশয় সম্পূর্ণরূপ নির্দোষ করিবার নিমিত্ত ছয় সপ্তাহ কাল এক ঔষধ সেবন করান । কবিরাজ মহাশয় এক প্রকার জল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, রোগী কেবল সেই জল পান করিত । এইরূপ ছয় সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত ।

বনুটোলার জেনেরেল অফ্ একাউন্টস্ আপিসের চিফ্ ক্লার্ক, কলকাতাটোলা ।

আমার কোন আত্মীয় বালকের একটি উৎকট রোগ জগে ; বালকটি প্রতিদিন প্রাতে অজ্ঞান হইয়া দিবা ছুই প্রহরের সময় চেতনা লাভ করিত । অজ্ঞান অবস্থায় কোন কোন দিন নানাবিধ প্রলাপ বাকাও বণিত এবং হস্ত পদাদির আকার কেমন একরূপ বিকট করিয়া ফেলিত । এইরূপে ছুই বৎসর কাল রোগ ভোগ করিয়া তাহার শরীর অকক্ষণ্য হইয়া যায় । ইহার চিকিৎসার জন্য প্রধান প্রধান ইংরেজি চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতে ঔষধাদি প্রয়োগ করা হয় । কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারায় আমরা তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে বালকটিকে সমর্পণ করি । ঐশ্বর্যেচ্ছায় অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বিচক্ষণতা ও চিকিৎসা-কৌশলে বালকটি আরোগ্য লাভ করে । এইরূপ অদ্ভুত চিকিৎসা প্রায় দেখা যায় না ।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

২৩ শে জাহুয়ারি

অরিএন্ট্যাল সেমেনারির সম্পাদক ।

সন ১৮৮২ সাল

কলিকাতা ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়—

প্রিয় মহাশয়,

(১) কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রীতি করিতেছি যে আমি বাতরোগে আক্রান্ত হইলে যখন সমুদয় চিকিৎসার উপায় ব্যর্থ হইয়াছিল, তখন মহাশয় ঐকান্তিক যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন । আপনার ঔষধগুলি অব্যর্থ ও আপনার চিকিৎসাও আশু-প্রতিকারক ।

(২) আমার পিতা শ্রীযুক্ত নীলকান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিবস হইতে অগ্নিশূল পীড়ায় কাতর ছিলেন, পশ্চাৎ রক্তাশায় দেখা দিলে যখন ডাক্তার মহাশয়ের এককালীন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন মহাশয়ের সাহায্যে তিনি মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ।

একান্ত বশতঃ

শ্রীযত্ননাথ বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুজ বাজ ।

আম'র অনেক আত্মীয়ের পাথের স্থানে স্থানে ক্ষীত হইয়া থাকিয়া উঠে । তাহাতে প্রথমতঃ ডাক্তার দ্বারা অস্ত্র করিয়া ঔষধাদি ব্যবহার করা হয় । কিন্তু তদুপায এককালে আবোগা না হইয়া পুনঃ পুনঃ এক এক স্থানে ঐকপ হইতে থাকে । পরে সেই সকল ক্ষেপক হইতে প্রাভাবিক পুঁথ ও রক্ত নির্গত না হইয়া তাহা গভীর ক্ষতরূপে পরিণত হয় এবং তাহার চতুর্দিক কৃষ্ণবর্ণ ও বিকৃত আকার ধারণ করে । তাহাতে রক্তদূষিত ক্ষতের ন্যায় বোধ হয় । ঐ আত্মীয়ের পিতার পারদ-দোষে শরীরে নানাস্থানে ক্ষত হইয়াছিল, এবং অনেক বৎসর ডাক্তারি চিকিৎসা ও নানাবিধ ঔষধ সেবনান্তে পরিণামে তাহাতেই তাঁহ'র মৃত্যু হয় । সেই সামাজিক ঠেপড়ক পীড়া সম্বন্ধে বর্ণিত দেখিয়া আবোগা-লাভের পক্ষে আশঙ্কা হয় । বিশেষতঃ, ইউনে'পায় ঔষধের উপর নির্ভর করিতে সাহস হয় না । তজ্জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে চিকিৎসা-ভার অর্পিত হয় । কয়েক মাস তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিয়া রোগী ক্রমশঃ প্রতিকার বোধ করেন । পরিশেষে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার সুদক্ষতায় ঈশ্বরের কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত

কলিকাতা

খাঁটুরা স্কুল ও ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদক ।

২৬ শে মাঘ । ১২৮৮

গোবরডাঙ্গা ।

তুই বৎসর অতীত হইল প্রসবান্তে আমাব জী দারুণ স্মৃতিকা-রোগে অতি-অল্প-কাল-মধ্যে শয্যাশায়ী হইলেন । সাধ্যমত ইংরাজী চিকিৎসার কিছুই ফল হয় নাই । একপ অবস্থায় যখন আমি দিগ্ভ্রাস্ত্র জনের চায় ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, এমন সময়ে আপনি প্রকৃত বন্ধুর চায় প্রথমতঃ সুপারামর্শ-দান ও তৎপরে সূচিকিৎসা দ্বারা অকাল মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন ।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী

বোর্ড অব রেবেনিউ ।

To

THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Calcutta.

Dear Sirs,

Thank God, I am now blessed with an opportunity of expressing publicly the true faith and implicit confidence I entertain for the principles of the Ayurvedic treatment. It is to be admitted on all hands that in these days the number of men who deplore their own ignorance in hitherto disregarding the native system of treatment is fast increasing. But I am afraid it is too late now, as the indented Western medicine has already told so much upon our constitutions that it would take many long years to repair.

In two of the most serious cases among my family, in which nearly all of the best known Allopathic Doctors practising in this city, both Native and European, miserably failed after long and wearied trial, Babu Hari Prasanna Sen Kaviraj, the worthy son of the illustrious Kaviraj G. P. Sen of Koomartooly, showed an admirable proficiency in his profession, and his medicines acted miraculously:—in a case of 'POLYPUS of two & a half years' standing, during which period the attack came nearly every week notwithstanding all the means employed by the *Pantalooned* professors, Hari Prasanna Babu prescribed a certain medicated oil for application in the nostrils which cured the disease once for all; and a case of Remittent fever of a serious type, which used to prevail twice in 24 hours, was completely overpowered by a few pills prepared by him, and the patient restored to health in a week. All the *encomium* due to a worthy physician is what words fail to describe. Kaviraj H. P. Sen's keen sense of detecting diseases is worthy of his breeding under so distinguished a parent—his ability in appropriate selection of medicines is praise worthy—and his courteous affability towards patients and people in general is above all praise.

Ever since I have availed of the same medical aid always, and I am well convinced of its usefulness and efficacy. Looking to the progress of the system of the Ayurvedic principles at your hands and the ground they have gained in competition with the Allopathy so strongly supported by Govt. and the growing tendency of the time-taught people to avail themselves of them—although I do not pretend to be either a philosopher or a prophet—I can emphatically assert that those who live after a quarter century more (old as I am) to see, will be happy to find—apart from outdoor practice—the College Hospital itself less frequented by natives.

37 Kasi Mitter's Ghat street, } Yours faithfully
Calcutta, the 10th May 1885. } Kali Coomar Banerjee.

TO THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI".

Dear Sirs,

I hope you will be good enough to make room, in one of your muchesteamed journals, for the few lines I offer to the public by showing what a decided superiority and efficaciousness do the Aurvedic medicines of indigenous herbs possess over the labelled bottles of Allopathy and infinitesimal doses of Homeopathic medicines of recent inventions.

A member of my family had been a prey to the malignant type of chronic dysentery accompanied with acidity and fever. At the very beginning of the illness, he was, as a matter of course, placed under an Allopathic Physician of vast experience; the treatment lasted for a few months with little or no hope of recovery. The patient was reduced to mere skeleton, and worst symptoms gradually began to appear. The treatment was consequently changed to that of Homoeo: but unfortunately with the same effect. So we began to lose every hope of his recovery.

At last a friend of mine, advised me to try *Ayurvedic treatment*, which I was obliged to do under Kaviraj Hari Prasanna Sen. of Koomartooly. But what was our astonishment and

the pleasure of the patient when, after the medicines have been used not more than a week or so, all the evil symptoms began to disappear, and he was thoroughly cured within a few days.

No 4 Gosain's Lane,
Calcutta, the 11th May 1885. }

Yours faithfully
Naba Krishna Goswami

TO THE EDITOR OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI"

Dear Sir,

I congratulate myself upon having found this occasion to testify to the wonderful efficacies of your Ayurvedic medicines and to express as well, my sincere and deepfelt gratitude, which I owe to Kaviraj Bhagabati Prasanna Sen, for the life of a dear relation. My aunt had been suffering from a malignant type of Dysmenorrhoea, attended with excruciating pain in the region of abdomen, and long and constant hysterical fits. No pains were spared to give her, during the period, the best medical aid procurable both Allopathic and Homoeopathic, but without any effect. At last when the disease threatened to terminate fatally,—hands and feet *oedematous* and *general anaemia* prevailing—that she was given up by her medical attendants, some of the leading practitioners of the town, as a hopeless case. As a last resource, so as to leave no room for regret, I applied to the Ayurvedic system of treatment and placed her under the treatment of Kaviraj Bhagabati Prasanna Sen, and the effects were simply miraculous. In three weeks' time all the bad symptoms disappeared and in three weeks more she was all right, no trace of the disease being left.

She is now in the enjoyment of perfect health, and never since, (it is now about (8) eight months,) she has been unwell. Her cure is an instance of the innumerable triumphs achieved daily by our Ayurvedic treatment over other forms of scientific treatment, and I confidently hope that our friends and countrymen would do well to give preference to our own ~~medical sciences~~ before

others, and reap the benefit of it. But alas ! in these days of blind faith in the western civilization, no amount of evidences, I fear, but bitter family experiences will teach us to value the suitability of our native medicines to native constitutions, before foreign ones. With high respect for your patriotic efforts—

Kushtiya. I remain, Dear Mr. Editor, your most obdt. svt.
the 25th April 1885. Paresh Nath Sarkar, B. A.,

To

THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Calcutta, the 10th May 1885.

Dear Sirs,

I feel much pleasure to inform you that my wife fell sick on her child-bed with copious discharge of blood and faintness through exhaustion. Accordingly I called at a doctor of the Cotton street ; he finding it a serious case advised me to bring a better surgeon. So one of the best surgeons of the town and several other doctors with a midwife were called and attended my wife. She was delivered of a dead child ; and simultaneously had an attack of prolaptic fever attended with free discharge of blood, which the utmost efforts of the doctors could not relieve. So after some days seeing her gradually worse and worse, I was advised by some of my friends to call in the aid of Kaviraj B. P. Sen for native Ayurvedic treatment. Under his treatment she rapidly recovered within eight days, and ever since she has had no complaints whatever. I had several other cases treated by him with uniform good results.

I bring to you my firm faith in the Ayurvedic form of treatment, and would confidently recommend the general public to treat cases such as above through the Ayurvedic treatment, and hope the result shall be crowned with success.

No 8 Mullick street,
The 10 May 1885.

Yours truly

Muralidhar Kshetty, Banker.

To

THE EDITOR OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Dear Sirs,

It affords me the greatest pleasure to inform you that my daughter, who was suffering from an obstinate attack of fever with the complication of liver complaints, and was put under the treatment of good Allopathists of this vast Metropolis without any good result, has now perfectly recovered her health under the judicious treatment of Babu Bhagabati Prasanna Sen according to the principles of the Hindu Medical Science. This has led me to believe that the native way of treatment is more suitable to us (the natives) for more reasons than one, and that if our countrymen invoke the aid of the Ayurvedic system of treatment instead of putting themselves under the treatment of the Western system of Medical science, they can easily derive benefit at a less cost and risk.

12-5-85

Cossipore.

}

Yours faithfully

Haridas Mitter.

To

THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI,"

Calcutta.

Dear Sirs,

I am very happy to avail myself of this opportunity of expressing my heartfelt sympathy for the native Ayurvedic treatment, which I have, on more than one occasion, tested the unimpeachable proofs of.

Recently my mother had an attack of a violent brain disease and the case was given up as hopeless by the eminent Allopathic and Homeopathic practitioners of the day. But fortunately in making it over to our native treatment under Kaviraj Hari Prasanna Sen of Koomartooly she has since been all right. I have many other test cases to cite, but they would be too long to be included in your esteemed journal.

There are very few cases, in which I took to the aid of Allopathy or other systems prevailing in this country, up till now. Although my opinion will not at all be an authoritative one in a matter like unto this, yet I shall not hesitate to admit that, born as I am in a Vaidya family, I have never been half disposed to think of the admirable efficacy of our own family profession until prevailed upon to drive away the evil notion by Kaviraj H. P. Sen's proficiency.

20th May 1885.

Yours faithfully
Kaly Dass Gupta.

To

7-4-1885.

Kaviraj Hurry Prasanna Sen.

EDITOR OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Dear Sir,

With much pleasure I beg to inform you that my wife suffered from a severe attack of dysentery after delivery, and she was under the treatment of the well known Alopahic and Homeopathic Assistant.—Surgeons of the metropolis for a period of 8 months but without any effect. At last when the case became hopeless, I was advised by some of my friends and relatives to put my wife under the treatment of native physicians. I express my hearty pleasure to say that under the treatment of Kaviraj Bhagabati Prasanna Sen of Koomartooly she got rid of the disease in a month and she is now free from all complaints. Since then I have full faith in the Kaviraji treatment and I never take the help of Allopathy or any other treatment any more when any one of my family is severely ill, for I always find the treatment efficacious.

Yours faithfully
Nritya Gopal Bose,
Accountant, Asiatic Society of Bengal.

মান্যবর শ্রীযুক্ত আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেয়ু ।

মহাশয়,

কিছুদিন গত হইল আমার রক্ত প্রস্রাব, ভলপেটে বেদনা ও ধোরতর জ্বর হইয়াছিল । আমি প্রথমে স্থানীয় প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথি ডাক্তারের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকি । কিন্তু তাহাতে পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অবশেষে তাঁহারা বলেন যে, পেটের ভিতর ক্ষেটক হইয়াছে, উহা শীঘ্র আরোগ্য হইবার নহে । তাহাতে আমি মহা ভীত হইয়া কোন বন্ধুর পরামর্শে শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসন্ন মেন করিবার মহাশয়ের নিকট আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অবলম্বন করি । এবং তাঁহার চিকিৎসা বলে প্রথম তিন দিবসের মধ্যে জ্বর ও বেদনা একেবারে নিঃশেষ হয় এবং রক্তও অনেক পরিমাণে কমিয়া আইসে । তৎপরে এক সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করি । ইতি ।

যুঁওড়ি ।

২০ শে মে ১৮৮৫ ।

বশস্বত

সেখ আমীরুদ্দিন ।

কলিকাতা ।

আহিরীটোলা ।

১ লা জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ ।

সাত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, আমার জী সংকট গ্রহণী এবং স্মৃতিকা বোগে আক্রান্ত হইয়া উক্ত দীর্ঘকাল যাবৎ নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন । গত শারদীয়া পূজার পূর্বে রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, জীবনের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে । সাত বর্ষের মধ্যে ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক গুলি খ্যাতনামা হোমিওপেথি এবং এলোপেথি চিকিৎসক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন । এক এক সময়ে ক্রমান্বয়ে কয়েক মাস কাল এক এক চিকিৎসকের অধীনে রোগীকে রাখা হয়, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, রোগী কোন কোন ঋতু বিশেষে ছই এক মাসের মত কিছু শ্রুত থাকিলেও রোগটী ক্রমে রোগীর উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া যায় । শেষে হোমিওপেথি বা এলোপেথি ঔষধে আর কোন ফল দর্শন না ।

অবশেষে কতিপয় মিত্রের পরামর্শে সুবিধাত্ম চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ভগবতী
 ঐগয় মেন কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করি।
 কবিরাজ মহাশয় প্রাচীন আয়ুর্বেদপ্রণালীমত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া,
 কয়েক মাসের মধ্যেই রোগ একেবারে নির্মূল করিয়া দিয়া, রোগীকে পূর্ণা-
 বস্থার ন্যায় মনন এবং সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। যে রোগী পূজার পূর্বে
 শয্যাশায়িনী ছিল, যাহার দিবা রাত্রিতে ১০।১৫ বার—সময়ে সময়ে ২০।২৫
 বার ভেদ হইত, এমন কি উদরের বেদনা ও জ্বর সত্ত্বে যে রোগীকে আক্রমণ
 করিয়াছিল, সে রোগী যে মাতবর্ষকাল নিতান্ত কষ্ট ভোগের পর এক্ষণে সম্পূর্ণ
 আরোগ্য হইবে, ইহা অমেও ভরসা করা যায় নাই। এ দেশীয় রোগীদিগের
 পক্ষে এ দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী—ঔষধাবলী যে সম্পূর্ণ উপযোগী ইহা
 বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। আমার ন্যায় অনেকেই জমাফ হইয়া, বিজাতীয়
 চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে,
 জাতি সাধারণে যদি বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় না লইয়া প্রথম হইতেই
 দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় লয়েন, তাহা হইলে, সাধারণে নানা রোগস্বত্রে
 যে মহাকষ্টসম্ভোগ করিয়া থাকেন, যে বহুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, সে কষ্ট
 ভোগ ও সে অর্থ ব্যয় কখনই করিতে হয় না। আমাদিগের দেশের জল
 এবং বায়ু আমাদিগের শরীরের অবস্থা অনুসারেই পূর্বতম ঔষিগণ ঔষধাদি
 আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বিজাতীয় চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধ
 আমাদিগের ধাতু এবং আমাদিগের দেশের উপযোগী নহে, ইহা আমরা
 বুঝিতে পারিলে, যে কেবল দেশীয় চিকিৎসার আবার অভ্যাস হইতে
 পারিবে এমত নহে, আমরা নিজে অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য সুখ এবং
 দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিব। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে যে মহান
 সত্য এবং অজ্ঞাত তথ্য নিহিত আছে, তৎসমস্ত অবশ্যই চিরকাল
 জগতের উপকার সাধন করিতে থাকিবেই। কৃতবিদ্যা সাধারণের পক্ষে
 বর্তমান সময় হইতেই দেশীয় চিকিৎসার প্রতিক্রিয়ার জন্য সাগ্রহে অগ্রসর
 হওয়া কর্তব্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সচিব রাজস্থান-অম্ববাদক, সংবাদ প্রভাকর-সম্পাদক।

(ক্রমঃ)

শ্রী

সমালোচনা ।

দেশের মাঝে যশ কিনিতে সকলেরই সাধ । কিন্তু সকলের
পক্ষে সে সাধ মিটে না । স্বযোগ, উপায়, পন্থা সকলের অদৃষ্টে
লকল মগয়ে ঘোটে না । তবে একটা মাত্র সহজ উপায় আছে—
গ্রন্থকার হওয়া । গ্রন্থকার হইতে পারিলে, চিরদিন অমর হইতে
পারা যায়, কীর্তিস্তম্ভটাও অক্ষয় হইয়া থাকে । এই জন্যই আজ
কাল দেশের অধিকাংশ লোককেই আমরা সেই সহজ উপায়ে যশ
কিনিবার জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাই । অলি গলি ছাপাখানা, ছাপাই-
বার মূল্য দিলেও চলে, না দিলেও চলে । বইগুলো ওজন দরে বেণের
দোকানে চলিয়া যায়, সূতরাং মুদ্রাকর কতকটা পারিশ্রমিক
পাইবার আশা রাখে । কাগজের জন্যও বড় একটা চিন্তা করিতে
হয় না । পাড়ারগায়ের দুই একজন ‘দেশহিতৈষী’ জমীদারকে
মুরব্বি খাড়া করিয়া তাঁহাদিগের নামে গ্রন্থখানা উৎসর্গ করিতে
পারিলে, তাঁহারাও ভাবেন যে, জগতে আসিয়া একটা কাজ
করিয়া যাইলাম । সূতরাং তাঁহার। গ্রন্থকারদিগের উৎসাহবর্দ্ধন
জন্য যৎকিঞ্চিৎ রজত মূল্য দান করিতে ক্রটি করেন না । আমল
কথা—কি বিষয় লইয়া বই লেখা হইবে ?—সে চিন্তাটাও বড়
দরকার হয় না । ব্যাকরণ জ্ঞান থাক বা না থাক, ভাষার সহিত
কোন পুরুষে সংস্রব থাক বা না থাক, ছাপার অক্ষর যখন আছে,
তখন বই লিখিবার ভাবনা কি ? অক্ষরে অক্ষরে কথা সাজাইতে
পারিলেই বই লেখা যায় । তবে কি বিষয়ে বই লেখা যাইবে,
এ কথাটা উঠিতে পারে । কিন্তু তাহারও সহজ উত্তর আছে ।
গ্রন্থকার মাত্রই যে নিজের ঘট হইতে কিছু আদিম জিনিস দিতে
বাধ্য এমন কোন বিধি নাই । আসলের নকল—নকলের নকল—
ভস্য নকল যাহা কিছুই গ্রন্থকার আপন ইচ্ছামত প্রকাশ করিতে

বা লিখিতে সমর্থ । ইণ্ডিয়ান পিনামকোডে ত্রিবারক কোন বিধি নাই । বাঙ্গালাভাষা বেওয়ারিস, স্মৃতরাং কথা কহিবে কে ? কহিলেও শুনে কে ? এক পাঠকেরা দুই একটা কথা কহিতে পারেন, অসম্ভাষ জানাইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারই পাঠকদিগের কোন ধার ধাবেন না । পুস্তক বিক্রয় হউক বা না হউক, লোকে পাঠ করুক বা না করুক, গ্রন্থের আবরণীতে গ্রেট অক্ষরে গ্রন্থকালের নামটা ছাপা হইলেই হইল । তাহা হইলেই তিনি চতুর্কণ্ঠেব ফল পাইলেন । তবে এক সমালোচকদিগের আলা আছে, কিন্তু সে আলা তাঁহারা সহ্য করিতে চাহেন না । সমালোচনার জলন্ত অনলে মুখ পোড়াইতে শতকরা ৯৯ জন অসম্মত । এককাল কেবল নাটক, নবেল, উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতি আবর্জনাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, এখন আবার আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার সেই আবর্জনা-রক্ষি করিতে সাগ্রহে অগ্রসর । সাধারণ গ্রন্থকানদিগের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র পুত্তিগন্ধে পূর্ণ হওয়ায়, জাতীয় আশ্রয় যদিও ক্রমে বিকৃত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করিবার ভাব আমাদের সাহিত্যবিষয়ক সাময়িক সহযোগীদিগের উপর অর্পিত । তবে আজকাল আর যে এক নুতন শ্রেণীর গ্রন্থকান-রূপ পঞ্চপাল চিকিৎসাক্ষেত্রে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের প্রতিই আয়ুর্কেদ সঞ্জীবনী তীব্রদৃষ্টি দান করিতে বাধ্য ।

আজকাল চিকিৎসক গ্রন্থকান শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে । বাহ্য দৃশ্যে এটা উন্নতির চিহ্ন । সেই সকল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, মহান্ এবং প্রশংসনীয় । সকল বিজ্ঞান অপেক্ষা চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । মানব সমাজের শান্তি মুখ স্বাস্থ্য জীবন যে বিজ্ঞানজড়িত, সেই বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিদান সর্বদো প্রার্থনীয় । যাহারা সেই বিজ্ঞানের উন্নতি

সাধনে যত্নপর, তাঁহারা আমাদিগের শতধন্যবাদের পাত্র । কিন্তু নিত্যান্ত দুঃখের বিষয়, সেই চিকিৎসক গ্রন্থকার শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এক্ষণে হিত করিতে গিয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া বসিতেছেন । অতি পুরাকালে চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে যে সে চিকিৎসক কখনই সহজে অগ্রসর হইতেন না । ক্ষমতা থাকিলেও অনেকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না । না করিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতেন যে, চিকিৎসা গ্রন্থের সহিত যখন জীবন মরণ বিজড়িত, যখন মহত্ব মহত্ব মনুষ্যের প্রাণ এবং স্বাস্থ্য লইয়া কথা; তখন মহা সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা কর্তব্য নহে । অসক্রেমে বা কোন বিষয়ে একটু মাত্র অনভিজ্ঞতা ক্রমে গ্রন্থ মধ্যে কোন বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ হইলে মহানিষ্ট সম্ভাবনা । সুতরাং গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সুচিকিৎসক হইবার জন্য যত্ন করাই নিহিত । আমাদিগের দেশের পূর্বতন ঋষিগণের ন্যায় পাশ্চাত্য জগতের মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসকগণও মহা কোন গ্রন্থ লিখিতেন না বা আজিও লিখেন না । যাঁহারা শিক্ষা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, এবং অভিজ্ঞতাবলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের প্রতিভাশালী, যাঁহারা চিকিৎসাজগতের নব নব তথ্য আবিষ্কর্তা, তাঁহারা জগতের উপকারসাধন জন্য গ্রন্থাবলী লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যুরোপের সেই শ্রেণীর লোকেই এক্ষণে চিকিৎসাবিসয়ক গ্রন্থ লিখিতে যত্ন করেন । কিন্তু আমাদিগের দেশে যাঁহারা চিকিৎসকদিগের অগ্রণী, তাঁহারা আজি পর্য্যন্ত যে কোন চিকিৎসা বিষয়ক নূতন আদিম গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত নহেন, যাঁহারা অজাতশত্রু যুবক, যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যার ক'খ মাত্র পাঠ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের জ্ঞান কেবল গ্রন্থ-গত, তাঁহারা কেবল অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিবার জন্য গ্রন্থকার

মূর্তিতে দর্শন দান করিয়াছেন । ইহার ফল যে অতি ভয়ানক হইতেছে, তাহা বলা বাতুল্য । তাঁহাদিগের মৌলিকতা শু কিছুই নাই, কেবল অনুবাদ দ্বারা আবদানী কীর্তি ব্যাখ্যাতব্য । ভাষা এবং ব্যাকরণজ্ঞান না থাকায়, তাঁহাদিগের রচিত অনুবাদ তুলিও বিকৃতমূর্তিতে দর্শনদান করিতেছে । ভাষান সহিত—ব্যাকরণের সহিত যাহাদিগের কোন কালে দেখা সাক্ষাৎ নাই, তাঁহারা যে শিব গড়িতে মানব গড়িবেন, ইহাও বিচিত্র নহে । কিন্তু এরূপ হইতে দেওয়া কি কর্তব্য ? একজন গ্রন্থকানকপে যশ কিনিতে ব্যস্ত, আর তাহার সেই গ্রন্থমত পাড়ারগ্নয়েব একজন হাতুড়ে চিকিৎসক, চিকিৎসা করিতে গিয়া, শত শত লোকের জীবন ধ্বংস করিতেছে, ইহা কি প্রার্থনীয় ? একজন সামান্য আঘাত-কাণী যদি পিনালকোডেব ধারামত কারাগারে যাইবাব পাত্র হয়, তাহা হইলে একজন অনভিজ্ঞ অনশিক্ষিত ভাসাজ্ঞানবিহীন অনিরাশী কীর্তিপ্রায়ামী চিকিৎসকের লেখনী-প্রসূত ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থমতানুযায়ী চিকিৎসাপুত্রে যদি অস্তুতঃ একজন লোকও মরে, তাহা হইলে সেই গ্রন্থকাব এবং সেই চিকিৎসক কি জীঘর্ষে সমাদরে গ্রহণের পাত্র নহেন ? রাজা বিদেশী, স্মৃতবার যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে ।

আমাদিগের দেশে নানাবিধ চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলিত । কিন্তু এলোপেথি চিকিৎসা বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত ১০।২০ খানার অধিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয় নাই । হকিমী চিকিৎসা বিষয়ে কোন বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহ । আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধে মৌলিক পুস্তক এক্ষণে একখানিও প্রকাশ হয় নাই, সকল গুলিই অনুবাদ । কিন্তু অজ্ঞাতশাস্ত্র ভাসাজ্ঞানহীন যুবক-গণের মধ্যেই অনেকে সেই অনুবাদ প্রচার করায়, সেগুলি জ্যোতি-হীন চক্ষের ন্যায়, গন্ধহীন পুষ্পের ন্যায় দেখা দিতেছে । সেই মত

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও আজ কাল একে একে অনেক পুস্তক প্রকাশ হইতেছে। এখন যেমন না পড়িয়া শুনিয়া দুই এক খানা ইংরাজি হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াই যে সে লোকে দুই দিনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইতে পারে, সেই মত দেখা যাইতেছে যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে যে সে লোকই ইচ্ছা করিলে বই লিখিতে পারে। সুতরাং দশের মধ্যে যশ কিনিবার পক্ষে ইহা বড় সমান্য সুযোগ নহে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে যে সকল মহামহোপাধ্যায় বাঙ্গালী যথেষ্ট যশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিলে সহজেই মাতৃ-ভাষায় হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ লিখিয়া একটা প্রধান অভাব দূর করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই নীরবে অবস্থিত। আর আমাদের আর্থ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অজ্ঞাতশ্রু অনুবাদকদিগের ন্যায় এক শ্রেণীর হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থকার দল প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের অধ্যকার প্রথম সমালোচ্য গ্রন্থখানি “নাড়ী বিজ্ঞান”। * নাড়ী বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে নাড়ী পরীক্ষাবিষয়ক অনেক রহস্য আসিয়া মনে উপস্থিত হয়। কোন্ দিনে এই নাড়ী তত্ত্ব হিন্দুপণ্ডিতগণ সম্যক অবগত হইয়াছিলেন; কোন্ দিন হইতেই বা তাঁহারা এই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু হিন্দুগণের অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইহাও সম্যকরূপে কাল নির্ণয় করা দুর্লভ। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় বৈদিক আয়ুর্বিদ্যার সময়ে এই জ্ঞান আমাদের ঋষিদের মনে উদ্ভাসিত

* নাড়ীবিজ্ঞান অর্থাৎ নাড়ী-পরীক্ষা-বিষয়ক কণাদসংহিতা, নাড়ীপ্রকাশ, প্রয়োগচিন্তামণি প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ হইতে শ্রীচন্দ্রকুমার দাস কবিরাজ কর্তৃক সংকলিত। কলিকাতা, জেনারেলপ্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত। ১৫১ নং চিৎপুর বোড। মূল্য ৮০ আনা। (হস্তে লিখিত) কলিকাতা, আহারীটোল।

হয় নাই। চরক সূত্রাত প্রভৃতি সূত্রাচীন বৈদিক চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ এবং রোগী পরীক্ষার প্রকরণ সমূহ পাঠ করিলেই আমাদের কথা সুপ্রমাণিত হইতে পারে। তবে ভাস্করিক সময়ে আখ্যা চিকিৎসকগণ এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এবং আজিও তন্ত্র-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, সূত্রপুস্তকের নিকট সম্যকরূপে উপদেশ গ্রহণ করিলে, উহার কতক অংশ সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তন্ত্র সাংকেতিক শাস্ত্র, ওকপদেশ ভিন্ন উহাতে দৃষ্টশ্রুতি করিবার সাধ্য নাই। কবিতাভের টোলম্পাণী ওরু পাঠ-শালার ছাত্র কিম্বা ডিম্পেন্সারিদর্শী ডাক্তারের ইহাতে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কাপালিকের উপদেশ চাই নির্দিষ্টাঙ্গন চাই। এত হইলেও এই বিদ্যা প্রসন্ন হয় কি না সন্দেহস্থল। স্মৃতরাং নিরক্ষর মুখদিগের হস্তে পড়িলে, ইহার কি দুর্দশা হয় সহজেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ উপদেশ এবং চর্চায় অভাবে এই বিদ্যা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

একদল দেশহিতৈষী আছেন, যাহারা এই অন্ধকারের খণ্ডোত, নিরাশাব আশা, বিলুপ্তের উদ্ধারকর্তা, তাহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র ।।। তাহাদের দেশ উদ্ধারের মূল মন্ত্র— দেশের অধঃপতন, নিজের উদর পূরণ, স্মৃতরাং দেশের অধোগতির স্রোতও অপ্রতিহত।

আজিকালি কেমনই একটা বৈজ্ঞানিক স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যে, যাহা কিছু হউক সকলই বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক নাম, বৈজ্ঞানিক ধাম, বৈজ্ঞানিক ধর্ম, বৈজ্ঞানিক কর্ম, কথা বৈজ্ঞানিক, লেখা বৈজ্ঞানিক—সবই বৈজ্ঞানিক। যাহার মুখে আনিবার ক্ষমতা নাই তিনিও বলেন অন্তত “বৈগানিক”। কালের কি ঘোবতর পরিবর্তন। যাহাদের সহিত বিজ্ঞানের “বি”র সম্পর্ক নাই, সেই বি- (বিগত) জ্ঞানের মুখে বিজ্ঞানের তরঙ্গ, আর গো-খাদকের মুখে

হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ । গ্রন্থের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি অল্পই প্রদর্শিত হইয়াছে, অথচ নাম “বিজ্ঞান” ।

এই সকল কারণে আয়ুর্বেদেব অধঃপতনের প্রতিক্রিয়ার এই উন্মেষ সময়েই ইহার শিবোদেশে বজ্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । সুতরাং এই অধঃপতিত দেশেব আব গঙ্গল কোথায় ? পাঠক ! বোধ হয় নাম দেখিয়াই বুঝিয়া থাকিবেন, যে, এই গ্রন্থখানি বিজ্ঞানের নামেই বিক্রীত হইতে চলিয়াছে । কিন্তু পাঠ কবিলেই বুঝিতে পারিবেন উহাতে “বৈজ্ঞানিক” তত্ত্ব কত আছে । এই গ্রন্থে সর্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই—“এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে শরীর উষ্ণ নাড়ী শীতল এবং শরীর শীতল ও নাড়ী উষ্ণ, ইহা কিপ্রকারে হইতে পারে ? মনে কর নাড়ীতে অধিক পরিমাণে তেজ থাকিলে তত্রস্থ শোণিতও উষ্ণ হইবে । সুতরাং উষ্ণ রক্তের বলে নাড়ী অবশ্যই তীব্র বেগে স্পন্দিত হইবে । অতএব নাড়ীর গতিব দ্বারাই উহার উষ্ণত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । পক্ষান্তরে যদি নাড়ীর গতি মৃদু অর্থাৎ শ্লোঘা-জনিত গতিব ন্যায় গতি হয়, তাহা হইবে গাত্র উষ্ণ থাকিলেও নাড়ীকে শীতল বলিয়া স্থির করিতে হইবে ।” পাঠক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি স্মরণ করিয়া রাখুন, মৃদু গতি—শীতল, তীব্র গতি—উষ্ণ । ভাল স্বর পরীক্ষা করিতে প্ররত্ত হওয়া যাউক ।

গ্রন্থকার লিখিতেছেন—‘শ্লোঘাভাবে নাড়ী সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, শীতল এবং মৃদুগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।’ পূর্বের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্মরণ থাকিলে পাঠক এখন মহা গোঃযোগে পণ্ডিত হইয়াছেন । শীতল এবং মৃদুত্ব পাঠক্য বুঝিতে না পারিয়াই হয়ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে (!) দিক্কাব দিতেছেন । নাড়ীজ্ঞানের দিকেত এখন পর্য্যন্ত যাইতেই পারেন নাই । আমরা বলি পাঠক ব্যস্ত হইবেন না । বিজ্ঞান অপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল । বাগ করিবেন না । গ্রন্থ রচয়িতার দ্বাদশ পৃষ্ঠা লিখিবার সময় যেরূপ ভাবে অপূর্ণ ছিল, সপ্তদশ

পৃষ্ঠা লিখিবার সময় ভাষা ভিন্ন মূর্তিতে পরিবর্তিত হইতে পারে । পূর্বে মৃদু শীতল এক ছিল, পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মৃদু শীতল বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । স্বতরাং রাগ করিতে হয় বিজ্ঞানের উপর করিবেন, গ্রন্থরচয়িতার উপর নহে । পাঠক ! গ্রন্থকারকে আর পরীক্ষা বিময়ে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তন্মধ্যে আর একটি গুরুতর কথা এই—গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—“বাতশ্লেষ্মা-শ্বরে এবং পিত্তশ্লেষ্মাশ্বরে নাড়ীতে পূর্কোক্ত প্রকার বায়ু ও শ্লেষ্মা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি অনুগিত হইয়া থাকে ।” গ্রন্থকারই পূর্বে বলিয়াছেন—“বাতশ্বরে তীব্র গতি, পিত্তশ্বরে, সজোরে (দ্রুতবেগে) স্পন্দিত হয়, শ্লেষ্মাশ্বরে মৃদু গতিবিশিষ্ট হয় ।”

এক্ষণে আমরাও পাঠকগণের সহিত একত্র হইয়া জিজ্ঞাসা করি, বাতশ্লেষ্মাশ্বরে বায়ু ও শ্লেষ্মার গতি দ্বারা নাড়ীর গতি কিরূপে নিরূপিত হইবে ? বাতের তীব্রগতি এবং কফের মৃদুগতি একাধারে কিরূপে উপলব্ধ হইবে ? এই মহা সমস্যা কে গীমাংসা করিবে ? লেখককে সঙ্গে সঙ্গে না পাইলে, ইহার গীমাংসার কোন পথ নাই । ফলতঃ সর্বৈব এলো মার্কণ্ডেয় গোল ।

কথাপ্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা বলিতে হয় । এক দিন পুস্তকখানি এক প্রান্তে পড়িয়া আছে, এক ব্যক্তি পুস্তকখানি লইয়া দেখিয়া আমাদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । যথা,—মহাশয় ! (১) “বায়ু বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর গতি ঘড়ীর দোলন দণ্ডের ন্যায় একবার এপাশ একবার ওপাশ ভাবে স্পন্দিত হয়,” ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে ? (২) “অঙ্গীর্ণে জলপূর্ণ ধমনীর ন্যায় কঠিন এবং মৃদু হয় ।” কঠিন মৃদু একাধারে কিপ্রকারে বুঝা যাইবে । (৩) “নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়, এবং কখন কখন উহা দোলায়মান হইয়া স্পন্দিত হয় ।” দোলায়মান হইয়া স্পন্দনটা কিরূপ ? এপ্রকার বহুসংখ্যক প্রশ্ন করিয়া

আমাদিগকে উদ্বিজিত করেন। আগরা বলিলাগ এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থকারের উপদেশ লউন। কাজেই তিনি অস্বীকার করিলেন। উপসংহার কালে উক্ত ব্যক্তি গ্রন্থের ছবিটি দেখিয়া আরও একটী বহুসংখ্যক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, “মহাশয়! ছবিটি কবিরাজ মহাশয়েব নিজের এবং তাহার রোগী, না, উহা বারইয়ারির কোন সঙ্কেত?” ইহা দ্বারাষ্ট পাঠক বুঝিবেন, পুস্তকখানি সাধারণের কিরূপ বুঝিবার উপযোগী হইয়াছে।

ভাগ এক বটতলার সরস্বতী লইয়া রথ। সময় নষ্ট করিতেছি এবং পাঠকদিগের চিত্তবৈকল্য জন্মাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে এই ডিগ্রাই ১২ পেজি ২৪ পৃষ্ঠা পুস্তকের সমালোচনা ২৪ কর্মায়ও সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। স্বতরাং আমাদের এই স্থানেই অবসর গ্রহণ করিতে হইতেছে। উপসংহারকালে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, নিজের জ্ঞান লাভ না করিয়া কেহ যেন পরকে অপণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করেন না। নিজের উদর পূরণের জন্য আয়ুর্নৈদের মস্তকে শানিত খড়া যেন প্রয়োগ না করেন। গ্রন্থকারকে তাঁহান সাধু উদ্যমের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু এ উদ্যম নিয়মাস্তরে নিযুক্ত হইলেই ভাল ছিল।

অষ্টকার দ্বিতীয় সমালোচ্য গ্রন্থখানির নাম “চিকিৎসা সাব সংগ্রহ”। * কিন্তু কোন্ প্রণালীমত চিকিৎসার সাব সংগ্রহ নাম, পাঠে তাহা সহজে জ্ঞান। যায় না। একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইহার সঙ্কলনকারী। তিনি নাম দেন নাই, ভালই করিয়াছেন। তাঁহার মে বুদ্ধিটুকু আছে, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। গ্রন্থখানি বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ভাষার দ্বারা বক্ষ্যমান বিষয় পরিস্ফুট হয়, অর্থের উপমাক্ষি হয়।

* চিকিৎসার সংগ্রহ, জটনক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কর্তৃক সংকলিত, শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১০ আনা।

ভাষা বিকৃত হইলে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য বা পাঠকের অভিজ্ঞান কোন কালেই স্ফুর্তি পাইতে পাবে না। ভাষাতেই জ্ঞানের সঞ্জীবনীশক্তি নিহিত রহিয়াছে। যে ভাষা বুঝা যায় না, তাহা দ্বারা কোন জ্ঞানও লাভ হয় না। মনের ভাব পশু প্রাভুতিও প্রকাশ কবে, কিন্তু উহার ভাষা আমরা বুঝি না, কাজেই তদ্বারা কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এজন্য কাহাকেও কোন কথা বুঝাইতে হইলে ভাষাটি বুঝিবার মত হওয়া চাই, ক চ ট প্রাভুতি শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলে, তদ্বারা কোন অর্থ লাভ হয় না। কারণ কেহ তাহার অর্থ বুঝে না। আগাদের এতগুলি কথা বলার আবশ্যক এই যে, এই গ্রন্থখানিও ঠিক উক্ত শ্রেণীর। গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ তাঁহার ভাষাই বুঝা যায় না। সুতরাং এ গ্রন্থ দ্বারা কি অর্থ উপপন্ন হইবে আমরা তাহা বুঝি না। যিনি নিজের মনের ভাব নিজের ভাষায় পরিষ্কৃত করিতে পারেন না, তিনি যে ভিন্নজাতীয় ভাষা, ভাষান্তরে নীত করিতে পারিবেন আমরা এরূপ ভরসাও করি না। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

“ক্রমে তাহা ভয়ানক হইয়া এ নামাক্রান্ত হইয়া থাকে,” “পিপাসা অগ্নে তুষ্ট হয় না,” “পিপাসা, জলশব্দের সহিত উদরস্থ হয়”। ইহা দ্বারা কিছু অর্থ বুঝিলেন কি ?

গ্রন্থকার কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ কথা লিখিয়াছেন, পাঠকের তাহা হৃদয়ঙ্গম করা শ্রুতিন। সপর্যায় অরের চিকিৎসাতে গ্রন্থকার আর্সেনিকের লক্ষণ লিখিয়াছেন। যথা,—

“আর্সনিক। উত্তাপের সময় অতিরিক্ত পিপাসা। কিন্তু শৈত্যাবস্থায় থাকে না। প্রাতে জ্বর হয়, অপরাহ্নে চলিয়া যায়। নাড়ী দ্রুত ১২০ হইতে ১৩৫ পর্য্যন্ত হয়। গতিকালে ঘর্ম্ম। কুইনাইন ব্যবহারের পর উহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।”

আগরা গ্রন্থকাবকে জিজ্ঞাসা করি, আর্সেনিকের নাড়ীর গতির স্পন্দনেব সহিত ‘একোনাটের’ নাড়ীর গতির কি প্রভেদ ? আর্সেনিকের জ্বরের সময়ের সহিত নক্সভগিকার জ্বরের সময়ের কি প্রভেদ ?

গ্রন্থকাব লিখিয়াছেন—“স্বভাবতঃ যত্নশ্রমত বস্তুতে আশা উৎসাহ ও সুখ নিহিত থাকে, পাঠকগণও উদারতা মার্জনা করিলে গ্রন্থকার অতি বিনীতভাবে তাহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পাবে।” “উদারতা মার্জনা করিলে” শব্দের অর্থ কি ? উদারতা কি একটা অপরাধ, তাহা মার্জনা করিতে হইবে ?

এইরূপ যিনি স্থায় ভাষাজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে যে কি আছে, পাঠকগণ তাহা বিলক্ষণ অনুমান করিতে সমর্থ। যাহার ভাষাজ্ঞান নাই, তিনি কি লিখিতে কি লেখেন, তাঁহার গ্রন্থ যে কিরূপ পদার্থ, তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। যিনি দশটা কথা লিখিতে পাঁচটা ভুল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি দুইহু চিকিৎসা শাস্ত্রের বিজ্ঞাতীয় ভাষায় লিখিত উক্তি গুলি অনুবাদ করিতে গিয়া কিরূপ অসকুপে পড়িতে পারেন, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে সমর্থ।

ফল কথা পুস্তক খানির বাহ্য দৃশ্য যেরূপ, অভ্যন্তরও সেইমত। এরূপ পুস্তক যত কম প্রকাশ হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

প্রাপ্তি-স্বীকার ।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনীৰ বিনিময়ে আমরা নিম্ন-লিখিত মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র ও পুস্তক পাইতেছি ।

(১) বাল্মব ২২৯১ মাল টেজ পর্য্যন্ত ।	(১৯) দৈনিক ।
(২) আৰ্য্যদর্শন ১ সংখ্যা	(২০) বর্ধমান-সঞ্জীবনী ।
(৩) নবজীবন-১২৯২ মাল জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত	(২১) পতাকা ।
(৪) ভারতী-১২৯২ মাল জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত	(২২) পরিদর্শক ।
(৫) নব্যভারত-১২৯২ মাল জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত	(২৩) সারস্বত ।
(৬) প্রচার ৩ সংখ্যা	(২৪) ঢাকাপ্রকাশ ।
(৭) জাহ্নবী, সহচরী ও বিজ্ঞানদর্শন ১২৯২ মাল জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত	(২৫) মথা ।
(৮) প্রবাহিনী	(২৬) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ।
(৯) Agriculture Gazette, May 1885.	(২৭) প্রভাতী ।
(১০) চিকিৎসা-সন্মিলনী, দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত ।	(২৮) সংবাদপ্রভাকর ।
(১১) ভারত ।	(২৯) সংস্কৃতচন্দ্রিকা ।
(১২) সোমপ্রকাশ ।	(৩০) বিদ্যোদয় ।
(১৩) নববিভাকর ।	(৩১) ধর্ম প্রচার ।
(১৪) Amritabazar Patrika	(৩২) শিল্প ও কৃষিপত্রিকা ।
(১৫) আনন্দবাজার পত্রিকা	(৩৩) সুরভি ।
(১৬) এডুকেশন গেজেট ।	(৩৪) সাধারণী ।
(১৭) বঙ্গবাসী ।	(৩৫) সময় ।
(১৮) সঞ্জীবনী ।	(৩৬) Indian Echo.
	(৩৭) কুশদহ
	(৩৮) Indian Press guide.

ক্রমঃ

বিজ্ঞাপন ।

কার্য্যবিশেষে বাধা হইয়া আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে । গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন । এবার সঞ্জীবনীতে চারিটা পৃষ্ঠা বেশী যোজনা করা হইয়াছে ।

শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ।

আয়ুর্বেদে উদ্ভিদ্ধিদ্যা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্বে এই বিদ্যা এদেশে তিন মহা অংশে বিভক্ত ছিল । তাহার এক অংশ কৃষি-নামে, অপরাংশ মালাকার-শাস্ত্র এবং অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ-শাস্ত্র অথবা রক্ষায়ুর্বেদ নামে অদ্যাপি পরিচিত আছে । বাস্তবপক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, ঐ তিন পৃথক শাস্ত্র নহে ; একই শাস্ত্র । প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য গণের দ্বারা এই মহান শাস্ত্র উল্লিখিত বিভাগে বিভক্ত হইয়া অবশেষে পৃথক বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে । এমত স্থলে, একে তিন অথবা তিনে এক, এরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব নহে । যাহাই হউক, আয়ুর্বেদ-গ্রন্থে উক্ত মহা অংশটিকে উত্তমরূপে বিস্তার ও বিশদ করিবার অভিপ্রায়েই আমরা “আয়ুর্বেদে উদ্ভিদ্ধিদ্যা” এই সবিশেষণ নাম অর্পণ করিয়াছি এবং সেই জন্যই পূর্বপ্রস্তাবে বলিয়াছি, আয়ুর্বেদীয় উদ্ভিদ্ধিদ্যা গর্ভকেশরের ও পরাগকেশরের কথা বলিবেন না । যাহা বলিবেন, তাহা আমরা যথাক্রমে ও সাধ্যানুসারে বাক্য করিব ।

উদ্ভিদ এক প্রকার স্থাবর জীব । প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিচার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, উদ্ভিদ নির্যীব পদার্থ নহে ; উহা এক প্রকার স্থাবর জীব । তাহাদের মতে জীব দুই প্রকার । এক স্থাবর জীব, অপর জঙ্গম জীব ।

“সেম্মিয়ং চেতনং প্রোক্তং নিরিল্লিয়মচেতনম্ ॥” চরক ।

যাহাদের ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, তাহারা চেতন ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ নামে অভিহিত হয় এবং যাহাদের ইন্দ্রিয় নাই, অভিব্যক্ত

মন নাই, তাহারা শ্বাবর ও অচেতন এই নাম দ্বয় ধারণ করে । এই কারণেই মহাত্মা রামচবুট বলিয়াছেন ;—

“উদ্ভিদঃ শ্বাবরা জীবাস্তৃণ্ডুশ্চাদিরূপিণঃ ।”

উদ্ভিদ সকল শ্বাবর জীব এবং তাহারা তৃণ ও শৃঙ্গ প্রভৃতিরূপে অবস্থিত । মহামহোপাধ্যায় হিন্দু পণ্ডিতেরা তৃণাদি শ্বাবর পদার্থকে জীব বলেন কেন ? জীববিশেষণে বিশেষিত করেন কেন ? তাহা আমরা অন্য এক স্থানে বর্ণন করিব । ফলতঃ, হিন্দু পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্বাবর মধ্যে সজীব ও নিসজীব এই দ্বিবিধ ভেদ বা বিভাগ আছে ।

লীনীয়সু নামক জনৈক ইউরোপীয় উদ্ভিদজ্ঞবিৎ জগতের সমুদায় পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ,—এই নাম ত্রয় প্রদান করিয়াছেন এবং বিভাগের কারণ বা লক্ষণভেদ নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

১। প্রাণিগণ চেতন, তাহারা বদ্ধিত হয়, নির্দিষ্ট কাল জীবিত থাকে; এবং সুখ দুঃখাদি অনুভব করে ।

২। আকরীয়া অর্থাৎ খনিজ পদার্থ সকল অচেতন; তাহারা কেবল মাত্র বদ্ধিত হয় ।

৩। বৃক্ষাদি ভৌম-পদার্থ সকল উদ্ভিদ; তাহারা বদ্ধিত হয়, এবং নির্দিষ্টকাল জীবিত থাকে ।

ইউরোপীয় পণ্ডিত লীনীয়সু উদ্ভিদ জাতির নির্দিষ্ট কাল জীবিত থাকার কথা বলিলেন কিন্তু তাহারা সুখ দুঃখ বোধ করে কিনা তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে সাহস করিলেন না । যাহাই হউক, তিনি যখন উদ্ভিদ জাতির জীবিত থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা যখন সর্বলোকেই প্রত্যক্ষগম্য হইতেছে, তখন আর কেহই বোধহয় এই মহাজাতিকে জীবনশূন্য বা নিসজীব পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন না । ইহাদের ইচ্ছা না থাকিতেও পারে,

অভিব্যক্ত মন না থাকিতেও পারে, স্বতরাং ইহার। অথ দুঃখবোধ শূন্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহার। আকরীয় পদার্থের আয় জীবন শূন্য বা নির্জীব নহে ; ইহা সর্ববাদিসম্মত সংসিদ্ধান্ত । *

উদ্ভিজ্জ-জীবের জাতি ও শ্রেণীবিভাগ ।

অন্যান্য জীব বংশের ন্যায় উদ্ভিদ বংশও বিশাল ও বহুবিস্তীর্ণ । সেই জন্যই এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । বর্গের বহুত্ব থাকিলে, তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা বা উপদেশ প্রদান করিবার জন্য প্রথমতঃ নির্দিষ্টতর লক্ষণ, চিহ্ন বা সৌগাৎশ্য অনুসারে তন্মধ্য হইতে শ্রেণী, জাতি, বর্গ, গণ, ইত্যাদি বহুপ্রকার বিভাগ করণ করা যাইতে হয় । অন্যথা, সেই সেই বংশের স্বভাব বা বিশেষ বিশেষ ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম করান যায় না । যদি প্রত্যেকের বিবরণ উল্লেখ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অনন্ত-কালেও শেষ হয় না । কিন্তু যদি জাতি ও গণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিভাগ স্থিরীকৃত করিয়া সেই সেই বিভাগের সাধারণ্য ও বৈধর্ম্য জ্ঞানগম্য করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বারা সহজে ও অল্পকালে সেই সেই ব্রহ্মতর জাতির গুণাগুণ ও জাত্যাতি বোধক ধর্ম জ্ঞানগোচর করা যাইতে পারে । পূর্বতন ঋষিরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া উদ্ভিদ সকলের অত্যন্ত পৃথক বা বিভিন্ন ধর্ম সকল সমাহরণ পূর্বক উদ্ভিদ জাতিকে প্রথমতঃ পাঁচ মহাবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । যথা, —

- ১ । বৃক্ষ ।
- ২ । গুল্ম ।
- ৩ । লতা ।
- ৪ । বর্ষা ।
- ৫ । তৃণ ।

* উদ্ভিদজীব অথ দুঃখ অনুভব করে কি না তাহা অন্য কোন প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করা হইবে ।

ইয়ুরোপীয় নব্য উদ্ভিদেত্তারা প্রথমতঃ সমুদায় উদ্ভিদের সম্পৃক ও অপূষক এই দুই মহাভেদের উল্লেখ করিয়া তাহাদেরই অংশখ্য অবাস্তর প্রভেদ বর্ণন করিয়াছেন সত্য; পরন্তু আমাদের দেশের পুরাতন পণ্ডিতেরা এই দুই মহা লক্ষণকে যাবস্ত উদ্ভিদের ভেদক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, সম্পৃক ও অপূষক এই দুই লক্ষণ স্বক্ষজাতীয় উদ্ভিদের ভেদক ধর্ম; বংশ সাধারণের নহে *। পুষ্পঘটিত লক্ষণটিকে বংশ সাধারণের ভেদক করিতে গেলে অবাস্তর বিভাগ গুলি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং সম্মূর্ছন জাত ছাতা ও ঘাস প্রভৃতি স্থলে উক্ত লক্ষণের ব্যভিচার অথবা অসমাবেশ ঘটনা হয়। সম্মূর্ছনজাত ঘাস প্রভৃতি তুচ্ছ ভূণ জাতি পুষ্পের অথবা পুষ্পাভাবের জ্ঞানের দ্বারা পরিচিহ্নিত নহে। কাষে কাষেই বলিতে হইয়াছে, উক্ত দ্বিভেদক লক্ষণ নিতান্ত সংকীর্ণ।

স্বক্ষ—এই বিভাগটী সর্বপরিচিত।

শুল্ম—যাহাদের কাণ্ড নাই তাহারা শুল্ম। †

লতা—প্রসিক্ত।

বল্লী—যে জাতীয় লতা শাখাদির দ্বারা ভূতলে বিস্তৃত হয়।

ভূণ—ঘাস জাতীয়।

অবাস্তর জাতিবিভাগকালে এই সকল মূল জাতির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইবে।

কি অনুসারে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার প্রধান বিভাগ প্রকল্পিত হইয়াছে তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্ব বিশারদগণ যদিও উক্তপ্রকার বিভাগ, কল্পনার কোনরূপ প্রণালী বর্ণন করেন নাই; তথাপি, সেই সেই বিভাগের পর্যায়

* “বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাণ্ডৈভিরপুষ্পাধনস্পতিঃ।” বনৌষধিকাণ্ডে দেখ।

† অত্রিকাণ্ডে স্বল্পশুল্মো। [বনৌষধিবর্গে দেখ।

শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা অর্থাৎ জাতি, গুণ ও ক্রিয়া ঘটিত নামের দ্বারা প্রণালী বা পদ্ধতি সকল সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, উদ্ভিদের বিভাগ কল্পনা কতক ধর্মাস্বয়মূলক, কতক সৌমাদৃশ্যমূলক, কতক বা প্রাকৃতিক-গম্বন্ধমূলক।

ধর্মাস্বয়।—এমন কোন গুণ বা ধর্ম আছে যাহা পরস্পর বিরুদ্ধাকার উদ্ভিদে তুল্যরূপে অনুগত থাকে। এবম্বিধ ধর্মাস্বয় দেখিয়া, অনেক গুলি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

সৌমাদৃশ্য।—আকার প্রকারে কি কোন এক অংশে সাম্য থাকায়, তদনুযায়ী বিভাগ সকল সাদৃশ্যমূলক বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক গম্বন্ধ।—উদ্ভিদপ্রকৃতি বা উদ্ভিদের উপাদান অনেক প্রকার। তাহার কোন এক প্রকার প্রকৃতি বহু উদ্ভিদে দৃষ্ট হইলে, সেই প্রাকৃতিক গম্বন্ধ তখন তাহাদের বিভাগনির্দেশক বলিয়া গণ্য হয়। এসকলের উদাহরণ অর্থাৎ বিভাগ নির্ণায়ক প্রণালী সুবিবার নিদর্শন সকল যথাযথ স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বস্তুতঃ প্রামুখ্য লক্ষণ ধরিয়াই পূর্বকালে উদ্ভিদের জাতি, বর্গ, গণ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভাগ সকল কল্পিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই বোধগম্য করা যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিস্তীর্ণ উদ্ভিদ্ধিদ্যা পূর্বে তিন মহা বিভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষি, মালাকারীয় শাস্ত্র ও বৈদ্যকগৃহীত বৃক্ষায়ুর্বেদ নামক উদ্ভিদশাস্ত্র। কৃষি-বিভাগের আচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, বনস্পতিকায় সকল অর্থাৎ উদ্ভিদ জীব সকল প্রধান করে দুই অথবা পাঁচ মহাবিভাগে বিভক্ত হইলেও ধর্মাস্বয় ও উৎপত্তি ঘটিত প্রাকৃতিক গম্বন্ধ অনুসারে মুখ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা উচিত। যথা ;—

- ১। অত্রবীজ ।
- ২। মূলজ ।
- ৩। পর্কযোনি ।
- ৪। ক্ষুদ্রজ ।
- ৫। বীজরহ ।
- ৬। সম্মুর্ছজ ।

এ সকলের উদাহরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। উদ্ভিদ্ভিদের
অন্যতম অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ যাহা মালাকার শাখা ও বৃক্ষায়ুর্বেদ নামে
বিখ্যাত, সেই দুই প্রধান অঙ্গেও এবশ্ব্যকার বিভাগ প্রদর্শিত
হইয়াছে। যথা ;—

"বনস্পতি ক্রম-লতা-গুল্মাঃ পাদপজাতয়ঃ ।

বীজাঃ কাণ্ডাত্মা কন্দাঃ তজ্জন্ম ত্রিবিধং বিদ্যুঃ ॥

ভূগান্যোষধয়শ্চৈব পৃথক্ জাতিঃ প্রদিশ্যতে ।

অন্যানিভেদান্তেষাং বৈ পার্থক্যমস্মীয়তে ॥"

+ x + +

"তে বনস্পত্যঃ প্রোক্তাঃ বিনা পুটৈঃ ফলন্তি যে ।

ক্রমাশ্চাত্তে নিগদিতাঃ পুটৈঃ সহ ফলন্তি যে ॥

প্রসরন্তি প্রতানৈর্বা স্তা লতাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ।

বহুস্তম্বাহবিটপিনো যে তে গুল্মাঃ প্রকীর্ণিতাঃ ॥"

+ + + +

"জম্বুচম্পকপুন্নাগনাগকেশরচিকিনী ।

কপিথবদরী বিশ্ব কুন্তকারী প্রিয়ঙ্গবঃ ॥

পলদাম্র মধুকাদ্যাঃ করমর্দ্যশ্চ বীজজাঃ ।

ভামুলী সিন্দূবারশ্চ তগরাদ্যাশ্চ কাণ্ডজাঃ ॥

পাটলা দাড়িমী প্লক্ষকরবীরবটাদয়ঃ ।

মল্লিকোদ্বারৌ কুল্লো বীজকাণ্ডোস্তবা মতাঃ ॥

কুঙ্কমার্জ রসো নালু কাদ্যাঃ কন্দমমুস্তবাঃ ।

এলাপত্রোৎপলাদীনি বীজকন্দোস্তবানি হি ॥”

+ + + ×

(বৃহৎশালুধরযুত পাদপবিবক্ষাপ্রকরণ দেখ ।

এই কএকটি সংস্কৃত শ্লোকের মোটামুটি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেই রক্ষাযুর্বেদ শাস্ত্রের ও শালাকার-শাস্ত্রের অভিমত উদ্ভিদংশের শ্রেণী বিভাগ বা জাতি পরিকল্পনা জানা যাইতে পারে । যথা ;—

প্রথমতঃ পাদপ এক মহাজাতি । এই মহাজাতির অন্তর্নি-
বিষ্ট জাতি চারি প্রকার । বনস্পতি (১), ক্রম (২), লতা (৩),
ও গুল্ম (৪) । জন্মনামক প্রাকৃতিক ক্রিয়ার প্রভেদ থাকায় ঐ
প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কতক বীজ হইতে, কতক কাণ্ড
হইতে, কতক বা কন্দ অর্থাৎ মূল হইতে ঐ সকলের জন্ম হইয়া
থাকে । ভূগ ও ঔষধি নামক ভূগাঙ্গের সকল পৃথক জাতি বলিয়া
উপদিষ্ট হইয়াছে । কেননা উহাদের সহিত ইহাদের জন্মগরণাদির
সাম্য নাই ।

যাহাদের পুষ্প হয় না, অথচ ফল হয়, তাহারা বনস্পতি ।
যাহাদের পুষ্প হয় ও ফলও হয়, তাহারা ক্রম । যাহারা প্রতানিত
ও প্রসারিত হয় তাহারা লতা । যাহারা স্তম্ভযুক্ত অর্থাৎ যাহাদের
কাণ্ড বা বিটপ (বড় বড় ডাল) হয় না, তাহারা গুল্ম ।

জাম, চাঁপা, পুলাগ, নাগকেশর, চিঞ্চা, কপিথ, কুল, বেল,
কুস্তকারী, প্রিয়ঙ্গু, কাঁঠাল, আম, মধুক ও করমচা প্রভৃতি বীজজ ।
তামুলী, মিন্দুবার ও তগর প্রভৃতি কাণ্ডজ । পাটলা, দাড়িম, প্লক্ষ
(পাকুড়) করবীর ও বট প্রভৃতি এবং মল্লিকা, যগডুমুর, ও কুঁদ
প্রভৃতি উভয়জ অর্থাৎ ইহারা বীজ হইতেও জন্মে, কাণ্ড হইতেও
জন্মে । এতদ্ভিন্ন কুঙ্কম, আদা, লগুন ও আলু প্রভৃতি কতক গুলি
কেবল কন্দজ জাতি আছে এবং এলাইচ, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি

কতকগুলি উদ্ভিদ বীজ ও কন্দ উভয় হইতে জন্ম লাভ করে বলিয়া উভয়জ জাতি বলিয়া সংগৃহীত হয় ।

মত-নিষ্কর্ষ ।

উল্লিখিত শাস্ত্রদ্বয়ের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে অথবা মত-নিষ্কর্ষ এই যে, সমুদায় সজীব উদ্ভিদ জাতি মুখ্যতঃ প্রধান দুই মহাবিভাগে বিভক্ত । এক পাদপ জাতি, অপর ভূগ-জাতি । এই দুই মহাবিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ অনেক । তন্মধ্যে পাদপ জাতি চারিশ্রেণী বা চারি প্রকার । ১ বনস্পতি, ২ ক্রম, ৩ লতা, ৪ গুল্ম । ভূগ বিভাগের মধ্যেও ওষধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে । সেই সকল বিভাগের মধ্যে আবার জন্মাদি কৃত বিভাগান্তর লক্ষিত হয় । প্রধান করে প্রথম পক্ষে তিন প্রকার, দ্বিতীয় পক্ষেও অন্যান্য ছয় প্রকার । প্রথম শ্রেণীতে ১ বীজজ, ২ কাণ্ডজ, ৩ কন্দজ । দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ১ সম্মূর্চ্ছজ, ২ বাজজ, ৩ কন্দজ, ইত্যাদি । এতদ্ভিন্ন, উভয়জ-জাতিও দৃষ্ট হয় ।

এই মতের সহিত পূর্বোক্ত কৃষিশাস্ত্রীয় মতের প্রায় একা বা মতসামঞ্জস্য আছে । যথা ;—

১ । অগ্রবীজ ।—যাহাদের আগা কাটিয়া লইয়া রোপণ করিতে হয় তাহারা অগ্রবীজ জাতীয় । এই অগ্রবীজ আর কাণ্ডরোপ্য প্রায় তুল্য কথা ।

২ মূলজ ।—যাহাদের মূল প্রোথিত করিলে গাছ জন্মে তাহারা মূলজ । এই মূলজ আর কন্দজ সমান কথা ।

৩ পার্ক্যোনি ।—যাহাদের গাঁইট রোপণ করিলে গাছ জন্মে তাহারা পার্ক্যোনি নামে প্রসিদ্ধ । এই পার্ক্যোনি জাতিও কাণ্ডজ জাতির অন্তর্ভুক্ত ।

৪ ক্কজ ।—এই কন্দজ জাতিকেও কাণ্ডজ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে ।

৫ বীজরুহ । = বীজরুহ ও বীজ জ সমান কথা ।

৬ সম্মুচ্ছজ । = ক্ষিতি, জল, পবন ও তেজ পরস্পর সমবহিত হইয়া কর্দমীভূত মৃত্তিকাকে পাক বিশেষে উপনীত করিলে তাহা হইতে যে শম্পাজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে, তাহারাই সম্মুচ্ছজ জাতি বলিয়া গণ্য । ভূতনিচয়ের পরস্পরানুপ্রবেশ-নিমিত্তক পরিপাক বিশেষের নাম সম্মুচ্ছন ও তাহারই শম্পা বা তৃণাদি উদ্ভিদের বীজ* ।

উদ্ভিদ জাতির বংশ ও তত্তাবতেব অবাস্তুর প্রভেদ,—এই দুই বিষয়ের উপর প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের এইরূপ অনেক কথা বিদ্যমান আছে । সে সকলের তাৎপর্য্য এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ বা দুস্প্রতর্ক্য । স্বতরাং এক একটি করিয়া বলাই উচিত এবং সুখবোধের নিমিত্ত এক একটি উদাহরণ দেখান অত্যাৱশ্যক । তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে বিস্তীর্ণতম উদ্ভিদবংশের সহিত গানবীয় জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় হইতে পারে, অন্যথা তাহা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে ।

উদ্ভিদবংশের অন্তর্গত শ্রেণী, জাতি, বর্গ, গণ এবং তন্নিবিষ্ট গুণাগুণ ও সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য, এ সমস্তই চিকিৎসকগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তু । অতএব, উদ্ভিদ্ধিদ্যা যে বৈদ্যগণের মহোপকারী, তৎপক্ষে কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারে না ।

একটি সুপরিচিত উদ্ভিদ লইয়া তাহার আকার ও ধর্ম্ম (প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা জন্মগরাদি ক্রিয়া প্রভৃতি) ভূয়িষ্ঠভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া অন্য

* “কুকটাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তৃৎপলাদয়ঃ ।

পর্কযোনয ইন্দ্রাদ্যাঃ স্কন্দজামলকীমুখাঃ ॥

শালাদয়ো বীজরুহাঃ সম্মুচ্ছজাস্তৃৎপাদয়ঃ ।

স্মার্বনস্পতিকায়ন্য যদৈতে মূলজাতয়ঃ ॥” হৈম ভূমিকাকাণ্ড দেখ ।

“তত্র মিজাজলৈ ভূমি রন্তরুখবিপাচিতা।

বায়ুনা ব্যাহ্যমানা বৈ বীজত্মুপ পদ্যতে ॥”

বাঘবট্ট ।

এক উদ্ভিদের সহিত তত্ত্বাবতের তুলনা করিয়া দেখিবেন। তুলনায় যদি মিলিয়া যায় তবে তাহা এক বা তুল্যজাতি, এইরূপ স্থির করিবেন। অপর কোনও একটী প্রমুখ্য লক্ষণ বা চিহ্ন গ্রহণ করিয়া শ্রেণী, তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ ধর্ম বা গুণসাম্য অথবা কার্যকারিতা মাত্র লইয়া বর্গ এবং কেবলমাত্র তুল্যকার্যকারিতাভাগ গ্রহণ করিয়া গণ, এইরূপ বিভাগ সকল স্থির করিবেন। এবংক্রমে বিভাগ কল্পনা করা প্রাচীন উদ্ভিদ-বেজাদিগের অভিপ্রায়।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে আর একটী কথার অবতারণা করিতে হইল। কথাটি এই যে, আয়ুর্বেদাদি উদ্ভিদবিদ্যা যে কেবল উদ্ভিদের বংশাদি নিরূপণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, এরূপ নহে। উদ্ভিদজাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগ ও তাহাদের স্বভাবাদিও সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছেন। ফল, পুষ্প, পত্র, বৃক্ষ, সার, নির্যাস, প্ররোহ, মূল ও তাহাদের আকৃতি প্রভৃতি সমস্তই সংক্ষিপ্ত কথায় বর্ণন করিয়াছেন। কি প্রকারে উদ্ভিদ শরীরে রস-সঞ্চয় হয়? কি প্রক্রিয়ায় তাহারা নির্দিষ্ট কাল জীবিত থাকে? এ সকল অবাঞ্ছিত তথ্যও বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই শাস্ত্রের আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ অত্যাধিক মজীব অবস্থায় বিद्यমান আছে। সে অংশ এক্ষণে “দ্রব্যগুণ” নামে অভিহিত হইতেছে। প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞদিগের জ্ঞান এই দ্রব্যগুণ অংশে অতি অদ্ভুতরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। উদ্ভিদিক শরীরের সহিত যে মানব শরীরের প্রতিপাল্য প্রতিপালক সম্বন্ধ আছে,—সেই সম্বন্ধের রহস্য বিজ্ঞান অত্যন্ত নিগূঢ় ও দুর্নিরূপ্য। পরন্তু ঋষিরা তাহা নিরূপণ করিতে অথবা জানিতে অসমর্থ হইয়া নাই। এসকল কথা আমরা কিছু দূর অগ্রগামী হইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

শারীরশাস্ত্রে যেমন মৃতদেহ কর্তন করিয়া তদ্ব্যাপ্ত শিরাপ্রাণিরা প্রভৃতি জানিবার উপদেশ আছে, উদ্ভিদশাস্ত্রেও সেইরূপ উদ্ভিদাদি

কর্তন করিয়া তাহাদের রসবাহী শিরা প্রশিরা প্রভৃতি জাত হইবার উপদেশ আছে। এ কথা হয় ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। এখন না করেন, কিন্তু যখন আমরা এই সকল তথ্য সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হইব, অবশ্যই তখন তাহা জনসাধারণের বিশ্বাস্য হইবে, সন্দেহ নাই। বাহাই হউক আপাততঃ এইস্থানে আমরা বিশ্বাসসূচক একটি সামান্য নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি।

শাস্ত্রসমূহের যোনিস্বরূপ বেদ যজ্ঞকাণ্ড উপলক্ষে বলিয়াছেন, যে,—

“উদ্ভিদা যজ্ঞত ।”

উদ্ভিদের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক ।

“বপামিব জালকমাহরেৎ ।”

অন্যান্য যজ্ঞে যেমন মারিত পশুর বপা (বুদ্ধ মাংস) লইয়া হোম করিতে হয়, উদ্ভিদযোগে সেইরূপ “জালক” লইয়া হোম করিতে হয়।

“যজ্ঞালকমিব দৃষ্টতে ভদ্রা জালকত্বম্ ।” *

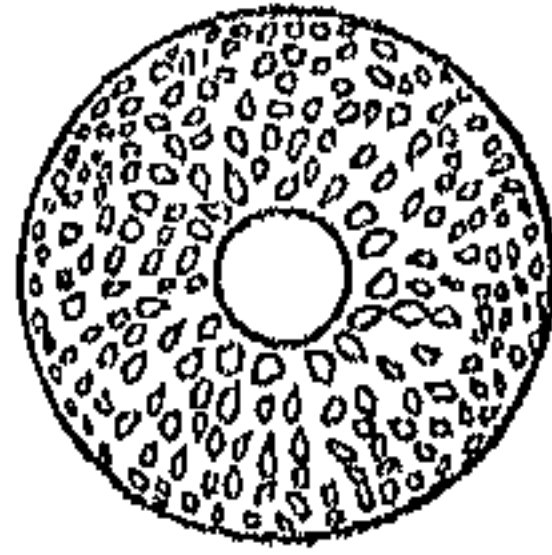
যেহেতু কর্তন করিলে নমস্তই জালবৎ দৃষ্ট হয়, সেইহেতু তাহা জালক নামে খ্যাত।

এই বৈদিক কথা গুলির অর্থাপত্তিপ্ৰমাণভ্য তাৎপর্য বাহির করিতে পারিলেই আমাদের পূর্বোক্ত উল্লেখ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে।

বনৌষধি বর্গে লিখিত আছে, “ক্ষারকো জালকঃ ক্লীবে ।” ক্ষারক ও জালক এই দুইটি অপুষ্কক কলিকার নাম বা পর্যায় শব্দ উহা কুড়ি, কোড় বা কোড়ার নাম। যেমন বাঁশের কোড়। কোড়ের “জালক” নাম হইবার কারণ পূর্বোক্ত বৈদিক-নির্বাচনে দেখান হইয়াছে। কোড় কর্তন করিলে জালবৎ দেখা যায় বলিয়াই জালক। স্মৃতরাং সংস্কৃত ভাষার জালক আর ইংরাজি হইতে অনুবাদিত

* মীমাংসা-শ্রায়-প্রকাশের টীকা দেখ।

“বিবরাঙ্কিতস্তর” তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হয় । নব্য উদ্ভিদ্ভিদ্ধ্যা-
বিশারদগণ “বিবরাঙ্কিত স্তরের” যেরূপ চিত্র দেখাইয়াছেন, অনু-
সন্ধান করিয়া দেখিলে জালকেব চিত্রও তদনুরূপ বলিয়া বিবেচিত
হইতে পারে । যথা,—



নব্য উদ্ভিদ্ভিদ্ধ্যাপ্রচারকগণ বলেন, ঐ বিবরাঙ্কিত স্তর অশু-
কোন বস্তু নহে; উহা উদ্ভিদিক শিরাবিশেষের সমষ্টি । যাহাই হউক,
এদেশের প্রাচীন উদ্ভিজ্জতত্ত্বনির্ণায়ক পণ্ডিতেরা যখন কোঁড়জাতীয়
কলিকার অভ্যন্তরে জালক অর্থাৎ বিবরাঙ্কিতশিরাস্তর থাকা বর্ণন
করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে উদ্ভিদ্যবচ্ছেদবিষয়ে অনভিজ্ঞ
বলিয়া স্বীকার করা যায় না । যাহাই হউক, এক্ষণে পাঠকগণের
নিকট আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন আমা-
দের অনুরোধে ও প্রার্থনায় কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করেন ।
তাহা হইলে আমরা ক্রমে সমস্ত বিষয় আশুপূর্ণীক্রমে প্রদর্শন
করিতে সমর্থ হইব । নানাস্থান হইতে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের
পুস্তক হইতে সমাহরণ পূর্বক এই সকল তথ্য প্রকাশ করিতে
হইবে ; সুতরাং আমরা শীঘ্র শীঘ্র পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ
করিতে পারিব না । এসকল বিষয়ের যদি কোন নির্দিষ্ট পুস্তক
থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা শীঘ্র শীঘ্র প্রণালীপূর্বক
আয়ুর্বেদীয় উদ্ভিদ্ভিদ্ধ্যাতি অনুবাদ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার
দিতে পারিতাম ।

আপত্তি ও সমাধান।

এই প্রস্তাবের প্রথমে যে উদ্ভিদজাতির লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া হয়-ত অনেক নব্য পাঠক আপত্তি উত্থাপন করিবেন। বলিবেন, যাহারা ভূমি উদ্ভেদ করিয়া জন্ম লাভ করে, কেবল তাহারাই যদি উদ্ভিজ্জ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে, জলোপরি ভাসমান শৈবাল ও বায়ুমাত্র ভোজী আল্গোচ লতা প্রভৃতিতে উদ্ভিজ্জ লক্ষণ যাইবে না। কেননা, জলজন্মা পানী ও শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদ ভূমি উদ্ভেদ ব্যতীত কেবলমাত্র জলোপরি জন্মিতে দেখা যায় এবং “আল্গোচ লতা” ও “সোণা লতা” নামক এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, তাহাদিগকেও কেবলমাত্র রুক্মোপরি অসংশ্লিষ্টরূপে অর্থাৎ আল্গোচ ভাবে স্থিতি করিতে দেখা যায়। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে ভূমি সম্পর্কজাত উদ্ভিজ্জ মধ্যে নিবিষ্ট করা যায় না; না করিলে অবশ্যই প্রোক্ত লক্ষণের ব্যভিচার হয়।

আপত্তিটী মন্দ নহে; পরন্তু ইহার পরিহার জন্য মহামহো-
পাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—

“অধিকেন হি ব্যপদেশা ভবন্তি। তথাহি লোকে ক্ষিতিজল পবন
সমবধানজন্মাপ্যক্ষুরঃ ক্ষিতাকুর ইভুচাতে।”

অর্থ এই যে, নাম মাত্রের প্রায়িক, অর্থাৎ আধিক্য অনুসারেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, অক্ষুর সকল মৃত্তিকা, জল ও বায়ুরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া জন্ম লাভ করিলেও লোক সকল মৃত্তিকাক্ষুর অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত বলিয়া উল্লেখ করে। বস্তুতঃ বহুল অক্ষুরই ক্ষিতিপ্রভব হইতে দেখা যায় এবং প্রত্যেক অক্ষুরে ক্ষিতি দাতুর বাহুল্য অর্থাৎ আধিক্য থাকা অনুমিত হয়। অতএব, “উদ্ভিদ্য ভূমিং নির্গচ্ছৎ উদ্ভিজ্জঃ স্থাবরোহি সঃ।” এই প্রাচীন পরিকল্পিত লক্ষণ যে জলীয় ও বায়বীয় উদ্ভিদের সংগ্রাহক; তাহা

অত্যন্ত বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে । সুতরাং পূর্ন পূর্ন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে জরায়ুজ অণুজ ও স্বেদজ জীব ব্যতীত অন্য সমুদায়কে উদ্ভিজ্জ নামে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সঙ্গত ভিন্ন অসঙ্গত নহে ।

এ সম্বন্ধে অপর কথা এই যে, কিঞ্চিৎ উপলক্ষণভাব স্বীকার না করিলে লক্ষণ মাত্রেই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বিশেষত উদ্ভিদ সম্বন্ধে এমন কোন লক্ষণ হইতে পারে না, যাহা বিনা উপলক্ষণ অঙ্গীকারে সর্বত্র সম্ভব হইতে পারে । উদ্ভিদের মূল কি ? মূলের লক্ষণ কি ? কোন অংশকে মূল বলে, ইহা বুঝাইবার জন্য নব্য পণ্ডিতগণ মূলের যে রূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও উদ্ভিজ্জ লক্ষণের ন্যায় অব্যাপ্তি দোষ আছে । সুতরাং তাহারও যেমন মূল লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ পরিহারার্থ উপলক্ষক ধর্মগুলি সংগ্রহ করিয়া মূল-লক্ষণের পূর্ণতা করিয়া থাকেন ; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও সেইরূপ উদ্ভিদলক্ষণের উপলক্ষক ধর্ম সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহার পূর্ণতা করিয়া থাকেন । নব্য পণ্ডিতগণের মতে মূলের লক্ষণ যথা ;—

উদ্ভিদের যে অংশ মৃত্তিকার মধ্যে থাকে, যাহার বলে উদ্ভিদ মৃত্তিকার উপর সোজা থাকে, যাহার দ্বারা মার্জিক্য রস শরীরস্থ করিয়া উদ্ভিদ সকল জীবিত থাকে, তাহাকে “মূল” কহে ।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, নব্যদিগের এই মূল লক্ষণটি সমস্ত লক্ষ্য ব্যাপক হইল কি না । অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন, এই লক্ষণ অনেক মূলে খাটে না । গিরিগুহা কিংবা গৃহাদির উপরিভাগস্থ লম্বমান উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকায় থাকে না এবং অধো-ধাবিত না হইয়া তাহার উর্ধ্বে উঠিতে থাকে । পান্য প্রভৃতি জলীয় উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকাম্পর্শী নহে । সুতরাং তাহারও মার্জিক্য রস শরীরস্থ করে না । পূর্বেক্ত আলগোচ লতারও প্রোক্তলক্ষণ মূল

নাই। এমন কি এই লতার মূল কোথায়? কোন অংশের নাম মূল? তাহা কিছুমাত্র জানা যায় না। সুতরাং নব্যদিগের মূল লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ আছে, তাহার পরিহারের জন্য “বাহুল্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি” এই পুরাতন ন্যায়ের আশ্রয় লইয়া প্রায়িকতা পক্ষ অঙ্গীকার করিতে হয় এবং মূলের কার্য কি? কিরূপ ক্রিয়াশক্তি থাকিলে তদংশের মূল নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সেই শক্তিমৎ অংশকেই মূল নামক বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন “পাদপ” লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেও এরূপ দোষ দৃষ্ট হইবে। “পাদপ” এটি ছোট বড় বৃক্ষ সাধারণের নাম। পদের দ্বারা অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা স্তম্ভিকারস আকর্ষণ পূর্বক জীবিত থাকে ও পুষ্ট হয় বলিয়া পাদপ নাম হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এমন অনেক ক্ষুদ্র পাদপ আছে; তাহার শিকড়ের দ্বারা রসাকর্ষণ না করিয়া শিখরের দ্বারা বায়বীয় পদার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, ও পুষ্ট হয়। এরূপ গাছ কোথায় আছে এবং তাহা কিরূপ ও তাহাদের নাম কি? তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। অতএব উপলক্ষণ ধর্ম সংযোজন পূর্বক লক্ষণবাক্য সমাপ্ত করিতে হয়; এরূপ বলা বোধ হয় অসঙ্গত বা অযুক্ত হয় নাই।

উদ্ভিদ কি? তাহা নির্ণীত হইল।

উহাদের বংশ বা জাতিবোধক লক্ষণও সূক্ষ্ম হইল।

এক্ষণে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবিভাগ বা শ্রেণী অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে।

ইতি পূর্বে আমরা উদ্ভিদবংশের স্থূল বিভাগ দেখাইয়াছি; এক্ষণে আবার তাহাদের অমুবিভাগ অর্থাৎ অবাস্তরবিভাগ দেখান আবশ্যক হইতেছে।

নিম্নলিখিত অবাস্তর বিভাগ আয়ত্ত হইলে, উত্তমরূপে জানা

হইলে, উদ্ভিদবংশের পরস্পর বিভিন্নতা বা পৃথক পৃথক জাতীয়-
ভাব ও শ্রেণীসমূহের একটা স্থূল পরিচয় পাওয়া যাইবে ।

ওষধি (১)

তৃণ (২)

দ্রবসার (৩)

অন্তঃসার (৪)

সর্বসার (৫)

নিঃসার (৬)

ফলপাক নাশ্য উদ্ভিদ ওষধি ।

কুশকাশাদি জাতীয় উদ্ভিদ তৃণ ।

বাঁশ প্রভৃতি কঠিন দ্রব উদ্ভিদ দ্রবসার ।

খদিব প্রভৃতি রক্ষ অন্তঃসার ।

চন্দন প্রভৃতি সর্বসার ।

কদলী প্রভৃতি নিঃসার ।

এতদ্ভিন্ন কন্দ, মূল, শিফা, পুষ্প, পত্র, ফল, বঙ্কল, শিষী, এবং
দ্রব দীর্ঘ ভেদে আরও কয়েক প্রকার শ্রেণী হইতে পারে । অর্থাৎ
কন্দজাতীয়, মূলজাতীয়, শিফাজাতীয়, পুষ্পজাতীয়, পত্রজাতীয়, ফল
জাতীয়, বঙ্কলজাতীয়, শিষীজাতীয় পৃথক পৃথক উদ্ভিদশ্রেণী আছে
এবং তাহাদিগকে আবার দ্রবদীর্ঘভেদে বিভিন্নশ্রেণীতে পবিগণিত
করা যাইতে পারে । পূর্বতন ঔষধতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা এইরূপ
পরিপাটিক্রমে উদ্ভিদবংশের বিভাগাদি সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন ।
এই সকল বিভাগের প্রয়োজন কি ? তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত
হইবে ।

আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী এই সকল কথা ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত করিবেন,
উত্তলা হইলে চলিবে না ।

কালতত্ত্ব ।

পূর্বেক্ত অরুণ জলরাশি দুই ভাগে বিভক্ত ।

যথা—১ম স্কুল, ২য় স্কুল ।

স্কুলজল ।—যাহা পরস্পর সংযোগে রাশিভাব অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর নিম্নস্থান সকল অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহাকেই স্কুলজল রাশি বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হইল ।

ভূমণ্ডলের দক্ষিণ ভাগ অপেক্ষাকৃত নিম্ন সূতরাং ঐ ভাগই অধিকাংশ স্কুলজলের আবাস ।

২য় । যাহা সৌরিক কিরণ সংযোগে ভিন্নসংঘাত হইয়া ভূবায়ুর আঘাতে অতি সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইয়া সমস্ত জগৎ প্রাদক্ষিণ পূর্বক উর্দ্ধে ১২ দ্বাদশ কোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বিচরণ করিতেছে তাহা সূক্ষ্ম । মেঘ, করকা, তুষাব, প্রভৃতি ইহার পরিণাম ।

অয়ন এবং ঋতু বিভাজক পদার্থ এবং তাহাদিগের গুণ ।

বৈজ্ঞানিক আচার্য্যগণের মত যে ভৌতিক জগত ভৌতিক ক্রিয়ার অধীন ; তন্মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু এই চতুর্বিধ পদার্থ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে ক্রিয়াশীল । ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে জানিতে হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় ।

তেজঃ কি এবং তাহার গুণ কি ? তাহা বিস্তারিত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । পুনরায় কার্য্যকারণ দেখাইবার নিমিত্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে ।

সূর্য্য সমস্ত তেজের আধার । ক্রিয়া,—উর্দ্ধগমন শক্তি, পচন, দাহজনন, নির্মলীকরণ, লঘুকরণ, (আণবিক সংযোগ ধ্বংস) ও পরিবর্তকরণ ।

চন্দ্র যত্বপি জলময় পদার্থ নয় বটে তথাপি আশ্চর্য্যেদশায় জ্যোতির্নির্দগ্ধ চন্দ্রকে কর্কটরাশি (জলরাশি) দ্বিত জাগিয়

প্রভুত জলেব আধার কিম্বা জলবর্ষণেব কোন এক প্রকার পুঙ্কল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন । বৈদিক মতেও কোন কোন স্থলে চন্দ্রের স্তব উপলক্ষে তাহাকে প্রভুত জলসঞ্চারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন * । এই সকল প্রাচীন বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে চন্দ্র কোন প্রকার জলাধিপতি, নিজে জল নহেন সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ দক্ষিণায়নে বা বিসর্গকালে রাত্রির মান রুদ্ধিব সহিত চন্দ্রের স্থিতিকাল রুদ্ধি হইলে ভারতভূমি যখন জলামুক্ত হইতে থাকে এবং ভৌতিক পদার্থ সকল বলবান হয়, তখন অবশ্যই “চন্দ্র” জলদ, এবং সেই হেতু চন্দ্রের নাগাস্তব সোম এবং ওষধীশ হইয়াছে ।

আবাহবায়ু
বা
ভুবায়ু

সৌরিক তাপাংশই ইহার গতিব্যঞ্জনক । সূর্য্য যেসময়ে দক্ষিণক্রান্তিপথে ভ্রমণ করিবে আবাহবায়ু ঐ সময়ে উত্তর গোল হইতে প্রবাহিত হইবে । এবং যখন উত্তর গোলে থাকিবে ঐ সময় দক্ষিণ গোল হইতে প্রবাহিত হইবে ইত্যাদি (১) । “শুণ” অনুষ্ণাশীত স্পর্শ, (উষ্ণতা এবং শীতলতা রহিত) অতএব “রূক্ষ” “লঘু” (অনিচিতসংযোগাপন্ন সূক্ষ্মপরমাণু), অতএব যোগবাহী (উভয়ক্রিয়ানিষ্পাদক) । অর্থাৎ

“শুভঃ কফী শ্লিষ্ণজলানুচারী” । নীলকণ্ঠ জাতক ।

“ভার্গবেন্দুজলচারৌ” । বৃহজ্জাতক ।

চন্দ্রমা অঙ্গস্তরা স্পর্শগোধাবতে দিবি । ঋঃ । ১ম, ১৫ অম্বু ১২ র' ।

জলময় মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যবশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা স্বর্লোকে ধাবিত হইতেছে ।

(১) যজুর্বেদীয় মাধান্বিনী শাখাব বাজসনেয়ী সংহিতার ১৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন “আদস্য বাতোহমুবাতি শুচি রধসমতে বৃক্ষনং কৃষ্ণমস্তি ।” অর্থ—আৎ অনন্তরং অস্য অগেঃ শুচি জ্বালামু লক্ষ্য বাতো বাতি ধাবতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট তেজের অভিযুখে বায়ু সর্বদা গতি শীল, এবং স্থানান্তরে

যে সময়ে সূর্য্যের বল অধিক হইবে, ঐ সময় ভারতীয় আবহবায়ু উষ্ণ স্পর্শ এবং অতিরিক্ত ও লঘু হইবে । আর যে সময় চন্দ্রবল অধিক হইবে, অর্থাৎ জল সংস্কৃত হইবে ঐ সময় শীতল স্পর্শ এবং স্নিগ্ধ হইবে । এই বলিয়াই জগৎকে আশ্রয় এবং সৌমীয় বলা যায় । এই অসাধারণ শক্তির অনুবলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সমুদ্রায়ের বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ সাম্ভাপিক এবং শৈতিক ক্রিয়া নিম্পত্তি হইয়া আসিতেছে । এই কাবণে ইহান অপর নাম “জগৎ প্রাণ” ।*

ইহান স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশে আচার্য্য সুশ্রুত বলিয়াছেন ।

শীতাংশুঃ ক্লেদযত্নাক্ষীঃ বিবদ্বান্ শোষযত্যাপি ।

তাবুভাবপি সংশ্রিতা বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রমা পৃথিবীকে ক্লেদযুক্ত করিয়া সুশ্লিষ্ট করে, সূর্য্য পুনরায় শোষন করে, এই চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া বায়ু সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে ।

আদানিক এবং বৈসর্গিক কার্য্য ।†

সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত চতুর্নিধ পদার্থের উত্তর এবং দক্ষিণ

টীকাকার যে ঋত্বির প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা অন্তরীক্ষমা পৃষ্ঠে হৃৎ স্ফোতিষানু বায়ুরিতি । অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে বায়ু অগ্নিব অনুরাগী থাকিয়া স্ফোতিষানুকূপে বিদ্যমান । বিশেষ অস্বাদেশীয় দার্শনিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বায়ুই তেজের উৎপাদক এবং আশ্রয়, অপিচ পৌরাণিকেরা অগ্নিকে বায়ুসখা নামে সর্ব্বত্র অভিহিত করিয়া গিয়াছেন । এই সকল প্রাচীন ঋষি বাক্যের পর্যালোচনা দ্বাবায় বায়ু যে তেজের অনুগামী, এই অনুমান অঁকটা বলিতে হইবে ।

* আভ্যন্তরীণ ভৌতিক বায়ুর ইন্দ্রিয় বক (স্পর্শ) ; এই স্পর্শ রূক্ষ, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিকণ সূক্ষ, পিচ্ছিল, দারুণ, মৃদু ইত্যাদি ।

† বিশ্বজতি জনয়তি আপ্যায়নঃ প্রাণিনাঞ্চ বলমিতি বিসর্গঃ ।

আদদাতি ক্ষপয়তি পৃথিব্যাঃ সৌম্যাংশঃ প্রাণিনাঞ্চ বল মিত্যাদানং ।

চক্রপাণিঃ ।

সংক্রমানুসারে আদান এবং বিসর্গক্রিয়া নিষ্পত্তি হইয়া আসিতেছে । প্রোক্ত উভয়বিধ ক্রিয়াই শিশিরাদি ষড়বিধ ঋতুর এবং অগ্নি, শবণ, মধুরাদি ষড়বিধ রসগুণের ও গুণানুযায়ী শরীর ধারক বায়ু, পিত্ত, কফের সঞ্চয়, প্রকোপ, এবং প্রাণের ও প্রাণিগণের শরীরগত বলের উৎপত্তি এবং নাশ ইত্যাদি বহুবিধ কার্যের নিষ্পাদক ।*

কীদৃশ ভ্রমণ দ্বারা উক্ত বহুবিধ কার্য সংসাধিত হয় এবং ঐ সকল কার্যের ফলোন্মুখ সময়ে ভারতীয় মানব নিকর কীদৃশ অবস্থায় অবস্থান এবং আহাৰাদি জীবককার্যে লিপ্ত থাকিলে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ব্যাধি মূলক যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তদ্বিস্তারিত কালতত্ত্ব পাঠে অবশ্য জ্ঞাতব্য ।

আদানকাল } সূর্য্যদেব দক্ষিণ ক্রান্তি পথে চক্ষিণ অংশ, ইং
বা } ২৩ । ২৮ কলা ধনুরাশির শেষ পাদ পর্য্যন্ত
উত্তরায়ণ } গমন করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া মকর রাশির প্রথম
পাদে উপস্থিত হইলে উত্তরায়ণের সূত্রপাত হয় ।

ঐ সময় হইতে সূর্য্যদেব ভূমণ্ডলের উত্তর ক্রান্তিপথে অগ্রসর হইয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের কি তৎসদৃশ স্থান সমূহের দিবাগান রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, ঐরূপ দিবসের মান রুদ্ধির সহিত সূর্য্যের কিরণ সম্পাত ও অপেক্ষাকৃত সারল্য অবলম্বন করে । সূত্রাৎ তদনুযায়ী রাত্রির মান ক্রমে ন্যূনতর পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তৎসহচর চন্দ্র কিরণ সম্পাতও পূর্বাপেক্ষায় কথঞ্চিৎ তির্য্যগ্ ভাবে পতন হয় । এই সময়ে ভূমণ্ডলের উত্তরগোলে গ্রীষ্ম মণ্ডলের সম্ভাব্য স্থানে, হেমন্ত ঋতু অপেক্ষা শিশির কালানুযায়ী সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতা হেতু ক্রমে অধিকতর তাপাংশ প্রবেশ করে, এবং

* তাৰেবার্ক-বায়ু-সোমচ্চ কালমতাবমার্গপরিগৃহীতাঃ কালভূরদেব-দেহবল-নিবৃত্তি-প্রত্যয়ভূতাঃ সমু পদিশুভে । চরক । স্থ । ৬ ।

তদ্বারা স্থাবর জঙ্গম প্রাণীগণের বলোপচয়ের নিদানভূত নিসর্গ কালোচিত ক্রিয়াজনিত সম্যক পরিপক্ক মধুররসানুযায়ি গুণের বলহীন কারক ক্রম প্রাপ্ত তিক্ত রসের গুণের সঞ্চয় হয়, পরন্তু ঐ সঞ্চয় ঋতুর সন্ধিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সন্তাপীয় আতিশয্যের অনুগামী শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, এই ত্রিবিধ ঋতুতে যথাক্রমে তিক্ত, কষায়, এবং কটু, এই ত্রিবিধ গুণের আবির্ভাব হয়। এই ত্রিবিধ রস বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ গুণ বাহুল্যে উদ্ভূত হয় বলিয়া শোষক এবং প্রাণীগণের বল নাশক। আচার্য্যগণ এই নিমিত্ত উত্তরায়ণ কালকে আদানকাল বা আগ্নেয় নামে অভিহিত করিয়াছেন।*

* আয়ুর্বেদীয় আচার্য্যগণ জঙ্গমপ্রাণীগণের আহার পরিপাকের নানাবিধ কারণ কল্পনা করিয়া পরিণামে স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, এবং অপ্রাণীর অভ্যন্তরীণ বিপাক ক্রিয়া নিষ্পত্তির এবং ঐ বিপাক জনিত বিবিধ রসোৎপত্তির যে কারণ দর্শাইয়াছেন তদু বিস্তারিত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা সাধারণ জব্যাক্রান্ত রসের এবং শিশিরাদি ঋতুভব রসের বিশেষ জ্ঞান লাভ হইবে সন্দেহ নাই। চরকাচার্য্য গ্রহণী চিকিৎসা উপলক্ষে বলিয়াছেন —“ভৌমাপাণ্ডেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোদ্যানঃ সনাভমাঃ, পঞ্চাহার গুণান্ দ্বান্ দ্বান্ পার্শ্ববাদীন্ পচন্তি হি” ; অর্থ এই যে পঞ্চ প্রকার ভূত পদার্থ অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দ্বারা একরূপ বুঝিতে হইবে যে আকাশাদি পঞ্চ প্রকার ভূত পদার্থেই এক এক প্রকার বৈকারিক উদ্ভা বিদ্যমান থাকিয়া তদ্বারা স্বকীয় বিপাকক্রিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে জঙ্গম প্রাণীগণ মধুরায় প্রভৃতি ষড়্‌বিধ রস বিশিষ্ট বস্তু আহার করিলে অষ্টরাগি দ্বারা পরিপাকের যে মিশ্র ভৌতিক রস (গারভূত জব পদার্থ) উৎপত্তি হয়, তাহা ধমনী দ্বারা সর্ব শরীর ব্যাপ্ত হইয়া রস, রক্ত, মাংস প্রভৃতি সপ্ত ঋতুর পোষণ পূর্বক শরীরের উপচয় করিয়া থাকে। কিন্তু এই সপ্ত পদার্থ এক প্রকার রস অথবা এক প্রকার গুণ বিশিষ্ট নয়। ইহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন রস সম্পন্ন এবং বিভিন্ন গুণশালী। অতএব রসাদি সপ্ত

পদার্থেব যে পদার্থে প্রোক্ত পঞ্চভূতের যে কোন ভূতের অণু বা আধিক্য আছে, সর্ব শরীর সঞ্চারী রস সেই সেই ভৌতিক তেজস্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগকেই আংশিক গুণের সহিত পোষণ করে। ইহাকেই আয়ুর্বেদে ভূতানি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। স্বাবর বৃক্ষাদি এবং ক্ষণিক স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদার্থ সকলও এই নিয়মের অধীন। যখন দেখা যায় কোন বৃক্ষ কি লতা প্রভৃতির প্রত্যেক অবয়বে বিভিন্ন রস এবং বিভিন্ন গুণ বিদ্যমান অর্থাৎ যাহার মূলে তিক্তরস, তাহার ত্বকে কষায় রস, এবং পত্র কটু ফলে অম্ল ইত্যাদি। যেমন পটোল ফল মধুর রস, পত্র তিক্ত রস, নাড়ী কটু রস, মূল বিবিধ রস, তক্ষপ গুণেও বিভিন্ন ; পটোলফল জিহ্বাবস্ম ; পত্র পিত্তরস, নাড়ী কফরস, মূল বিরেচক। স্বাবর প্রাণীগণ মৌলিক আকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীস্থ পঞ্চভূতের মিশ্রণ রসকে আকর্ষণ করিলে যথাযথ ধমনীর দ্বারা স্ব স্ব স্থানে আকর্ষিত হইয়া, ভৌতিক অগ্নি কর্তৃক পরিপাকে মূল, ত্বক, শাখা পল্লবাদি অবয়ব বিশেষে দ্রবীভূত ভৌতিক জব্য এবং গুণের পোষণ ও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা নানাবিধ রসের বিভাগ কার্য সম্পন্ন করে। বিশ্বনিয়ন্তার এই প্রকার আশ্চর্য্য অলৌকিক কৌশল না থাকিলে, বৃক্ষ লতাদির আমূল হইতে ফল পর্যন্ত যড়বিধ রসের মধ্যে যে কোন প্রকারের রস হউক এক প্রকার রসেরই অল্পভব হইত। এইক্ষণ উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা কিঞ্চিৎ যুক্তি অনুসারে পার্থক্য এবং স্বাবর জন্তুাদি পদার্থ সমূহে ঋতু পরিবর্তন জন্য মধুরাদি গুণের আংশিক আবির্ভাব হইয়া ফলমুখী হয় তাহাই বিচার্য্য। পূর্বে বলা হইয়াছে জগৎ আগ্নেয় এবং সৌম্য, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণও আগ্নেয় এবং সৌম্য ; উত্তরায়ণেব শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম এই ত্রিবিধ ঋতু আগ্নেয়, দক্ষিণায়নের বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এই ত্রিবিধ ঋতু সৌম্য। আগ্নেয় ঋতু শিশিরাदिভে জাগতিক পদার্থ সমুদায় অগ্নিগুণ বিশিষ্ট অবশ্যই হইবে। এবং তৎ সহচর বায়ুও অগ্নিগুণ সম্পর্কে শৈত্য পরিহার পূর্বক কক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য যে বাহ্য তেজ এবং বায়ু যে গুণ সম্পন্ন হইবে, আভ্যন্তরীণ ভৌতিক মিশ্রণ তেজ এবং বায়ু ও তদনুরূপ গুণ সম্পন্ন হইয়া গুণায়িত ক্রিয়া নিষ্পত্তি কবিবে। এই ঋতুত্রয় রসের আবির্ভাব সম্বন্ধে

এইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে যে ইহা প্রকৃত রসনা গ্রাহ্য রস নহে ; কেবল রসানুযায়ী গুণের আবির্ভাব মাত্র বোধ করিতে হইবে । যদি তদ্রূপ কর্তার এইরূপ মানসিক ভাব না হইয়া, প্রকৃতই জগতের ভৌতিক পদার্থ এই প্রকার রসনা গ্রাহ্যবস বিশিষ্ট হইত ; তবে শিশিরঋতুতে সমস্তই তিক্ত এবং গ্রীষ্মঋতুতে সকলই কটু বোধ হইত । অতএব যখন রাসনিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত শরীর প্রভৃতি ভৌতিক জব্যো প্রোক্ত ঋতু ভেদে কদাপি কেহ বিপবীত ভাবে বসের প্রত্যক্ষ করেন নাই, এবং অধুনা ও কেহ করিতে ছিনা, তখন কথিত ঋতু অনুযায়ী রস শব্দ দ্বারা যে বিপাকাদীন গুণের আবির্ভাব প্রতিপন্ন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কি প্রকার উপপত্তি করিলে ঋতুত্রয়ে রসের গুণ সকল বিপাক ক্রিয়া দ্বারা সম্যাক্রূপে মীমাংসিত এবং নিষ্পাদিত হয় ; আচার্য্য এই সম্বন্ধে যেকোন মত প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাই লিখিতেছি । যথা—

“রবির্ভাতি রাদদানো জগতঃস্নেহং বায়বন্তীত্র কৃষ্ণাশ্চোপ শোষয়ন্তঃ ।”

ইত্যাদি চরকঃ

অর্থাৎ সূর্য্যদেব রশ্মিদ্বারা জগতের স্নেহ গ্রহণ করিলে শোষিত বায়ু কৃষ্ণ হয় । এবং তজ্জন্য জগতের ভৌতিক পদার্থ সমূহও কৃষ্ণ রসানুযায়ী গুণ গ্রহণ করে । ইহাও সর্বজন সম্মত যে, তেজের সংস্পর্শে বস্তু মাত্রেরই অভ্যন্তরে তেজঃ প্রবেশ দ্বারা তাহাকে উষ্ণ স্পর্শ বোধ করায় । এই উষ্ণ স্পর্শের নূনাতিবেকতাই প্রবিষ্ট তেজের পরিমাপক । এক্ষণে অনুমান করিতে হইবে যে, যে পরিমাণে বহিস্থ তেজঃ বস্তুতে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ তেজঃ অভ্যন্তরীণ ভৌতিক তেজের সহিত যোগে স্বাভাবিক বলাপেক্ষায় অধিক বলবান হইয়াছে । তেজঃ সংযোগ মাত্রই তদ্রূপ স্নিগ্ধতার অপলাপ দ্বতঃসিক্ত । সুতরাং আগ্নেয় বিপাক ক্রিয়ার আতিশয্য বশতঃ তদভ্যন্তরস্থ ভৌতিক বায়ুর স্নিগ্ধত্ব পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণতার আবির্ভাব হইয়া বস্তুকে স্নিগ্ধবিহীন করিয়াছে বলিতে হইবে । এই স্নিগ্ধতার অপহারক কৃষ্ণতাই আদান কালোচিত রস গুণের ব্যঞ্জক এবং এই কৃষ্ণতাই প্রাণিগণের বল নাশক ও সূর্য্য বল প্রযুক্ত আগ্নেয় । বিসর্গ কালের রসগুণও এইরূপ নিয়মেই জানিতে হইবে ।

বিমর্গ কাল } সূর্য্যদেব উত্তরক্রান্তি পথে ২৪ অংশ হৈ ২৩২৮কলা
বা }
দক্ষিণায়ণ } মিথুন রাশির শেষ পাদ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পশ্চাৎ
কিরিয়া দক্ষিণক্রান্তি পথে কর্কট রাশির প্রথমপাদে
উপস্থিত হইলে দক্ষিণায়ণের বা বিমর্গ কালের
সূত্রপাত হয় ।

ঐ সময় হইতে প্রভাকর ভূমণ্ডলের দক্ষিণপথে যত অগ্রসর
হইবে ভারতক্ষেত্রে ততই সৌরিক কিরণপাত তীর্ষ্যগ্ভাব অবলম্বন
করিবে এবং দিবসের পরিমাণ ক্রমে নূন হইয়া রাত্রির পরিমাণ
বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । ঐ রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত চান্দ্র
কিরণ সম্পাত পূর্বাংশে সারল্য অবলম্বন করিবে । এবং আবহ
নামা ভূবায়ু কর্তৃক বিতাড়িত মেঘমালা দ্বারা উত্তর গোলস্থ গ্রীষ্ম
মণ্ডল সর্ষদা আচ্ছন্ন থাকায় ভারতক্ষেত্রে সৌরিক তাপাংশ অধিক
পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারায় পূর্নোক্ত আবহবায়ু সর্ষদা জল
লক্ষ্যরিহেতু আদান কালজ ক্লম্বতা পরিত্যাগ পূর্বক নৈতাভাব
অবলম্বন করে । ভারতক্ষেত্রও সর্ষদা বর্ষাঋতুর উচিত্যবর্ষণহেতু

আচার্য্যগণ আদানিক গুণবিভাগে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে আদানকাল
অন্য সৌরিক কিরণ পাতের ক্রমে বলাধিকা বশতঃ বিপাক ক্রিয়ার ক্রমামিক্য
হয় সেই হেতু শিশিরাদি ঋতুত্রয়ে ভূমণ্ডলের উত্তরগোলে গ্রীষ্ম প্রধান দেশস্থ
ভৌতিক পদার্থ সকল ক্রমে তিক্ত, কষায়, কটু, এই ত্রিবিধ রস গুণবিশিষ্ট
হইয়া ক্লম্ববায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে কক্ষ, ক্লম্বতর, এবং ক্লম্বতম্ব প্রাপ্ত হয়
শুভ্রাং নিঃসারতাহেতু দুর্বল হইয়া পড়ে । ইহার বিস্তারিত বিবরণ ঋতু
চর্চায় প্রকাশ করিব ।

এই আদানকাল বা উত্তরায়ণের আরম্ভ কাল শিশিরঋতু দেহ বলের
হীনতারস্ত্র জাপক, মধো বসন্ত ঋতু মাধ্যমিক বল ব্যঞ্জক, শেষ গ্রীষ্মঋতু
দৌর্বল্য জনক এবং সম্পূর্ণ শোষক । আদাবাস্তচেত্যাচিত্রক দেখ ।

খরত্ব, কঠিনত্ব এবং উষ্ণত্ব, একদা পরিত্যাগ করিলে পার্থিব জলীয়াংশের পরিপাক হইতে পারে না, স্বতরাং ভৌতিক স্থাবর জন্ম পদার্থ সকল তরুণ রস বিশিষ্ট এবং অল্পবীৰ্য্যবান্ হইয়া পড়ে। অপিচ পূর্নোক্ত কারণে মৌরিক তাপাংশের আবশ্যকীয় পরিমাণের অভাবে এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে স্তম্ভিতদেহ স্থাবর জন্ম প্রাণী এবং অপ্রাণীর নিষ্ঠাপাক ও আবহিক বিপাক ক্রিয়ার অনোচিত্য হেতু আদানকালোচিত ক্রিয়াজনিত কটুরসের পরিবর্তে পার্থিব বস্তুমাত্রে ক্রমে বিসর্গকালোচিত অপাকজ অল্প গুণের সঞ্চয় হয়। এই সঞ্চয় বর্ষা ঋতুর সন্ধিকাল হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সূর্য্য সন্তাপের হীনতা জনক দক্ষিণায়নের অনুগামী বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, এই ঋতুত্রয়ে যথাক্রমে অল্প লবণ, মধুর এই ত্রিবিধ রস-গুণের আবির্ভাব হয়। এই ত্রিবিধ রস ভূমি, অগ্নি এবং জল গুণাধিক্য অতএব উত্তর উত্তর প্রাণিগণের বলোপধায়ক এবং পার্থিব পদার্থ সমূহের মৌর্য্যাংশের জন্মক। *

ঋতু বিভাগ

বিশ্বপাতির বিশ্বনির্মাণের আদি অন্ত কল্পনার বৈজ্ঞানিকগণ ষাটশ ষোরস্তর আন্দোলন করিয়াও নির্দিষ্ট সীমায় উপস্থিত হইতে অপারগ হইয়া পরিণামে বীজাকুর উৎপত্তি সটশ বিশ্ব ব্যাপারের আত্মস্ত কল্পনা ইচ্ছিয়াতীত স্থির করিয়াছেন, তদ্রূপ কাল পরিবর্তন জন্ম ঋতুগণ পবন্যর কার্য্যকারণসূত্রে প্রথিত থাকা হেতু আত্মস্ত

* এই অয়নদ্বয়ের আরম্ভ সংক্রান্তি হইতে লিখিত হইল কিন্তু বর্তমান সময়ে সংক্রান্তিগণনা অয়ন গণনা হইতে না হইয়া কেবল রাশি সংক্রমণ হইতে আরম্ভ হয়। প্রস্তাবিত কালভত্ত্ব মৌরিক গতি লক্ষ্য করিয়া গায়ন প্রভে লিখিত হইল। অতএব যেমন ১০ চৈত্র এবং ১০ আশ্বিন দিবসাক্রির মান তুল্য তেমন ১০ পৌষ এবং ১০ আশাঢ় হইতে গণনা আরম্ভ করিতে হইবে।

কল্পনার পথ তুর্কোধ্য এবং দুর্গমণীয় । এমতাবস্থায় পাঠক সমীপে কোন ঋতু প্রথম উপহার যোগ্য তদ্বিষয় সমালোচনায় অনন্যোপায় হইয়া দক্ষিণায়নের চরমে উত্তরায়নের প্রারম্ভ শিশির ঋতু প্রথম লিখিতে বাধ্য হইলাম । কেননা পৌরানিকেরা বলিয়া থাকেন দিবসের মান বৃদ্ধির সময়ই প্রথম সৃষ্টির কাল ।

অপিচ শিশির ঋতু বুঝাইতে প্রাসঙ্গিক অগ্রিম হিমঋতুর বিষয় অনেকটা লিখিতে হইবে । কারণ পূর্বেই বলিয়াছি ঋতুগণ পরস্পর একে অপরের অনুগত কারণ, অতএব অগ্রিম ঋতুর আংশিক কিছু পরিচয় না লিখিলে লেখ্য ঋতু বুঝাইতে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে এইনিমিত্ত প্রথম হেমন্ত ঋতুর বিষয়ই কিছু প্রকাশ করা হইল ।

ঋতুজ্ঞান ।

মাঘ এবং ফাল্গুন মাস } মনুষ্য যাত্রা অবগত আছেন যে হিম
বা
মকর এবং কুম্ভ রাশি } ঋতুর অবসানেই শিশির ঋতুর প্রবর্তনা
হইয়া থাকে । আয়ুর্বিজ্ঞানবেত্তাগণ

শিশির ঋতুর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

“শিশিরে শীতমধিকং বাতবৃষ্টাকুলাদিশঃ শেষং হেমবৎ মর্কৎ ।”

অর্থ । শিশির ঋতুতে বায়ু এবং বৃষ্টি দ্বারা দিক্ সকল আচ্ছন্ন থাকে অতএব হেমন্তঋতু অপেক্ষায় শিশির ঋতু অধিক শীতব্যাঞ্জক । অন্যান্য লক্ষণ সকলই হেমন্ত ঋতুর তুল্য ।

ইহার উপপত্তি এইরূপ । সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন সমাপনান্তে উত্তরায়নে পদার্পণ করিলেই শিশির ঋতুর প্রযুক্তি হয়, এই প্রযুক্তি সূর্য্য সংক্রমণানুযায়ী প্রতিদিবসীয় পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে । অর্থাৎ যে নিয়মে প্রতিদিন সূর্য্যের স্থায়ী কাল বৃদ্ধি হইবে, ঐ নিয়মে ভারতভূমে উত্তর উত্তর ঋতু জনিতগুণ প্রকাশ পাইবে, এবং ভারতক্ষেত্রস্থ স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ক্রমে নবোদ্ভূত গুণের বশীভূত হইবে ।

এই ঋতু ভোগের কাল পৌষ মাসের ১১ একাদশ দিবসীয় ২৬দণ্ড ২১পল দিবামান হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাসের ১০ দশম দিবসীয় ২৮দণ্ড ১৭ পল দিবামান পর্য্যন্ত, এই ষষ্টি দিন ভোগের ক্রম-
বৃদ্ধ দৈনিক পলাংশ সকল যোগ করিলে ১। ৫৬ পল মাত্র অধিক
হইবে। অর্থাৎ সূর্য্য ২। ৩। ৪ অনুপল ইত্যাদি ক্রমে অগ্রসর হইয়া
এই দুই রাশি ভোগে ১। ৫৬ পল সময় পূরণ করিয়া থাকেন ইহাকে
সূর্য্যের শীত্ৰগতি বলে।

ঋতুর গুণ ।

ঋতুগণ পরস্পর কার্য্যকারণমুত্রে এখিত হেতু হেমন্ত ঋতুর
অধিকাংশ ক্রিয়া শিশির ঋতুর সম্পাদক। হেমন্তঋতুর বর্ণনায়
আচার্য্য মুঞ্চত বলিয়াছেন, “বায়ুর্বাত্যুত্তরঃ শীতঃ”। হেমন্ত
ঋতুতে উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় ইত্যাদি।
তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অত্যুত্তরাংশে হিমমণ্ডল
প্রভৃতি অতি উচ্চ পর্ব্বত মালার শিখরব্যাঙ বায়ুরাশি হৈম
জল (বরফ) বিন্দুর সহিত প্রগাঢ় রূপে সংযুক্ত হওয়ায় রুদ্ধতা এবং
খরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতলতা অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ গোলার্ধ
প্রভাকরের অনুযায়ী হইয়া প্রবল ধারায় দক্ষিণবাহী হয়। এদিকে
উত্তরগোলার্ধ দেশ সকলে সৌরিক কিরণ পাতের বজ্রতা ও
স্থায়িত্বের অল্পতা নিবন্ধন স্বদেশীয় বাষ্পাকার বাহিরার শীতলতা
অভাব বশতঃ শীতল হইয়া প্রোক্ত শীতল বায়ুর গাঢ় সংলগ্নে
জুয়াররূপে বর্ষণ হয় অতএব স্থাবর জলময় সহিত ভারতভূমি
ক্রমে শীলমূর্ত্তি ধারণ করে। এই উভয়বিধ কারণের একদা সমাবেশই
শীতোদ্ভূতের কারণ। এই উদ্ভূত শীত প্রবেশ হইলেই
ক্রমে ভারতে হেমন্ত ঋতুর অধিকার অব্যাহতভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া
পড়ে।

শিশিরঋতুর শীতাদিক উপপত্তি ।

আচার্য্য শিশির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

“শিশিরে শীতমধিকং বাতবৃষ্ণাকুলাদিভঃ । সূক্ষ্মতঃ ।

অনুবাদ । শিশির ঋতুতে হেমন্তঋতু অপেক্ষায় অধিক পরিমাণে শীতের অনুভব হয় এবং দিক্ সকল বায়ু এবং বৃষ্টি দ্বারা আকুলিত হয় । শেষ সকলই হেমন্তঋতু তুল্য ।

উপপত্তি এই যে, সূর্য্য যে সময় দক্ষিণায়ণ হইতে অবসর হইয়া উত্তরায়ণে প্রারম্ভ হন ঐ সময় বায়ুর দক্ষিণ গতি স্থগিত হয় না । কেননা ধারাবাহী জড়পদার্থ যে পর্য্যন্ত প্রবল আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত ধারা পরিবর্তিত না হইয়া প্রাতিঘাত স্থলে কিছুক্ষণ স্থির অথবা মন্দগতি হইয়া পড়ে । *

শিশিরঋতুর বায়বিক ক্রিয়াও তক্রপ সূর্য্যের মকরান্তরতে অবস্থান সময়ে যে দক্ষিণবাহী ধারা উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ধারা সূর্য্যের উত্তর গতি প্রারম্ভে পরিবর্তিত না হইয়া দক্ষিণগোলে মন্দ গতি আশ্রয় করিবে, কিন্তু উত্তরগোলে প্রবল ধারাই থাকিবে, অতএব হৈমন্তিক ঋতুপ্রভব হিমসংযুক্ত ধারাবাহী শীতল বায়ু-কর্তৃক আনীত শীতল সূক্ষ্ম বারিকণা সকল স্বদেশীয় বাষ্পাকার বারি সংযোগে রাশিভাব অবলম্বন করিবে । এবং আদান কাল জন্মিত সূর্য্যকিরণের আধিক্য অনুসারে উভয় পদার্থের সূক্ষ্ম অবয়ব সকল যে পরিমাণে উষ্ণ হইবে ঐ পরিমাণে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইবে অথচ ঐ মেঘ উত্তরগোলস্থ শীতল বায়ুধারা সংযোগে কখন বর্ষণ কখন কুষ্ণাটিকারূপে ব্যাণ্ড হইয়া সৌরিক কিরণ সম্প্রাপ্তের বাধা জন্মাইলে ভারতক্ষেত্র অতি শীতল হইয়া পড়ে ।

* যেসকল নদীর বেগ জোয়ার এবং ভাঁটায় পরিবর্তন হয় সেই সমস্ত নদীতে জোয়ার আরম্ভে ধারার পরিবর্তন হয় না ।

ঐ স্বাস্থ্যের আদানিক কার্য ।

ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে যে হেমন্তঋতু অপেক্ষায় শিশির ঋতুতে সূর্য্যের স্থিতিকাল ১।৫৬ পল মাত্র অধিক । এই অল্পকাল মধ্যে ভারতক্ষেত্রে যে পরিমাণ তাপাংশ প্রবেশ করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণে ভারতীয় পদার্থসকল বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে উষ্ণতা অনুভব করিবে এবং আবহবায়ুও তদ্রূপ তাপাংশজনিত উষ্ণতা গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধতা পরিহারপূর্ব্বক প্রাণীমাত্রের দৌর্ব্বল্যের নিদান তিস্ত রসের গুণ রক্ষিত এবং লঘুত্বের আংশিক আভ্রয় রূপে পরিণত হইবে । অপিচ যাদৃশ সূর্য্যের স্থিতিকাল ১।৫৬ পল অধিক হইবে তৎ পরিমাণ সৌম্যবল ক্ষীণ হইয়া পড়িবে স্বতরাং জাগতিক সৌম্যাংশের ও তদনুরূপ ক্ষীণ হইতে থাকিবে । এই উভয় কারণের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসী প্রাণীসাধারণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ।

ক্রমশঃ ।

জঠরানল কাহাকে বলে ?

আমরা বালক কাল হইতে শুনিতেছি যে জঠর আলার যাতনা বড়—অগ্নিমান্দ্য হইলে আহারে অরুচি হয়, গত্যাগতাই কি উদরে বহ্নি আছে যাহা দিবারাত্রি প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া আহারাদিকে একত্র পাক করিতেছে, না ইহা আমাদের ক্রান্তির দোষ অথবা শাস্ত্রকার-গণের ভ্রম যে তাঁহারা এই কোষ্ঠাগ্নির কথা বারম্বার উল্লেখ করিয়া-ছেন ? কোষ্ঠাগ্নি বহির্গত হইলে যে অরু উৎপন্ন হয় অথবা উহা যে অম্মাদির পাচক ইহাতো ডাক্তারি মতে বলেনা ? ডাক্তারেরা দেহ ক্ষেদ করিয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া শরীরের কোথায় কি আছে তাহা দেখিয়াছেন কিন্তু কুত্রাপিও তো তাঁহাদের অগ্নিদর্শন

যটে নাই ? তবে কি আমাদের শাস্ত্র মিথ্যা ? আমরা ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতরণ করিলাম । এবং প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রকারেরা অগ্নির কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষে অগ্নি না অগ্নিস্বরূপরূপ অপর কোন পদার্থ, তাহার স্থান কোথায়, তাহার কার্য কি, এই অগ্নি সম্বন্ধে আমাদের যোগাচার্য্যগণের অনুভবের সহিত আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণের অনুভবের মিল আছে কি না, এই সব অনুসন্ধান করিয়া পশ্চাৎ নব্য ডাক্তারি মতের সহিত উহার তুলনা করা যাইবেক এবং যথাসাধ্য উহার পরীক্ষা নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যাইবেক । আমাদের শাস্ত্র গুলিন অনুভবাত্মক, নব্য চিকিৎসা শাস্ত্রগুলিন পরীক্ষাত্মক । মৃত দেহ বিচ্ছেদ করিয়া অগ্নি বায়ু ও জলাদির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না । জীবন্ত দেহে ইহা অধিকাংশ অনুভব করিতে হয় । উভয় শাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য বিস্তর থাকিলেও তথাপি তাহাদের সমন্বয় কোন্ অংশে হয়, তাহা দেখাইব । অতএব অগ্রে অপরাপর শাস্ত্রের অগ্নিব্যাখ্যা, পশ্চাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রের--পশ্চাৎ নব্য ডাক্তারির এবং তৎপশ্চাৎ আমাদের নিজের মস্তব্য বলা যাইবেক ।

অগ্নি সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্কাস্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্তা পর্কাদ্যায়ে দ্বিজ ব্যাধ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে ।

পার্শ্বিৎ ধাতুসামান্য শারীরোহগ্নিঃ কথং ভবেৎ ।

অবকাশ বিশেষেণ কথং বর্ত্তয়তেহনিলঃ ॥

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম ! বিজ্ঞানাত্ম্য তেজে ধাতু পার্শ্বিৎ দেহ আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমাত্রী হয় এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহ চেষ্টা সকল বিধান করে ?

ব্যাধ উবাচ ।

মূর্কানগাশ্রিতো বহ্নিঃ শরীরং পরিপালয়ন্ ।

প্রাণো মূৰ্দ্ধনি চাগৌচ বর্তমানো বিচেষ্টতে ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ সৰ্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

শ্রেষ্ঠং তদেব ভূতানাং ব্রহ্মযোনিমুপাশ্রয়ে ॥

স জন্তুঃ সৰ্ব্ব ভুতান্য পুরুষঃ স সনাতনঃ ।

গহান্ বুদ্ধিরহঙ্কারো ভুতানাং বিষয়শ্চ সঃ ॥

এবং ত্ৰিহ স সৰ্ব্বত্র প্রাণেন পরিপাল্যতে ।

পৃষ্ঠতন্তু সমানেন শ্বাং শ্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥

যন্তিমূলে গুদে চৈব পাবকং সমুপাশ্রিতঃ ।

বহ্নুত্রং পুরীষঞ্চাপ্য হপানঃ পরিবর্ততে ॥

প্রাযত্তে কৰ্ম্মণি বলে স এষ ত্রিষু বর্ততে ।

উদানমিতি তং প্রাহুরধ্যাত্মো বিদুষোজনাঃ ॥

সঙ্কো সঙ্কো সন্নিবিষ্টঃ সৰ্ব্বেষুপি তথা হনিলঃ ।

শরীরেষু মনুষ্যাণাং ল্যান ইতু্যপদিশ্যতে ॥

ধাতুযগ্নিস্তু বিততঃ স তু বায়ুসমীকৃতঃ ।

রসান্ বাতুংশ্চ দোষাংশ্চ বর্তয়ন্ পরিধাবতি ॥

প্রাণানাং সন্নিপাতাত্তু সন্নিপাতঃ প্রজায়তে ।

উষ্ণা চাধিরিতি জ্ঞেয়ো যো হন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥

সমানোদানয়োৰ্ম্মধ্যে প্রাণা হপানৌ সমাহিতৌ ।

সমন্বিতস্তুধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ ।

অস্থাপি পায়ু পর্য্যস্ত স্তথা স্মাদ্ গুদসংজ্ঞিতঃ ।

জ্যোতাংসি তস্মাজ্ জায়ন্তে সৰ্ব্বপ্রাণেষু দেহিনাম্ ॥

অগ্নিবেগবহঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহন্ততে ।

স উৰ্দ্ধমাগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পানকম্ ॥

পাকশয়স্ত্বহীনাত্যামূৰ্দ্ধমাগাশয়স্থিতঃ ।

নাভিমধ্যে শরীরস্ত প্রাণাঃ সৰ্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

তন্মিহ্ন যঃ সংস্থিতো হুগ্নি নীত্যাং স্থালামিবাহিতঃ ।

আত্মানং তং বিজ্ঞানীহি নীত্যাং যোগি জিতাত্মকম্ ॥

ব্যাধি কহিল, হে ব্রহ্মন ! সহস্রারে অবস্থিত বিজ্ঞানাত্মাশ্রিত বহিঃ শরীরকে পরিপালন করে, এবং প্রাণ, চিদাত্মা ও বহির সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয় । বিজ্ঞানোপহিত বহিঃ, চিদাত্মা, এবং প্রাণসমূহের সংঘাত বা সমষ্টিকে জীববলে, এই জীবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনিই সর্বভূতের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ, আমরা ইহার উপাসনা করিয়া থাকি ।

জ্বগাদি মধ্যে ব্যাণ্ড জঠরানল, বায়ু প্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমুদায় পবিত্র করিয়া সংরক্ষণ করিতেছে । প্রাণাদি বায়ুব একত্র সন্নিপাত হেতু সংঘর্ষণ জন্মে, সেই সংঘর্ষণ জনিত উদ্ভাকেই জঠর অগ্নি কহে, উহাতেই দেহীদিগের অন্নাদি ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক হইয়া থাকে । সমান ও উদান মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সমাহিত আছে, তন্মিশ্রিত প্রাণ, অপান ও সমানাদি সত্ত্ব বায়ুর সংঘর্ষণ জনিত অনল ধাতুগয় দেহকে গম্যক্ পরিবর্তিত করিতেছে । সেই অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রাদেশকে অপান বলিয়া নির্দেশ করা যায় । সেই অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে । অগ্নিবেগে উদ্ধগামী প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও উদ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্বার অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত কবে । নাভি অধোভাগ পাকস্থলী ও উদ্ধভাগ আগায় । নাভি মধ্যে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে । শরীরস্থ নাড়ী সকল প্রাণ প্রভৃতি দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে উদ্ধ, অধঃ ও তির্য্যকভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরস সকল বহন করিতেছে ।

স্থালী সমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিত করেন, তাঁহাকে আত্মাবলিয়া জানিবে ।

হেতুসূত্র ।

“সোহনস্ত পাবং ত্রিঙ্গকমায়ুর্বেদং মহাগতিঃ ।

যথাবদচিরাৎ সৰ্ব্বং বুবাধ” । চবক ।

পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমতে যতগুলি পদার্থ আনিকৃত হইয়াছে, তাহা সকলই কার্য্য কারণ সমষ্টি । অর্থাৎ মহৎ প্রকৃতি হইতে কীটানুর স্থাপিও-গত শোণিত পুঞ্জের অণু অংশ পর্য্যন্ত যত কিছু পদার্থ জ্ঞানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলই পবম্প্রব কারণ সাপেক্ষ ।

কোন কোন বিজ্ঞানবিদ বলেন,—এই যে গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্রমালা শোভিত গগনমণ্ডল এবং অসংখ্য জাতীয় অসংখ্য জীবগণের আধার বায়ুমণ্ডলের সহিত দেদীপ্যমান বসুন্ধরা, ঐচ্ছজালিকের মায়া বৈচিত্রের ন্যায় বিচিত্রতা দর্শাইয়া অহর্নিশ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়গণকে যথোচিত তৃপ্ত করিতেছে, এই বিচিত্রতা কেবল কার্য্য কারণ ভাবেব বিকাশ মাত্র । অতএব প্রোক্ত-মত-পোষক বৈজ্ঞানিক আচার্য্যগণ এই অসীম জগৎকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি কারণ, অপরটি কার্য্য, এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন । ইহার মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে যাহা এক সময়ে কার্য্য, তাহাই আবার অপর সময়ে কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়, যেমন পিতা, পুত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি ।

এই কার্য্য কারণ যেমন সূক্ষ্ম তেমনি মহৎ এবং অসংখ্য রাগে রঞ্জিত । জগদ্রূপক অতএব মহৎ, অনেক স্থলে অতি নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত অতএব সূক্ষ্ম, নানা বিধ বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত অতএব নানারাগে রঞ্জিত । কত সহস্র সহস্র শতাব্দ অতীত হইয়াছে এই অদ্ভুত কার্য্য কারণ ভাবের ইয়ত্তা হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না ।

আয়ুর্বেদে সঞ্জীবনীতে “হেতুসূত্র” উপলক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য কারণ ভাব উল্লেখ করিলাম বলিয়া পাঠক বিরক্ত হইবেন না, যেহেতু ক্ষুদ্রায়তন মনুষ্য শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডগত বস্তু সমূহের জাতিগত, ক্রিয়াগত, এবং গুণগত সম্বন্ধ কল্পনা করাই “হেতুসূত্র” প্রবন্ধের প্রধান অভিপ্রায় ।

আচার্য্য সুশ্রুত শারীরস্থানের উৎপত্তি প্রকরণে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ।

“তস্যোপযোগোহভিহিতঃ চিকিৎসাঃ প্রতি সর্বদা ।

ভূতেভ্যোহি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে” ।

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক দুঃখজনক ব্যাধির শাস্তিকারক উপদেশে ভৌতিক বস্তুর আলোচনা করাই আমাদের কর্তব্য, কারণ ভূতবিকার জন্য জীবগণের ভৌতিক ক্রিয়ার বিকৃতি-বস্থাই ব্যাধি, এবং ঐ ভৌতিক ক্রিয়াই আবার ব্যাধির শাস্তিকারক । বিজ্ঞানময় অনন্ত জগতের কি আশ্চর্য্যজনক কৌশল যে, যেসকল বস্তু মনুষ্যগণের জীবক বা উৎপাদক, তাহাই আবার দুঃখদায়ক বা জীবনঘাতক । পাঠক মনে করিতে পারেন যে, এই বিস্ময়কর মোহজনক ব্যাপারের মীমাংসক কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মুক্তকণ্ঠে অগ্নানচিন্তে বলিতে পারিব যে “হেতুসূত্র” ইহার প্রকৃত মীমাংসক । বলা বাহুল্য যে, ব্যাধির উৎপাদক জ্ঞানের অধীন হিতাহিত জ্ঞান, এই হিতাহিতজ্ঞানই এক প্রকার চিকিৎসা তত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ । আচার্য্য সুশ্রুত চিকিৎসা কাণ্ডের প্রথম উল্লেখই বলিয়াছেন ।

“সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদানপরিবর্জমঃ” ।

অর্থাৎ চিকিৎসার প্রথম গোপানেই রোগের উৎপাদক কারণ গুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে । অতএব রোগের উৎপাদক কারণ জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে হিতাহিত বিচারে সক্ষম হইবে, তদ্বিষয়ে

আর সন্দেহ হইতে পারে না । অপিচ যখন এই “হেতুসূত্র” দ্বারা নিখিল ব্যাধির উৎপাদক কারণ কল্পনার সমস্ত উপায় অবধারিত হইয়াছে, বিশেষ “হেতুসূত্র” “ব্যাধিসূত্র” “ঔষধসূত্র” এই ত্রিবিধ সূত্র, নিরন্তর অব্যভিচারিতভাবে সম্বন্ধ, তখন সৰ্ব্বপ্রধান হেতু-সূত্রের অন্তঃস্থল নিহিত তত্ত্বগুলি বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারিলে, অপর দ্বিবিধ সূত্রাত্মকজ্ঞান যে অল্লায়াসে অধীন হইয়া পড়িবে তাহার প্রতিবন্ধক কে হইতে পারে ? যেহেতু সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্কৌদ-শাস্ত্র প্রোক্ত ত্রিবিধ সূত্রে প্রথিত । চরক বলিয়াছেন,—

“ত্রিসূত্রং শাস্ত্রতং পূণ্যং”

অর্থাৎ এই বিশাল আয়ুর্কৌদ শাস্ত্র ত্রিসূত্রাত্মক নিত্য এবং পবিত্রজনক ।

প্রোক্ত আয়ুর্কৌদজ্ঞান যদি এই প্রকার সৌত্রিকাকারে রচিত না হইত, তবে অনন্তশক্তিশালী অনন্ত পদার্থের জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া পৃথকরূপে জ্ঞাত হওয়ার বাসনা আকাশ কুশুমের ন্যায় অসম্ভাবিত হইয়া পরিত । সূত্র প্রণয়নের মাহাত্ম্য এবং সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই পত্রিকার “ঔষধসূত্র” নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে । “ব্যাধি” কি পদার্থ, তাহাও “রোগ ও রোগের বিভাগ” নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে । অতএব তদ্বিময়ে আর পুনরুক্তি বিফল ও নিষ্প্রয়োজন বিধায় এই প্রবন্ধ কেবল হেতুশব্দ কাহার বাচক, এবং ইহার কার্যকারিতা ইত্যাদির প্রভেদ দর্শাইয়া প্রবন্ধ শেষ করিব ।

সকলেই “হেতু” শব্দে কারণ, বীজ, অথবা নিদান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য্য বোধে অনেকেই অনভিজ্ঞ । অতএব এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ প্রসঙ্গাধীন নিখিল হেতুর জ্ঞাপক হেতুর লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি ।

হেতুপ্রতিপাদক লক্ষণ আলোচনায় অস্বাদেশীয় ন্যায়বাদী

দার্শনিক আচার্য্যগণ এত অধিক বিচারমল্লতা দেখাইয়াছেন যে আজন্ম সেবা করিয়াও তাঁহাদিগের লক্ষ্য হেতুনির্বাচক শাস্ত্রের পারপ্রাপ্ত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ তাহা অত্যন্ত জটিল ও দুৰ্দ্ধোধ। অতএব এই প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করা বিফল।

আমরা সাধারণের বোধের নিমিত্ত হেতু শব্দের বাস্তবিক অর্থ এইরূপ বলিতে পারি যে “কোন প্রকার কার্য্য সাধনোপযোগী পদার্থ মাত্রই হেতুবাচক।” অর্থাৎ অতীত, অনাগত, এবং বর্তমান এই ত্রিবিধ কালে, দ্রব্য, গুণ এবং ক্রিয়া প্রভৃতি যে কোন পদার্থ যে কোন প্রকার ফলের সাধক হইবে, তাহাই “হেতু” বা কারণ। এই ফলসাধকত্ব তিনভাগে বিভক্ত; ১ম, প্রয়োজকতা; ২য়, সহকারিতা, ৩য়, উৎপাদকতা।

এই ত্রিবিধকারণ উল্লেখের প্রয়োজন যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। সংগ্রহীত সুপ্রসিদ্ধ চরক সংহিতা দ্বিত নিখিল ব্যাধির হেতু গ্রাহক প্রমাণের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেছি।

কালবুদ্ধীজ্ঞিদ্ব্যর্থানাং যোগো মিথ্যানচাতিচ।

দ্বয়াজ্ঞানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ ॥

অর্থ। কাল (শীতোষ্ণাদি) বুদ্ধি (সাধারণজ্ঞান, বিজ্ঞান) ইন্দ্রিয়ার্থ (জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের গ্রাহ্য বস্তু সকল); প্রোক্ত ত্রিবিধের যথাযোগ্য শরীর এবং মনের সহিত যে অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহাই শারীর এবং মানস ব্যাধির “হেতু”।

কেবল এই একটি মাত্র সূত্র অবলম্বনে নৈদানিকেরা বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কি রূপে এই সংক্ষেপ সূত্র হইতে অনংখ্য ব্যাধির সাধক অসংখ্য হেতু কল্পনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে বিস্তারিত লিখিতেছি।

পূৰ্ব্বোক্ত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ তিন প্রকার।

১ম, অতিযোগ, ২য়, মিথ্যাযোগ, ৩য়, অযোগ।

ইন্দ্রিয় ৫ পাঁচ প্রকার ।

১ম কর্ণ, ২য় চক্ষু, ৩য় রসনা, ৪র্থ নাসিকা, ৫ম জ্বক । *

ইন্দ্রিয়ের বিষয় ৩ পাঁচ ।

১ শব্দ, ২ রূপ, ৩ মধুরাদিরস, ৪ গন্ধ, ৫ স্পর্শ ।

কর্ণেইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দজ্ঞান ।

অতিযোগ । ১ । অশনি পাত এবং ঢকা প্রভৃতির অতি উচ্চ শব্দ এবং তৎসদৃশ অসুখজনক বিবিধ শব্দ, অনিবার্য্য ভাবে অধিক সময় কিম্বা বার বার শ্রবণ করা ।

মিথ্যাযোগ ২ । বিরুদ্ধ বাক্য অর্থাৎ কর্কশ বাক্য কি শব্দ শ্রবণ, অশুভসূচক বাক্য কি ভয়সূচক বাক্য কি শব্দের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা ।

অযোগ । ৩ । অধিক কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগুয়ে শ্রবণেইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয়ে অবকাশ থাকা ।

জ্বক ইন্দ্রিয়, বিষয় স্পর্শজ্ঞান ।

অতিযোগ । ১ । অতি শীতল বা অতি উষ্ণ বস্তুর অতি মাত্রায় স্পর্শ, অত্যন্ত শীতল বায়ু কি করকা

* অষ্টাশ্র দার্শনিকেরা কর্ণেইন্দ্রিয় ৫ পাঁচ এবং জ্ঞানেইন্দ্রিয় ৫ পাঁচ ও মন এই একাদশ সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু চরকার্য্য কেবল শ্রোত্র, জ্বক, প্রভৃতিজ্ঞানেইন্দ্রিয় পাঁচকেই ইন্দ্রিয় সংজ্ঞাদান করিয়াছেন, মনকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, সমনস্ক ইন্দ্রিয়গণের সদৃশ বুদ্ধি নিশ্চয়ত্ব প্রকারক জ্ঞানোৎপাদকমাত্র বলিয়াছেন । অষ্টাশ্র কর্ণেইন্দ্রিয় সকল মনের অধীন চেষ্টা মাত্র বলিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় মধ্যে পরিগণিত করেন নাই ।

চরক ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়াধ্যায় দেখ ।

বা হৈম জল (বরফ), প্রভৃতির অতিমাত্রায় ব্যবহার, অথবা অতিশীতল ভূমিতে বাস অথবা শীত বীৰ্য্য বস্তুর অধিক মাত্রায় উপ-যোগ । অতি উষ্ণ বায়ু সেবন কিম্বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে প্রবাস । অধিক সময় জলে ডুবিয়া থাকা, কি শীতবীৰ্য্য স্নেহমর্দন কি প্রয়োগ অথবা শীতল উৎসাদন বস্তুর অতিশয় ব্যবহার করা ।

মিথ্যাযোগ । ২ । পূর্বোক্ত স্পর্শজ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ সকল অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি ব্যবহারের কালাকাল অবধারণে বিমুখ হইয়া অনিয়ম ব্যবহার এবং স্নান, অভ্যঙ্গাদি, ও উৎসাদন প্রভৃতি ক্রিয়ার অসময়ে ও অনিয়মে ব্যবহার করা ।

অযোগ । ৩ । পূর্বোক্ত ক্রিয়া সকল এককালে পরিহার করা অথবা উচিত মাত্রা হইতে নূন মাত্রায় ব্যবহার করা ।

দর্শন ইন্দ্রিয়, বিষয় “রূপ” —

অতিযোগ । ১ । অসুখজনক দৃশ্য (সূর্য্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি) ভূয়োদর্শন ।

মিথ্যাযোগ । ২ । অতিসূক্ষ্ম, অতিক্রিষ্ট, অতিশয় তুরস্ব বস্তু, অতি নিকটস্থ বস্তু, অতিশয় ত্রাস জনক বস্তু, অতিশয় বিভৎসা জনক বস্তুর নিয়ত দর্শন করা ।

অযোগ । ৩ । এককালে দর্শন ক্রিয়া বিহীন (দৃষ্টি মুদ্রিয়া থাকা) হইয়া থাকার নাম অযোগ ।

ইন্দ্রিয়, রসনা, বিষয়, মধুরাস্ত্র প্রভৃতি রস ।—

অভিযোগ । ১ । মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কষায়, কটু, এই
ষট্ প্রকার রসের যে কোন প্রকার রসবিশিষ্ট
বস্তুর অধিক মাত্রায় নিয়ত আশ্বাদন করা ।

মিথ্যাযোগ । ২ । বিরুদ্ধ রস সম্পন্ন বস্তুর অর্থাৎ তিক্তরস অম্ল-
রসের সহিত তুলা পরিমাণ, কিম্বা কটুরস
মধুর রসের তুলা পরিমাণ প্রভৃতি যোগজরস
এবং আহার নিধির নিয়মিত জব্য সকল অনি-
য়ত সংযোগে ব্যবহার করা ।

অযোগ । ৩ । যে সকল বস্তু অত্যন্ত শুষ্ক এবং ক্লিন্ন হইয়া
শ্বাদ বিহীন কি রসাস্তুর কিম্বা নির্মিষ্ট রস
প্রায় হইয়াছে ঐ সকল বস্তু ব্যবহার করা ।

ইন্দ্রিয় নাসিকা বিষয়, গন্ধ,—

অভিযোগ । ১ । অতিতীক্ষ্ণ, অতি উগ্র অভিযান্দি অর্থাৎ নানা
প্রকার অনিষ্ট গন্ধ অতিমাত্রায় ব্যবহার করা ।

মিথ্যাযোগ । ২ । অতিশয় দুর্গন্ধ বস্তুর আশ্বান এবং যাহাতে
অস্তঃকরণ সর্বদা অনিচ্ছা ঐ প্রকারের গন্ধ
আশ্বান, অমেধ্য, ক্লিন্ন বস্তুর আশ্বান, বিষ
পুষ্পাদির এবং সরাদির ঘ্রান অতিমাত্রায়
ব্যবহার করা ।

অযোগ । ৩ । জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সর্বথা অব্যবহারে থাকা ইত্যাদি ।

ইন্দ্রিয়গণের অযোগাদি ত্রিবিধ সংযোগের নামান্তর,

“অনাত্মোন্নিয়র্থ সংযোগ” ।

বুদ্ধির অস্বাভাবিক সম্বন্ধ (মানসিকব্যাপারের সহিত বুদ্ধির
বিপরীত ক্রিয়া,) যদ্যপি সমস্ত ইন্দ্রিয় গণই বুদ্ধির অনুগামী, তথাপি

জ্ঞানের দ্বার প্রাপ্ত, বুদ্ধির ক্রিয়াশব্দে বাক্য, মন, প্রভৃতি শরীর চালনা কে বুঝিতে হইবে । চক্ষু, কণ, প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়কে আয়ুর্বেদিকেরা এক প্রকার স্বাধীন বলিয়া গিয়াছেন । কেননা তোমার ইচ্ছা না থাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু প্রভৃতির) সীমামধ্যে প্রত্যক্ষের উপযোগী বিষয় উপস্থিত হইলে দেখিতে বা শ্রবণ করিতেই হইবে । কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়, ১ বাক, ২ হস্ত, ৩ পাদ, ৪ পায়ু, ৫ উপস্থ এইপঞ্চ জংপূর্ণ বুদ্ধির অধীন । * । অতএব জ্ঞানের ক্রিয়া দর্শন কর্মেন্দ্রিয় স্ফীত স্তরায় বুদ্ধির অস্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কর্মেন্দ্রিয় হস্ত পাদাদির সঞ্চালন এবং বাক্য মনের বিকৃতভাব ভিন্ন আর কিছু লক্ষ্য হয় না ।

অতিযোগ । ১ । এই কায়িক ব্যাপার, ব্যায়াম, গমন, আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি শারীরিক বলের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং মল মূত্রাদি বেগের অতিরিক্ত বেগে উৎসর্গের নাম ।

মিথ্যা যোগ । ২ । ঐ সকল কায়িক ব্যাপার ব্যায়াম প্রভৃতির অসময়ে কি অনিয়মে চালনের নাম ।

অযোগ । ৩ । নিরবচ্ছিন্ন জড়ভাবে অবস্থান এবং মলমূত্রাদির উচিত বেগ রোধ করার নাম ।

বাগিন্দ্রিয় ।

অতিযোগ । ১ । অনর্গল অবিচ্ছেদে অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করার নাম ।

মিথ্যায়োগ । ২ । হিংসা জনক বাক্য, মিথ্যা বাক্য, কলহ এবং অশ্রদ্ধা জনক, অনুপযুক্ত, নির্ধূর, ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করার নাম ।

* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য এই ষড়বিধ ব্যাপার মানসিক ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত ।

৩ । অযোগ । বাক্য ব্যবহার পরিত্যাগ অর্থাৎ মুকের ন্যায় বাক্য রোধ করার নাম ।

মনের ক্রিয়া ক'মা'দি । মনের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ ।

১ । অতিযোগ । ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, দুঃখ, সুখ, প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার বেগে বর্দ্ধিত কি চালিত করার নাম ।

২ । মিথ্যায়োগ । অনিয়মে বা অসময়ে বেগে চালিত করা কি বর্দ্ধিত করার নাম ।

৩ । অযোগ । প্রাতি নিয়ত বেগ নষ্টোচ কিম্বা বেগ রোধ করার নাম ।

অন্যান্য দার্শনিকেরা কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এবং মন এই একাদশকেই ইন্দ্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন । চরকাচার্য্য কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫ পাঁচকেই ইন্দ্রিয় মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন । মনকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া মগনঙ্গ ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষোপযোগি বস্তুসমূহের নিশ্চয়ত্বাদি জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়াছেন । অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয় সকল মনের অধীন চেষ্টা মাত্র । অতএব তাহা ইন্দ্রিয় নহে ।

কায়কৃত্ত মনঃকৃত্ত এবং বাক্যকৃত্ত চেষ্টার মিথ্যায়োগ যাহা বলা হইয়াছে তন্ময় পরদার হরণ, চৌর্ধ্য, নিন্দা প্রভৃতি পাপজনক ক্রিয়াকে ও মিথ্যায়োগ বলিয়া জ্ঞানিতে হইবে ।

এই যে কায়াদি ত্রিবিধ ক্রিয়ার অযোগাদি ত্রিবিধি অবস্থা বলা হইল ইহার নাগান্তর “প্রজ্ঞাপরাধ” জ্ঞানের বৈকল্যাবস্থাজনিত জানিবে ।

কালের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ ।

কালশব্দে শীত, উষা, বর্ষার প্রাবৃত্তিস্বরূপ সংবৎসর । এই শীতাদি

ঋতুত্রয়ের অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগ যেক্রমে জানিতে হইবে তাহা নিম্নে লিখিতেছি ।

শীতঋতুর
অতিযোগ } ১। হেমন্তঋতু এবং শিশিরঋতু এই ঋতুদ্বয় শীত-
ব্যঞ্জক, অতএব এই ঋতুদ্বয়ে গ্রীষ্মপ্রধান
অথবা শীতপ্রধান অথবা সাধারণ দেশে যে
প্রকার শীতের প্রাচুর্য্য হওয়া আবশ্যিক তাহা
হইতে অধিক মাত্রায় শীতের ক্রিয়া প্রকাশ
হইলে তাহার নাম ।

মিথ্যাযোগ ২। এই মিথ্যাযোগ দুই প্রকার ১ প্রথম কালকৃত,
২য় স্বকৃত । কালকৃত মিথ্যাযোগ কালের
বিপরীত লক্ষণ—অর্থাৎ শীতঋতুতে যদি
শীতের অনুভব না হইয়া উষ্ণের অনুভব হয়,
অথবা বর্ষার প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় । স্বকৃত
মিথ্যাযোগ শীতঋতুতে যে নিয়মে আহার
ব্যবহার করার বিধি আছে তাহার বিপরীত
আহার ব্যবহারে রত থাকা ।

অযোগ ৩। যে দেশে যে প্রকার শীতাদি ঋতুর প্রকাশ
আবশ্যিক তাহা হইতে নূন পরিমাণ শীতাদির
অনুভব হইলে তাহার নাম ।

এই প্রকার গ্রীষ্ম, বর্ষা এই উভয় ঋতুর স্বীয় লক্ষণের আতিশয্য
প্রকাশ হইলে “অতিযোগ” বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ হইলে “মিথ্যা-
যোগ” হীন লক্ষণ প্রকাশ হইলে “অযোগ” জানিবে । কালের
শীতোষ্ণাদি স্বীয় লক্ষণ বিশেষ রূপে কালতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে
তদুপ্তে কালের বিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবে । ইহারই নামান্তর
“পরিণাম” জানিবে ।

পরন্তু ইন্দ্রিয়গণের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, বুদ্ধির অস্বাভাবিক সম্বন্ধ

এবং কালের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ । অসাম্যোদ্ভিয়ার্থ সংযোগ প্রভৃতি ইহারই নামান্তর ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অভিযোগাদির নাম “অসাম্যোদ্ভিয়ার্থ সংযোগ, বুদ্ধির অস্বাভাবিক সম্বন্ধ “প্রাজ্ঞাপরাধ”, কালের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ “পরিণাম” ইত্যাদি ।

পূর্বে কালাদি ত্রিবিধ হেতুর প্রোক্ত অসাম্যাদি ত্রিবিধ বিকারের কারণ জিজ্ঞাস্য হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে । ইন্দ্রিয়গণের অসাম্য সংস্থাপন করিতে হইলে, যাহা ইন্দ্রিয়ের অসাম্য বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল ইহা দ্বারা সাধারণের অর্থাৎ নিখিল মনুষ্যগণের সাম্য নির্দিষ্ট হইতে পারিলেও কুটতর্ক উপস্থিত হইতে পারে । কেননা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মনুষ্যের প্রকৃতি সাম্যও বিভিন্ন । এমত লোকও দৃষ্ট হয় যে সমস্ত দিন রাত্রি নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াও শারীরিক মানসিক কষ্টের অনুভব করে না এবং অপর কেহ কিঞ্চিৎ স্থানভ্রষ্ট হইলেই মহৎ ক্লেশের অনুভব করেন । এই সকল পর্যালোচনে ইহাই স্থির হয় যে, সাম্যের কোন নিশ্চয় নাই, কেবল যুক্তিমার্গ অনুসরণে সাধারণ যে রূপ প্রকৃতি সাম্যও তদনুসারে স্থির করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়গণের অভিযোগাদি দ্বারা ঐ প্রকারের আভাস উপস্থিত হইলেও নির্দিষ্টবাদে ব্যাপকতা প্রদর্শনের নিমিত্ত গ্রন্থকার “অসাম্যোদ্ভিয়ার্থসংযোগ” নামান্তর উপস্থিত করিয়াছেন ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে কোন প্রকার ফল সাধন যোগ্য পদার্থ মাত্রই “হেতু” ; নৈদানিকেরা এই ফল সাধনযোগ্যতাকে ভাগ দ্বয়ে সংস্থাপন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ পূর্বক যে প্রকার ফল সাধনতার গৌণমুখ্য কার্য্যকারিতা দর্শাইয়াছেন, তাহা নিম্নে বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিতেছি । ১ম বাহ্য হেতু, ২য়, অভ্যন্তর হেতু ।

প্রথম বাহু হেতু ৪ চারি প্রকার ।

যথা,—১ বিপ্রকৃষ্ট, ২ সমিকৃষ্ট, ৩ ব্যভিচারি, ৪ প্রাধানিক ।

বিপ্রকৃষ্ট হেতু, যাহা বহুকালে কার্য-

জনকতা প্রদর্শন করায় । ১ ।

এই বিপ্রকৃষ্ট কারণ “গৌণকারণ” অর্থাৎ যাহা অধিক সময়ে কার্য উৎপাদন করে । ইহার নিদ্বিষ্টলক্ষ্য একমাত্র সংবৎসরাত্মক “কাল”, এই বৎসরাত্মক কাল ঋতুদ্বয়কে বিভক্ত হইয়া আভ্যন্তরিক প্রধান কারণ বায়ু, পিত্ত এবং কফের সঞ্চয়, প্রাকোপ এবং প্রশমনের কারণ হয় অর্থাৎ বায়ুর সঞ্চয় কাল “গ্রীষ্মঋতু” প্রাকোপের কাল “বর্ষাঋতু” শমতার কাল “শরৎঋতু” ইত্যাদি । এই “সঞ্চয়” “প্রাকোপ” “প্রশম” অনিবার্য । তুমি যে অবস্থায় কেন থাক না বায়ু, পিত্ত, কফের কালিক ক্রিয়ার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে পারিবে না । এখন দেখিতে হইবে ইহার গৌণ কারণ কিসে প্রতীপন্ন হইতে পারে । গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভেই বাসন্তিক বৃদ্ধিত স্লেষ্মা ক্রমে শমতা প্রাপ্ত হইতে থাকে; যেমন সূর্য্যাকিরণের আতিশয্যের সহিত প্রাকোপিত স্লেষ্মার পারিমাণিক ন্যূনতা হইবে, তেমনি অগতের রক্ততায়ুজির সহিত বায়ুর পারিমাণিক আধিক্য লক্ষিত হইবে । যদিও গ্রীষ্মঋতুতে বায়ু ক্রমে ক্রমে সঞ্চয় হইবে বটে; কিন্তু তাহার রোগোৎপত্তির ক্ষমতা, বর্ষাঋতুতে লক্ষিত হইবে । সুতরাং দেখা যায়, যখন যে ঋতুতে সঞ্চয় হইল ঐ ঋতুতে ক্রিয়া দর্শাইতে অক্ষম হইয়া ছুইমাস পরে (অনুঋতুতে) কার্যক্ষম হইল, তখন ইহার জনকতার গৌণত্বই বলিতে হইবে । এই প্রকার ঋতুর অনুযায়ী কার্যকারণতার বিশেষরূপে কালতত্ত্বে বর্ণিত আছে । অতএব কালতত্ত্ব দৃষ্টে তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ।

সম্বন্ধেহেতু যাহা সাক্ষাৎ ব্যাধিজনক । ২ ।

ইহাকে মুখ্য কারণ বলিয়া গণিতে হইবে । যেমন মিথ্যা আহার এবং মিথ্যা ব্যবহার স্বরের নিকট কারণ ।*

ব্যভিচারিহেতু যাহা দুৰ্দ্ধলপ্রযুক্ত ব্যাধি জন্মাইতে পারে না । ৩ ।

এই ব্যভিচারী হেতুর উল্লেখ করায় গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইরূপ মনে করিবে যে, যে কোন পদার্থ যে কোন পদার্থের জনক হইবে, তাহার কর্তৃত্বের অনাগত স্বীকার করিলেই তাহাকে ব্যভিচারী বলা যায় । যেহেতু তাহার জনকতা সন্দেহ ও কার্যের অভাব হইতেছে । ইহার নামান্তর “স্বরূপ যোগ্যতা” অর্থাৎ কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুৰ্দ্ধল থাকিবে ততক্ষণ তাহার সম্পূর্ণতার (যতদূর কার্যক্ষম) অভাব হেতু সাক্ষাৎ কার্যকারিতা স্বীকার করিব না । যেমন ঘটের উৎপত্তি সম্বন্ধে অরণ্যস্থ দণ্ডের স্বরূপ যোগ্যতা আছে বলিয়া তাহারও কারণতা স্বীকার করিতে হইবে । কেননা ঐ দণ্ড কাঁটিয়া আনিলে তাহারও জনকতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইবে ।

প্রাধানিক হেতু । ৪ ।

যাহা সংযোগ মাত্রে তৎক্ষণাৎ মোহ, মূছ্রা, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ জন্মায় অথবা প্রাণবিনাশ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম । যেমন বিষ, মাদকদ্রব্য, অশনিপাত প্রভৃতি ।

* এই আহার ব্যবহারের বিষয় ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ উল্লেখ হইয়াছে বিশেষ প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইবে ।

এই মিথ্যা আহার মিথ্যা বিহার শব্দে পূর্বেক্ত অভিযোগ, অযোগ, মিথ্যায়োগ মনে করিবেন । এস্থানে মিথ্যা বিহার শব্দে বলবৎ বিবাহাদি অর্থাৎ অত্যন্ত দুৰ্দ্ধল ব্যক্তি বলবান ব্যক্তির অনুকরণ করা, যেমন উরঃক্ষত রোগে ধনুরাকর্ষণ প্রভৃতি ।

প্রোক্ত চতুর্বিধ “বাহুহেতু” পূর্বেক্ত “অসাম্যোদ্ভিয়ার্থ সংযোগ” “প্রজ্ঞাপরাধ” “পরিণাম” এই ত্রিবিধ হেতুর অন্তর্গত হইলেও প্রস্তাবিত চতুর্বিধ হেতুর উক্তি দ্বারা হেতুসমূহের গোণ, মুখ্য, দুর্বল প্রভৃতি অবস্থা বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত নামাস্তর দ্বারা উক্ত হইল ।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি হেতুর ফল সাধকতা তিন প্রকার ।
১ প্রয়োজকতা, ২ উৎপাদকতা, ৩ সহকারিতা ।

প্রয়োজক শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহার হইবে যে যেমন রথগতির প্রয়োজক কারণ “সারথি” এতদ্রূপে ব্যাধির উৎপাদক কারণ বায়ু, পিত্ত, কফ, এবং রসাদি সঞ্চারিত । বাহু হেতু ঐ দোষের এবং দোষের বিকৃতভাবের কারণ—সুতরাং প্রয়োজকতা হেতুর অবাস্তর “বাহুহেতু” ।

আচার্যগণ বাহুহেতু নির্দেশে “দোষ ভেদ বিকল্পাধ্যায়ে” ৬৩ তেযটী প্রকার রসানুযায়ী দোষের ভেদ কল্পনা করিয়াছেন । এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়ের ভেদ কল্পনা করিলে অসংখ্য কল্পনা হইতে পারে । এই বিষয়ের গীমাংসা লেখনী দ্বারা সম্পন্ন করা অসম্ভব, অতএব দেখিতেছি এই হেতু ভেদ কল্পনা কেবল বিজ্ঞানোন্নত-চিত্ত দীর্ঘপ্রকৃতি সুচতুর চিকিৎসকের জ্ঞানালোকের অধীন । কিন্তু ব্যাধির প্রয়োজকহেতুর কল্পনা বিষয়ে এই ক্ষুদ্রায়তন পত্রিকায় তদ্রূপ অগীমাংসা হইলেও পাঠকবৃন্দের কথঞ্চিৎ জ্ঞানের নিমিত্তে সংগ্রহকারণের সাধারণ হেতুর জ্ঞাপকতার উপলক্ষিত প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি ।

বায়ুপ্রকোপের বাহুকারণ ।

ব্যায়াম, লজ্জন * (উপবাস বা লঘু ভোজনাদি দশ

* চারি প্রকার সংশোধন অর্থাৎ বমন, বিরেচন, নিকহ, অনুবাগন,

প্রকার * । পতন, হস্তপাদাদি ভঙ্গ, ক্ষয়, (রসরক্তাদি ধাতুক্ষয়,)
রাত্রিজাগরণাদি, মলমূত্রাদি রোগধারণ, শোক, অতি শীতল ব্যব-
হার, অতিভ্রাশ, রুদ্ধক্রিয়া, ক্ষোভ, (মানসিক ক্রোধ) কষায় রস,
কটুরস, আকাশে মেঘের উদয় (বর্ষাঋতু), আহারের সম্যক
জীর্ণাবস্থা । দিবসের শেষভাগ, রাত্রির শেষভাগ, বয়সের
শেষভাগ । †

পিত্তপ্রকোপের বাহ্যকারণ ।

কটুরস, অম্লরস, উষ্ণবস্তু, বিদাহ পাকজনক বস্তু (বংশাঙ্কুর
প্রভৃতি) তীক্ষ্ণবস্তু (ক্ষার এবং চিত্তাপ্রভৃতি) লবণ, ক্রোধ, উপবাস,
(অনাহার) সূর্যাস্তাপ, অধিক স্নানসেবা, তিল, অতমী, দধি, গম্ভ-
মমূত, সূক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার কাঞ্জী (আমানী) আহার জীর্ণ
সময়, ভোজন মধ্যসময়, শরৎঋতু গ্রীষ্মঋতু, দিবসের মধ্যসময়,
রাত্রির মধ্যসময় । ‡

কফপ্রকোপের বাহ্যকারণ ।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, মধুর রস, স্নিগ্ধবস্তু, তৈলবসাদি, দুগ্ধ,
ইক্ষু, দ্রববস্তু, (পানীয়) দধি, দিবানিদ্ৰা, পিষ্টক, স্নাত, যে সকল বস্তু

পিপাসা, বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবন, পাচনদ্রব্য, উপবাস, ব্যায়াম, এই দশ
প্রকার লজ্জন কথিত হইল ।

* লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিষদ, রুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সর, কঠিন, এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ
উপবাসের ফলদায়ক ।

† ব্যায়ামাদপতর্পণাৎ প্রপতনাৎ ভঙ্গাৎ ক্ষয়াজ্জাগরাৎ বেগানাঞ্চ
বিধারণাদতিশুচঃ শৈথ্যাদতি ভ্রাসতঃ রুদ্ধক্ষোভকষায় তিত্তকটুৈকৈরভি-
প্রকোপং ব্রজেৎ বায়ুর্বারিধরাগমে পরিণতে চারৈহপরাক্লেহপিচ ।

‡ কটু, স্নেহ, বিদাহ, তীক্ষ্ণলবণক্রোধপবাসাতপজ্জীসম্পর্কভিলাতমীদধিস্মরা
সূক্তারনালাদিভি মধ্যাহ্নেচ তথাক্ষরাত্রিসময়ে পিত্তং প্রকোপং ব্রজেৎ ।

অভিমানি (প্রোক্তরোধজনক) হেমস্তঋতু, দিবসের এবং রাত্রের প্রথমভাগে ভোজনের প্রথম সময়, বসন্তঋতু । *

অভ্যন্তর হেতু বা উৎপাদক হেতু ।

ইতিপূর্বে বাহ্যহেতুর বিষয় সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব লিখিত হইয়াছে অধুনা অভ্যন্তরহেতু বা উৎপাদকহেতুর বিষয় লিখিত হইতেছে ।

এই জগতের ক্রিয়াবৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করিলে ইহাই নিশ্চয় হইবে যে এই জগতের ক্রিয়া অচিন্ত্য, সূতরাং প্রত্যক্ষাতীত বিষয়ে যিনি যাহা বলিয়াছেন সকলেরই যুক্তিমতানুযায়ী অনুমান অবলম্বন ভিন্ন আর কিছু দেখিতেছি না । যে স্থলে কেবলমাত্র যুক্তি এবং অনুমানই প্রধান অবলম্বন সে স্থলের মীমাংসায় কতদূর সত্য আবিষ্কার হইতে পারে তাহা মহানুভব পাঠক বিবেচনা করিতে পাবেন । জাগতিক সমস্ত বিষয়ের অনুমান যেমন কার্য-লিঙ্গক (কার্য দ্বারা কারণ নিশ্চয় করা) অভ্যন্তর কারণ নিশ্চয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ । শারীরিক ব্যাধি (কষ্ট অনুভব) দ্বারা তাহার উৎপাদক কারণের অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে ।

আচার্য্যগণ যেসকল নিয়মের অধীন হইয়া এই ছবারোহ হেতু নির্দেশের সাক্ষ্য সূত্র আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন তাহা সবিশেষ নিম্নে লিখিত হইতেছে ।

সর্বদা সর্বভাবানাং সালান্ত্রং বুদ্ধিকারণং

হ্রাস হেতু বিশেষঃ স্যাৎ প্রবৃত্তিকৃতম্যচ ।

সামান্ত্রমেকত্বকরণং বিশেষস্ত পৃথকত্বকৃৎ

তু ভাষিতা হি সামান্ত্রং বিশেষস্ত বিপর্য্যয়ঃ ॥ চরক ।

* শুক্রমধুর রসাদি স্নিগ্ধলুপ্তৈশ্চ জবদধিদিবানিদ্ৰাপূর্ণসর্পিঃ প্রপূরৈঃ ।

তুহিনপতনকালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্ষমাংসে

বসন্তে । ৩ ।

আচার্য্যপ্রবর এই সূত্রটি দ্বারা তাঁহার মাননিক ভাব যে ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহা অনুবাদ দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে এতাদৃশিক বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে যে, তদ্বিষয়েরই একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয় । অতএব এখানে আগরা কেবল ইহার ভাবার্থ মাত্র লক্ষ্যন করিয়া দিলাম; যদি কোন পাঠক দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে মূলগ্রন্থটীকার সহিত দেখিবেন ।

যদিচ আচার্য্য প্রথমোক্ত শ্লোকটির শব্দ বিস্তার কঠিন মনে করিয়া দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা তাহার অর্থ অনেক প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি পাঠকগণের বোধের সৌকার্য্যার্থে কতকগুলি শব্দের অর্থ লিখিত হইল ।

সৰ্ব্বদা	১।	কালবোধক “দা” দুই প্রকার কাল বাচক । ১ম, নিত্যগ, (যাহা নিত্য গতিশীল) নীত এবং উষাদি । ২য়, আনুষ্টিক । প্রাণী এবং অপ্রাণীর বাল্যাদি অবস্থা এবং বস্তুগত জব্যাস্তর সংযোগ অথবা সংস্কার জন্য গুণ এবং ক্রিয়া ভেদক অবস্থা ।
সৰ্ব্বভাব	২।	জগতেব বিজ্ঞান বস্তু সমূহ ।
সামান্য	৩।	জব্য ক্রিয়া, গুণ, প্রভৃতি পদার্থেব একীভাব ।
বিশেষ	৪।	পূৰ্ব্বোক্ত জব্য প্রভৃতির পৃথক্ ভাবব্যাঞ্জক ।

৫. ‘ঃ’ ভাবার্থ ।

যেকোন পদার্থের ক্রিয়া, গুণ বা জব্যের সহিত পদার্থাস্তরের জব্য ক্রিয়া, ক্রিয়া গুণের একীভাবাপন্ন মিলন বৃদ্ধির কারণ এবং ইহাদিগের পৃথক্ ভাবাপন্ন মিলন হ্রাসের কারণ ।

তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন পদার্থ যে কোন পদার্থাস্তরের সহিত পরিগণ, ক্রিয়া, গুণ অথবা যে কোন অবস্থা দ্বারা তুল্যতা

প্রাপ্ত হইবে তাহাই ঐ বস্তুর সেই সেই পরিমাণাদির বুদ্ধির কারণ। তদ্ব্যতিরিক্ত ভিন্ন ভাবের মিলন হ্রাসের কারণ, যেমন দুষ্ক এবং জল ভুগ্যপরিমাণে সংযুক্ত হইলে একীভাবাপন্ন তরলতার বুদ্ধির কারণ হয় তদ্রূপ ঐ পরিমাণ দুষ্কে ঐ পরিমাণ বাষ্পীকরণ মিশ্রিত করিলে তারল্যের বৈশিষ্ট্য হেতু দুষ্কের তারল্য হ্রাসের কারণ হইবে। এই দৃষ্টান্ত কেবল পাঠকগণের অনায়াসে বুঝিবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইল, বস্তুতঃ অভ্যস্তরস্ব ভব্যগমূহের হ্রাস বুদ্ধি কেবল দৃষ্টান্তের অনুযায়ী অনুভব মাত্র। এই অনুভব যে প্রকারে অব্যভিচারী হইয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মনুষ্য শরীরের উপাদান অষ্টাদশ প্রকার। বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, মল, মূত্র, স্বেদ, আর্ত্ব, স্তন্য, সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই অষ্টাদশ প্রকারের মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধের দোষ সংজ্ঞা। রসাদি শুক্র পর্যন্ত সপ্তবিধ পদার্থের ধাতু সংজ্ঞা। মলাদি ত্রিবিধের মল সংজ্ঞা। আর্ত্ব এবং স্তন্য এই দ্বিবিধের উপধাতু সংজ্ঞা। সত্ত্বাদি ত্রিবিধের গুণ সংজ্ঞা। ইহার। সকলই শরীরের ধারক ও পোষক। প্রবক্ষ্যন্তরে বলা হইয়াছে যে ইহাদিগের কোন একটুপ্রকার পদার্থের হ্রাস বা বুদ্ধি অথবা বিকৃতি হইলেই আত্মার কষ্ট অনুভব হয় এবং ঐ প্রকার যাতনার অনুভবই ব্যাধির বোধক।

আমরা হেতুসূত্র নামক প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবর্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু প্রসঙ্গাধীন অপর বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধের অসংপূর্ণতা দোষ লক্ষিত হয় অতএব দুইএকটি কথা লিখিতে হইতেছে।

যখন দেখা যায় শারীরিক পদার্থ নিচয়ের হ্রাস বা বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বিকৃতভাবে ভিন্ন রোগ আর কিছুই নয়। তখন এই কার্য কারণ ভাব প্রকাশ করিতে হইলে কারণে কার্যের উপচার অবশ্য স্বীকার।

করিতে হইবে। কেননা যে অষ্টাদশ পদার্থ শরীরের উপাদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তন্মিহ আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই।

এই প্রকার ব্যাধিস্বরূপ কার্য্য এবং অভ্যস্তরিণ উৎপাদক কারণ দোষাদি পদার্থের একীভাব সম্পাদন করার অভিপ্রায় প্রকাশের বাসনায় পুরোক্ত সূত্রটির আবিষ্কার হইয়াছে। যেহেতু বলা হইয়াছে যে “ভুল্যার্থতাহি সামান্যং” অর্থাৎ বাহ্য আহার আচার কর্তৃক শরীরের ক্ষতিপূরণ ভিন্ন উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের যে কোন প্রকার ভুলাতা সম্পাদনই স্বক্ৰিয় কারণ। অপর বলিয়াছেন “বিশেষস্ত বিপর্যায়ঃ” অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার বৈপরীত্য সম্পাদন ক্ষয়ের কারণ। এমতাবস্থায় অভ্যস্তর পদার্থ সকল যেমন ক্ষয় স্বক্ৰিয়াক ব্যাধির কারণ তেমন ঐ ক্ষয় স্বক্ৰিয়রূপ কার্য্যও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব বলিয়াছি কারণে কার্য্যের উপচার স্বীকার করিতে হইবে। সস্বদয় পাঠক এই প্রকার কার্য্যকারণ ভাব প্রয়োগ ক্ষয় স্বক্ৰি স্থলে চিন্তা করিবেন।

যে অষ্টাদশ পদার্থ শরীরের উপাদান বলিয়া নির্দেশ করা হইল এই অষ্টাদশ প্রকার পদার্থ অভ্যস্তর কারণ বা উৎপাদক কারণ।

কারণবাদি আচার্য্যগণ এই অভ্যস্তর কারণকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, —

১ম, নিমিত্তকারণ। ২য়, সমবায়িকারণ। ৩য়, অসমবায়িকারণ।

১। যাহা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়ত অবস্থান পূর্বক অবাভিচারে কার্য্য উৎপাদন করে তাহাই “নিমিত্তকারণ”।

২। যে অধিকরণে কার্য্যদ্রব্য নিয়ত সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে তাহা “সমবায়িকারণ”। *

* “সমবায়” সম্বন্ধ বিশেষ অর্থাৎ গুণ ক্রিয়া এবং দ্রব্য হইতে পৃথক্, কিন্তু এমত ভাবে দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ যে তাহা কখন পৃথক্ হইতে পারে-

৩। সমবায়ি কারণে সম্বন্ধ থাকিয়া যে গুণ বা ক্রিয়া, কার্য্য উৎপাদন করে তাহার নাম অসমবায়িকারণ ।

যেমন বজ্রবায়ন কার্য্যো, নিষ্পাদক যজ্ঞ এবং তন্তুবায় “নিমিত্ত-কারণ”, তন্তুসমূহ “সমবায়িকারণ”, পুরুষ্পার তন্তু সংযোগ “অসম-বায়িকারণ” ।

ব্যাধির উৎপত্তি বিচারেও দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ,) নিমিত্ত কারণ ণ। দুয়া (রসাদি চতুর্দশ পদার্থ *) সমবায়িকারণ । দোষ দুয়ের সংমূর্ছনাবস্থা (বিকৃত সংযোগ) অসমবায়িকারণ ।

এই ত্রিবিধ কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান নিমিত্ত কারণ, বায়ু পিত্ত কফের বিষয় প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছি । যেহেতু এই ত্রিধাতু শারীরিক সকল পদার্থাবগাহী এবং ব্যাধি জন্মাইবার পক্ষে অব্যভিচারী ।

যেমন শকুন্ত পাখী সমস্ত দিক জ্ঞমণ করিয়াও নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তজ্জপ যত প্রকার ধাতু বৈষম্যজনিত রোগ শরীরে উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা সকলই বায়ু পিত্ত কফের সংস্রব ব্যতিরেকে জন্মিতে পারে না । তাহার তাৎপর্য্য এই, যে কোন ব্যাধি যেকোন নিয়মের অধীন হইয়া প্রকাশ পাইবে “দোষ” তাহার অব্যভিচারিকারণ । দোষ শব্দে এস্থলে বায়ু, পিত্ত, এবং কফ এই ত্রিবিধ ধাতুকে বুঝিতে হইবে । যেমন বহির অনু-গানের প্রতি ধূম অব্যভিচারে সহচর কারণ, তেমন শরীর ব্যাধির

না । এই প্রকার জ্বোর সহিত গুণের এবং ক্রিয়ার যে নিত্য সম্বন্ধ তাহাই সমবায় ।

* এই নিমিত্তকারণ “দোষ” ও ক্রিয়াদি ব্যাধির সময়ে “সমবায়িকারণ” রূপে লক্ষিত হইবে ।

† এই স্থানে চতুর্দশ পদার্থের উল্লেখের কারণ সম্বন্ধের বিকৃততাব অস্বীকার করিতে হইবে ।

প্রতি “দোষ” অব্যভিচারে সহচর কারণ এবং মানস ব্যাধি উন্মাদ প্রভৃতির সহচর এবং অব্যভিচারি কারণ রক্তঃ এবং তমোগুণ । আচার্য্যগণ এই অব্যভিচারিত্ব সংস্থাপক যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কতিপয় যুক্তি এবং শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ।

রসরক্ত প্রভৃতি ধাতু পরস্পর ব্যভিচার ভাব ব্যঞ্জক, কারণ যে ব্যাধি রসদোষে জন্মিয়া থাকে তদ্বারা রক্ত কিম্বা তদিতর কোন ধাতু কি উপধাতু দূষিত হয় না । অপিচ ইহারা পরস্পর কেহ কাহারও সহায়ও হয় না । যথা,—

“সস্ততঃ রসরক্তশ্চ নোন্মোহ্যঃ পিশিতাশ্লিতঃ । মেদোগতশ্চতীরে-
হীত্যাদি” ।

অর্থাৎ সস্তত নামক স্বর রস এবং রক্তশ্চ দোষ কর্তৃক ও অন্য-
দ্যাক স্বর মাংসধাতুশ্চ দোষ কর্তৃক, তৃতীয়ক মেদোগত ইত্যাদি । ইহা
দ্বারা এইরূপ জ্ঞাত হইবে যে, দোষ বায়ু পিত্ত এবং কফ সর্বত্রগামী
এবং ছষ্টিকারক । কিন্তু রসাদি ধাতু এবং উপধাতু পরতন্ত্র এবং
অব্যাপক ।

এই উপক্রমে বাগ্ভট বলিয়াছেন ।

“তে বাপিনোহপিঅন্নাতোরধোমধ্যোর্ধ্ব সংশ্রয়াঃ ।

তে ইতি বাতপিত্তকফাঃ । টীকা ।

অর্থাৎ উপরি উক্ত সর্বশরীর ব্যাপী বায়ু পিত্ত কফ স্বদয় এবং
নাভির মধ্যস্থ হইয়া দৈহিক সর্বক্রিয়া নিম্পত্তি করিতেছে ।

পুনরপি আচার্য্য বৃক্ষশূত্রকৃত ত্রণ প্রমাখ্যায়ে বলিয়াছেন ।

“বাতপিত্ত শ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ । তৈরেবাবাপনৈরধো
মধ্যোর্ধ্বসমিবিহৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতে অগারমিব শূলভিত্তিস্থভিরতল্লিঙ্গ
মাহুরেকে । তএবচ বাপন্য প্রলয় হেতবঃ ।

অর্থ । বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই ত্রিবিধ ধাতু দেহসম্ভবের
কারণ । যেমন স্তম্ভের আশ্রয়ে গৃহ প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ বায়ু প্রভৃতি

ত্রিবিধ দাত্ত প্রাভাবিক অবস্থায় অবস্থান পূর্বক শরীরের অধঃ, মধ্য, উর্দ্ধ নিবিষ্ট থাকিয়া শরীরকে ধারণ করিতেছে । এই ত্রিধাত্ত দূষিত হইলেই দেহনাশের কারণ হইয়া পড়ে । অতএব এই শরীরকে কোন পণ্ডিত ত্রিস্থল বলিয়াছেন ।

এই সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের মতানুসারে এই প্রকার বলিতে পারা যায় যে, পূর্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার উপাদান পদার্থের মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফই প্রধান উপাদান । যেহেতু এই ত্রিধাত্তের বিকৃতি হইলে দেহস্থ সকল পদার্থই বিকৃত হইয়া পড়ে । অতএব দোষ শব্দে অন্য কোন পদার্থকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিবিধ পদার্থ বুঝিতে হইবে । সুতরাং এই ত্রিধাত্তই শরীর পালন এবং নাশের অব্যভিচারী কারণ, দূষ্য বলিলেই রসাদি চতুর্দশ পদার্থকে বুঝিবে । এই দোষই উপাদক কারণকলাপের মধ্যে “নিমিত্ত কারণ” অপর চতুর্দশ পদার্থ “সমবায়ি কারণ” ।

এইক্ষণ দেখা আবশ্যক যে কি নিয়মে পূর্বোক্ত দোষ শরীরে বিচরণ করত ব্যাধি জন্মাইতেছে ।

ইতিপূর্বে যে, বাহ্যহেতুর বিষয় বলা হইয়াছে এই বাহ্যহেতুর প্রভাবে বায়ু প্রভৃতি ত্রিধাত্ত দূষিত হইয়া দোষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে নানাপ্রকার বিকৃত রূপ ধারণ এবং বিকৃত গতিদ্বারা অপর পদার্থ সকলকে বিকৃত করিয়া ক্লেশদায়ক ব্যাধিব কারণ হয় । এই সকল অবস্থা এবং গতিব বিবরণ নিম্নে দৃষ্টি করিবেন ।

ক্ষয়ঃস্থানঞ্চ বৃদ্ধিঃ চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধাগতিঃ । চরকঃ শ্রুঃ ।

এই ত্রিদোষের সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা । যথা—সমাবস্থা, বৃদ্ধ্যবস্থা এবং ক্ষয়াবস্থা ।

১ । সমাবস্থা—যে অবস্থা দ্বারা শরীর পরিপালিত হয় * ।

* এই অবস্থার বিষয় শ্লোকের অনুরোধে উল্লেখ হইল ইহা এই স্থলে অপ্রয়োজন ।

২ । ক্ষয়াবস্থা—এই ক্ষয় দুই প্রকার জব্যগত পরিমাণের ক্ষয় এবং গুণগত সংখ্যার ক্ষয় ।

যেমন যমন বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা শরীরগত পিত্তাদি নিঃসরণ করিলে জব্যগত পরিমাণেব হ্রাস হইয়া থাকে । এবং স্বেদন, লজ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা জব্যগত পরিমাণের হ্রাস না হইয়া গুণগত সংখ্যার হ্রাস হইয়া পড়ে ।

৩ । রূপ্যাবস্থা—ইহার অর্থও জব্যগত অর্থাৎ সমুদায় গুণের সহিত জব্যগত পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা কোন কোন গুণেব পরিমাণ বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে ।

এই পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ বাহ্যহেতু, বাহ্যহেতুর যে গুণ যে দোষের বর্ধক তদ্বারা তদ্রূপ জব্যের কি গুণের পোষণ করিবে ।

যেমন “কষায় রস” বায়ুর সর্বাংশের বর্ধক অর্থাৎ শীতলতা, লঘুতা, রক্ষতা, বিশদতা, বিষ্টকতা, প্রভৃতি যেমন বায়ুর গুণ, কষায় রসও ঐ সকল গুণবিশিষ্ট ; সুতরাং কষায় রস বায়ুর সকল প্রকারে বর্ধক । (প্রত্যেক সমানগুণ প্রত্যেক গুণের বর্ধক) *

উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, রক্ষতা, লঘুতা, বিশদতা গুণবিশিষ্ট পিত্ত ও কটুরস সমান, সুতরাং কটুরস পিত্তেব সকল অংশের বর্ধক । †

মধুরতা, স্নেহ, গৌরব, শৈত্য, পৈচ্ছিল্য গুণবিশিষ্ট “শ্লেষ্মা”; তাহার তুল্য গুণবিশিষ্ট “মধুর রস”; অতএব মধুর রস শ্লেষ্মার সর্বাংশের বর্ধক । ‡

* তত্রশৈত্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশম্যবৈষ্টক্যালক্ষণো বায়ুস্তস্য সমান যোনিঃ কষায়রসঃ । গোহস্য শৈত্যাৎ শৈত্যাৎ বর্ধয়তি রৌক্ষ্যাৎ রৌক্ষ্যাৎ লাঘবাৎ লাঘবং বৈশম্যাৎ বৈশম্যাৎ বৈষ্টভ্যাৎ বৈষ্টভ্যামিতি ।

† ঔষ্মাতৈক্ষ্যং রৌক্ষ্যলাঘববৈশম্যালক্ষণং পিত্তং । তস্য সমান যোনিঃ কটুরসঃ । সোহস্যোষ্ণাৎ ঔষ্ণাৎ বর্ধয়তি তৈক্ষ্যাৎ তৈক্ষ্যাৎ রৌক্ষ্যাৎ রৌক্ষ্যাৎ লাঘবাৎ লাঘবং বৈশম্যাৎ বৈশম্যামিতি ।

‡ মাধুর্যাস্নেহগৌরবশৈত্যপৈচ্ছিল্যগুণলক্ষণঃ শ্লেষ্মা তস্য সমান যোনি-

এই নিয়মে বায়ু, পিত্ত, কফের ক্ষয় এবং রুক্ষি বাহ্যহেতুর উপ-
যোগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া বিকারজনক হইয়া থাকে । যদিও ক্ষয়ের
বিষয় বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই বটে, কিন্তু যে নিয়মে রুক্ষি
তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট বস্তু উপযোগে যে ক্ষয় হইবে তাহা
বলা বাহুল্য । পাঠকগণের বিদিতার্থে তাহাও কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা
গেল । যেমন “কটুরস” শ্লেষ্মার সর্জন্যের নাশক অর্থাৎ উষ্ণতা দ্বারা
স্নেহ, কটু দ্বারা মধুর, লঘুতা দ্বারা গৌরব, বৈশাণ্ড দ্বারা পিচ্ছিলতার
নাশ হয়* ইত্যাদি । এতদ্ভিন্ন প্রোক্ত নিমিত্তকাবণ বায়ু, পিত্ত, কফের
আরো ৬ প্রকার অবস্থার ব্যাধিজনকতা আচার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন,
তাঙ্গ ক্রমে নিম্নে বিস্তার করিয়া আলোচনা করিতেছি, পাঠক
একবার পাশ্চাত্য মতেন সহিত তুলনা করিয়া দৃষ্টি করিবেন যে
ভারতীয় আয়ুর্বেদে মহর্ষি সম্প্রদায় এসম্বন্ধে কি পরিমাণ অনুসন্ধিৎসু
ছিলেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন ।

১ মধুর, ২ প্রাকোপ, ৩ প্রসব, ৪ স্থানমন্ত্রায়, ৫ অভিব্যক্তি, ৬ ভেদ,
সঞ্চয় ।

এই সঞ্চিত্ত দোষ এক প্রকার পূর্কোক্ত “ব্যভিচারী হেতু” বলা
যাইতে পারে ।

মনুষ্যশরীরব্যাধি বায়ু, পিত্ত ও কফ স্থান এবং ক্রিয়াভেদে
প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ করিয়া পঞ্চদশ প্রকার, এই দোষের যে সময়ে
সঞ্চয় হইবে ঐ সময় এই পঞ্চদশ স্থানেই সঞ্চিত্ত হইবে অতএব
পাঠকগণের বোধের সাহায্য হেতু প্রত্যেকের স্বাভাবিক ক্রিয়া
এবং আশ্রয়স্থান এস্থলে বর্ণিত হইল । যথা—

মধুরোরসঃ সৌহস্য মাধুর্যাৎ মাধুর্য্যং বর্জয়তি স্নেহাৎ স্নেহং গৌরবাৎ গৌরবং
শৈত্যাৎ শৈত্যাৎ পৈচ্ছিল্যাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি ।

* তস্য পুণরস্ত যোনিঃ কটুকোরসঃ শ্লেষণ প্রত্যঙ্গীকত্বাৎ কটুকত্বাৎ
মাধুর্য্যমপিভবতি রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং লাঘবাৎ গৌরবং ঔষ্ণ্যাৎ শৈত্যাৎ বৈশদ্যাৎ
পৈচ্ছিল্যমিতি ॥ শ্লঃ । শ্লঃ । ২১ অঃ ।

বায়ুর পঞ্চস্থান, গণ্যকৃৎ কক্ষস্থান ; কৰ্ম,—যে	
প্রাণবায়ু	১। স্থান,—হৃদয় (যুক্ষুম)। কৰ্ম,—যাগে ক্রিয়া প্রাণাল। আহার প্রবেশন। নাতিস্থ
উদানবায়ু	২। স্থান,—কণ্ঠ (জক্রমূল)। কৰ্ম,—মস্তকাত্যস্তে যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ হয় তাহা এবং বর্ণোচ্চারণ, নামাবিধ শব্দ ও স্বরসাধন।
সমানবায়ু	৩। স্থান,—পাকায় এবং আগায় ; কৰ্ম,— জঠরানল সহ সঙ্গত হইয়া আহার পরিপাক করা এবং তজ্জাত রস এবং মূত্র মল প্রভৃতিকে পৃথক করা।
ব্যানবায়ু	৪। স্থান,—সর্বশরীর। কৰ্ম,—সকল শরীরগত রসধাতু বহন, ঘৰ্ম এবং রক্তপ্রাব জনন অপিচ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের ক্রিয়া নির্বাহ করা।
অপানবায়ু	৫। স্থান,—পাকায়, মূত্রায় ও হৃদে প্রভৃতি অধোভাগ। কৰ্ম,—মল, মূত্র, শুক্র, আর্তব, এবং অধোবায়ু নিঃসরণ করা এবং আকর্ষণ করা।

পঞ্চপ্রকার পিত্তের স্থান এবং ক্রিয়া।

পাচক পিত্ত	১। স্থান,—পাকায় এবং আগায়ের মধ্যস্থান। কৰ্ম,—চতুর্বিধ আহার (চব্য, চূষ্য, লেছ্য, পেয়,) পরিপাক করা। এবং রস, মূত্র, দোষ, প্রভৃতিকে পৃথক করা। এবং অপর পিত্তস্থানের অভাব পূরণ করা।
রঞ্জক পিত্ত	২। স্থান,—যকৃত গ্ৰীবা। কৰ্ম,—আহার পরি- পাকজরসধাতু রঞ্জিত (বক্তে পরিণত) করা।

সাধক পিত্ত ৩। জ্ঞান,—হৃদয় । কৰ্ম,—মানসিক ব্যাপার
সাধন অর্থাৎ মনের যোগ এবং বস্তুর বোধন
ক্রিয়া নিষ্পাদন করা ।

কালোচক পিত্ত ৪। জ্ঞান,—দৃষ্টি (যাঁহা দর্শনেচ্ছিতের আধার) ।
কৰ্ম,—বস্তুর রূপ এবং আকৃতি দর্শন করা
(প্রত্যক্ষ করা) ।

ভ্রাজ্জক পিত্ত ৫। জ্ঞান,—মস্তকশরীর । কৰ্ম,—অভ্যঙ্গ (তৈলাদি
মর্দন) মেক (জলমেক প্রভৃতি) স্নান,
লেপন (গন্ধচন্দনাди) স্বেদ (অগ্নিদ্বারা বা
জলদ্বারা) এই সকল ক্রিয়ার পরিপাক
জ্ঞান (গ্রহণ) এবং শরীরের ছায়া প্রকাশ
করা ।

পঞ্চপ্রকার কফের জ্ঞান এবং কৰ্ম ।

অবলম্বক ১। জ্ঞান,—হৃদয়, কৰ্ম,—ত্রিকস্থান (পৃষ্ঠবংশের
মক্ষিস্থান) অবলম্বন করিয়া সমস্ত শরীরে
রসক্রিয়া নিষ্পাদন । এবং অপর স্নেহস্থান
পূরণ করা ।

ক্লেশক ২। জ্ঞান,—আমাশয়, কৰ্ম,—যতপ্রকার আহার
উদরস্থ (আমাশয়স্থ) হইলে, তৎসমস্ত ভিন্ন-
সংঘাত (একীভাব) করতঃ পরিপাকের
সাহায্যার্থে ক্লেশযুক্ত (কষ্টমাক্রান্তি) করা ।

বোধক ৩। জ্ঞান,—রসনা, কৰ্ম,—সমস্ত রসের বোধ-
জ্ঞান ।

তর্পক ৪। জ্ঞান,—মস্তক, কৰ্ম,—মস্তকস্থ সমস্ত পদার্থের
তর্পণ, বিশেষ চক্ষুদ্বয়ের তর্পণ করা ।

শ্লোক ৫ । স্থান,—২১০ সংখ্যক সন্ধিস্থান ; কর্ম,—যে সকল চলসন্ধি তাহাদিগের অনায়াসে ক্রিয়া নিষ্পত্তির সাহায্য করা । অর্থাৎ চক্র নাভিস্থ স্নেহ পদার্থের ন্যায় ক্রিয়া করা ।

এই প্রকার শরীরস্থ মূল ধাতু বাত, পিত্ত, কফ, পঞ্চদশ প্রকার বিভক্ত হইয়া ১৫ পঞ্চদশ স্থানে অবস্থিতি করতঃ শরীর ধারণ করিতেছে । কিন্তু যখন বাহ্য কারণকলাপের সাহায্যে রূপান্তর কি প্রকৃত্যন্তর প্রাপ্ত হইবে তখন ইহারা শরীর নাশের কারণ হইবে ।

এই ত্রিদোষের “সঞ্চয়” স্থানান্তরে না হইয়া যে সকল স্থান উক্ত হইল, ঐ সকল স্থানে হইবে, এই সঞ্চয়ের কারণ ঋতুবিভাগ অর্থাৎ ঋতুর অনুযায়ী চন্দ্র, সূর্য, এবং বায়ুর প্রাকৃতিক গতির ফল । যথা ঐশ্বর্যশত্রে বাত সঞ্চয় (*) কালকৃত । সুতরাং ইহা নিবারণের উপায় নাই । চিকিৎসক এই প্রকার ভাবিরোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া যথারিহিত বিধান করিতে পারিলে আর কোন প্রকারে সঞ্চিত দোষকৃত রোগের উপদ্রব ভোগ করিতে হয় না । এই অবস্থায় চিকিৎসা করাকে আচার্য্যগণ চিকিৎসার “প্রথমকাল” বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ।

এই প্রাথমিক চিকিৎসা প্রণয়ন দৃষ্টি করিলে পাঠক মনে করিতে পারেন যে রোগের অনুপস্থিতি অবস্থায় কিরূপে চিকিৎসা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আচার্য্যগণ “ঔষধ সূত্র” বলিয়া যে সকল নিয়ম নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঔষধসূত্র প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত প্রকাশ করা হইয়াছে ঐ প্রবন্ধ দৃষ্টি করিলে আর সন্দেহ

* ঋতুর বিভাগ, ঋতুজনাফল এবং ঋতু অনুযায়ী ক্রিয়া “কালতত্ত্বে” বিস্তারিত লিখিত আছে অতএব পাঠক ঐ প্রবন্ধে দেখিবেন ।

থাকিবে না । কেমনা ঐ প্রবন্ধে ভাবিরোগের নিষ্কৃতি লাভের সূত্র এবং তদনুযায়ী যুক্তি সকল বিশদরূপে বর্ণিত আছে । অতএব পুনরুক্তি বিবেচনায় এখানে বিরত হওয়া গেল ।

দোষের প্রকোপাবস্থা ।

প্রকোপ কি ? প্রকোপশব্দে সাধারণত ক্রোধকে বুঝাইবে । পাঠক বলিতে পারেন, বায়ু, পিত্ত, কফ, জড়পদার্থ নির্জীব, তাহার আবার প্রকোপ কি ? উহার উত্তর এই, যে হেতু আচার্য্যগণ শ্রীমদ্ শ্রীমত গ্রন্থে “কুপিত” “ক্রুদ্ধ”, ইত্যাদি বহুবিধ ক্রোধ জ্ঞাপক শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, অতএব ক্রোধ শব্দের অর্থান্তর স্বীকার করিতে হইবে । টীকাকার এই প্রকোপশব্দ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন । “ক্কাথ্যমানস্য সর্পিষোহগ্নিসংযোগেন সঞ্চলন মেব প্রকোপঃ” । যেমন কোন স্নেহ পদার্থ কঙ্ক সংযোগে অগ্নিহারা উত্তপ্ত করিলে ফুটিয়া ফুটিয়া উথলিয়া উথলিয়া চালিত হয় তদ্রূপ বাহ্যহেতুর প্রবল আকর্ষণ বা বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ঐ রূপ ফুটিয়া ফুটিয়া উথলিয়া উঠার নাম “প্রকোপ” । মনুষ্য কিম্বা পশুসমাজে যদি কেহ কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ক্রোধের বশীভূত হয়, তবে ভদ্রারা যেমন না ঘটিতে পারে এমনত অসৎকার্য্য অতি বিরল, তদ্রূপ শরীররক্ষক ত্রিদোষ ক্রুদ্ধ হইলেও সংঘটন না হইতে পারে এরূপ শারীরিক মানসিক দুঃখ নাই । এই প্রকার তুল্য কার্য্য-কারিতা দর্শন করিয়া মহর্ষিগণ ঐ প্রকার ক্রোধসূচক শব্দ সকল ব্যবহার করিয়াছেন ।

এই প্রকোপ দুই প্রকার ১ম, কালকৃত ২য়, সন্ধিকৃষ্ট নিদানকৃত (প্রবল বাহ্য হেতুকৃত) ।

কালকৃত প্রকোপ যথা—বর্ষাঋতুতে বায়ু প্রকোপ, শরৎ ঋতুতে পিত্ত প্রকোপ, বসন্ত ঋতুতে কফ প্রকোপ ।

পূর্বে যে সঞ্চয় বলা হইয়াছে ঐ সময় উপেক্ষা করিলে এই প্রকোপ অনিবার্য্য ।

বাহ্য হেতুকৃত প্রকোপের বিষয় পূর্বে কথিত হইয়াছে এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি ।

যথা—অত্যন্ত বলবদ্বিগ্রহাদি বায়ু প্রকোপক । অত্যন্ত অগ্নি-
সেবা পিত্তপ্রকোপক এবং অত্যন্ত অভিষ্যান্দি (দধি কদলী প্রভৃতি)
কফ প্রকোপক ।

এই প্রকার কুপিত দোষের ক্রিয়া প্রকাশক কোষ্ঠে (আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পাকশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উত্তুক, ফুস্পুয,) এবং শাখা (রসাদি ধাতু) অতএব দোষ কুপিত হইলে উক্ত কোষ্ঠে স্থানে বেদনা এবং শাখা সঞ্চরণ ও অল্লোকার, দাহ, আহারে বিদ্বেষ, হৃদয়স্থান অত্যন্ত অশুদ্ধ বোধ হয় ।

এই অবস্থাকে রোগ প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পূর্বকাল বলিয়া জানিবে এই কাল দ্বিতীয় ক্রিয়াকাল, এই সময় উপেক্ষিত হইলে ব্যাধি অতি অল্প সময়ে ভয়ানক মূর্তি ধারণ এবং তজ্জন্য প্রাণনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ।

ক্রমশঃ

আয়ুর্বেদে শাস্ত্রবিদ্যা ।

অকপ্যাস্তস্য দেহস্য যোহয়মঙ্গলিনিশ্চয়ঃ ।

শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতেহঙ্গেষু কেবুচিৎ ।

তস্মিন্নিঃশংসয়ং জ্ঞানং হর্জ্য শল্যস্য বাহুতা ।

শেধায়িত্বা মৃতং সমাক্ষুর্জষ্টবোহঙ্গলিনিশ্চয়ঃ । শৃঙ্গত

অধুনা যেরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শারীরবিজ্ঞান (Anatomy) শাস্ত্রবিজ্ঞা (Surgery), ভৈষজ্যতত্ত্ব (Materia medica), চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of medicine), রোগতত্ত্ব (Pathology), ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery), এবং জীবিতের দেহতত্ত্ব (Physiology), ইত্যাদিরূপে আয়ুর্বিজ্ঞানের বিভাগ করিয়াছেন, অতি পুরাকালে হিন্দু চিকিৎসকগণের বিভাগ ঠিক এইরূপ ছিল না । তাঁহারা শল্য, শালাক্য ; কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা কৌমারভূত্যা, অগদতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র এই আটভাগে আয়ুর্বেদকে বিভক্ত করেন । তন্মধ্যে শাস্ত্রবিদ্যা এবং শারীরবিজ্ঞান শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল শল্যতন্ত্রের শাস্ত্রবিজ্ঞান অংশ, আলোচনা করিব । প্রবন্ধান্তরে শারীরবিজ্ঞানের চর্চা করা যাইবে ।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এইটী অবধারিত হয় যে, আয়ুর্বিজ্ঞানের শাস্ত্রবিজ্ঞাই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল । মানবপ্রকৃতিতে এমনই একটি মহীয়সী শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, কোন বিষয়ের অভাব ঘটিলে, তাহা বিদূরিত করিবার বাসনাও সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দীপিত হইয়া উঠে । আয়ুর্বেদের নিত্যজ্ঞবাদীরা যাহাই বলুন, রোগপ্রতীকারের প্রয়োজন ঘটিলেই ঋষিরা ধ্যান-স্তিমিতলোচনে “কঃ স্থাৎ তেষাং শমোপায়ঃ ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ” রোগপ্রতীকারের উপায় কি, এই ভাবিয়া আকুলিত হইয়া-

ছিলেন । এবং এই চিন্তাই কায়চিকিৎসা বা ধাতুভৈষম্য-জনিত রোগের সৌত্রিক জীবনের নিদান । কিন্তু যে অমৃতময় যুগে ভারত-বাসী তপোযোগপ্রভাবে ধাতুভৈষম্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, শাস্ত্রাদির ভীষণ অভিস্রোতে সেই সময়ও তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়াছিল । কারণ হিতাহারী এবং মিতাচারী হইয়া ধাতুভৈষম্যজ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু তদ্বারা শক্রব শত্রুলোষ্ট্র লণ্ডাদিব অভিস্রোত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে ? সুতরাং শারীরিক রোগের প্রাদুর্ভাবের বহুপূর্বেও যে শাস্ত্রবিজ্ঞান প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য এবং সুসঙ্গত । কিন্তু কোন্ কালে ভারত-বর্ষে আয়ুর্বেদেব এই উৎকৃষ্টতম অঙ্গ সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, হিন্দুদের অন্যান্য শাস্ত্রের স্থায় তাহারও কালবিনির্ণয়ের পথ ঘোর তমসাম্ভ্রম । তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে, হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীর বয়োনিরূপণের যেরূপ প্রণালী বিদ্যমান আছে, তদনুসারে গণনা করিতে গেলে সত্যযুগেও শাস্ত্রবিজ্ঞান সমধিক চর্চা হইয়াছিল, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । সত্যযুগে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীযুদ্ধে হতাহত সেনানীগণের শল্যোদ্ধারের জন্য শাস্ত্র-বিজ্ঞান প্রয়োজন হইয়াছিল, সুপ্রাচীন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন । যুগক্রম অনুসারে সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর অতীত হইয়া কলিযুগেরও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক চাবিসহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে । সুতরাং পাঠক এক্ষণে অনায়াসেই গণনা করিতে পারিবেন যে, হিন্দুগণে শাস্ত্রবিজ্ঞান কত প্রাচীন । কিন্তু কালের এগমই যৌরতর পরিবর্তন যে, সেই সুপ্রাচীন শাস্ত্রবিজ্ঞান নাগও আজি ভারতবাসীর অনেকেই অবগত নহেন ।

অধুনা অজ্ঞবিজ্ঞার নাম স্মরণ হইলেই যেন ছাটকোট পেণ্টুলনের এক বিজ্ঞাতীয় মূর্তি আসিয়া স্বতঃই মানসপটে অঙ্কিত হয়। এই বিজ্ঞা পূর্বে কখন আখ্যভূমি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। ইঙ্গুদী তৈলের ক্ষীণালোকে রক্ষমূলে উপবিষ্ট জটাবক্ষলপরিহিত সেকালের অমভ্য ঋষির অনুদার অন্তরে, এই সকল স্তম্ভস্ত ভাব, —জটিল শাস্ত্রীয়তত্ত্ব প্রতিভাসিত হইয়াছিল বলিলেও আজি ইংরেজী-শিক্ষাভিমাত্রী যুবকগণের নিকটে হান্স্যাস্পদ হইতে হয়। ইহাদের অনেকেরই বিশ্বাস, প্রাচীন ঋষিরা চামরীধেনুর পুচ্ছগুচ্ছের ন্যায় শীর্ষদেশীয় শিখাগুচ্ছই কথায় কথায় বিকম্পন করিতে জানিতেন; আধুনিক প্রাচীন পণ্ডিতগণের ন্যায় এই সকল বিজ্ঞায় ঋষিদিগের বুদ্ধি কখন প্রসৃত হইয়াছিল বলিয়াও তাহারা কদাপি বিশ্বাস করেন না, সত্য বটে ইংরেজি শিক্ষিত গর্বিত যুবক বা অসাম্যের মন্তশিষ্য অনুদারমতির মুখে একথা শোভা পায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী স্বপণ্ডিত এই সকল কথায় আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। তাহারা বলিবেন ছাট পেণ্টুলনের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই।

বড় অধিকদূর গমন করিতে হইবে না,—কিছুদিন হইল ভারত ভৈষজ্য, ভারতীয় শাস্ত্র, ভারতীয় যন্ত্র এবং ভারতীয় বিজ্ঞানাদি বিষয়ে উদারগতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

*সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জীমান্ উইলসন বলেন যে, হিন্দুগণ যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞা ও মনোবিজ্ঞানে, তেমন ভৈষজ্যবিজ্ঞায়ও এককালীন পৃথিবীর সমগ্র উচ্চতম সভ্যজাতির সমকক্ষ ছিলেন। বহু অনুসন্ধান এবং গবেষণা বলে অধুনা আমাদের (ইংরেজদের) জ্ঞান-

পঞ্চবর্তী হইবার বহুপূর্বে, হিন্দুগণ ভৈষজ্য—বিদ্যা এবং শাস্ত্রবিজ্ঞানও ঈদৃশ সুনিপুণ হইয়াছিলেন যে, ইতিহাস অত্যাগি তাহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে । *

* কেবল আরবে নয়, বহুপূর্বে গ্রীশদেশেও ভারতবর্ষীয় ঔষধাদি প্রচলিত হয় । হিপক্রেটিজ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক খৃ. পূ. পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন । তিনি খৃ. পূ. ৩৬১ অব্দে ৯৯ ব্রহ্মবর্ষে বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন । তাহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাজন (অর্থাৎ সজ্জিনা), এলাচী, দারচিনি, জটাঙ্গাঙ্গী, লোবান, বিবেঙ্গা, হিঙ্গু, চিরতা, এই সমস্ত দ্রব্য রোগ বিশেষে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে । এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় ঔষধ দ্রব্য । এ সমস্ত বস্তু ভারতবর্ষ হইতে গ্রীশদেশে নীত ও বিক্রীত হইত । ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদৃশ পূর্বকালেও ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা ইউরোপ খণ্ডের উল্লিখিত অংশে প্রচলিত হইয়াছিল । উক্ত গ্রীক চিকিৎসকের নাম্প্রদায়িক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমুদায় পর্যালোচনা দ্বারা এইটি অবধারণিত হইয়াছে যে, অল্প চিকিৎসা বিষয়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা নিপুণতর চিকিৎসকদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে সে সমুদায়ের কিয়দংশ সঞ্চিত হয় । ভারতবর্ষীয় সুপ্রাচীন চিকিৎসকেরা মৃতদেহ ছেদন করিয়া তাহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শিরাদি ব গঠন ও স্বরূপ প্রভৃতি

* "The distinguished professor Wilson stated that—"in medicine as in astronomy and metaphysics, the Hindus once kept pace with the most enlightened nations of the World : and that they attained as thorough proficiency in medicine and surgery as any people whose requirements are recorded, and as indeed, was practicable, before anatomy was made known to us by the discoveries of modern enquirers " (H. M. page 18.)

নির্দারণ করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সুশ্রুতাঙ্গী সুশ্রুতান বৈদ্যক
গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বকালে হিন্দু-
চিকিৎসকেরা অশ্বরী রোগ, প্রসব-বাধা, মৃতগর্ভ-নিঃসারণ ইত্যাদি
অনেক স্থলে কঠিন কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেন। সুশ্রুত ঐ
প্রথমোক্ত ক্রিয়াটির বিবরণ করেন; পশ্চাৎ মেলসন নামক লাতিন
পণ্ডিত তাহা ইউরোপে খণ্ডে প্রচার করিয়া দেন। ত্রিমি মিশর
দেশীয়দিগের নিকট তাহা অবগত হন এবং মিশর দেশীয়েরা পূর্ব-
দেশীয় অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের সমীপে শিক্ষা
করেন। অতএব গ্রীক হিপক্রেটিজ অস্ত্র চিকিৎসা-বিষয়ে ও ভারত-
বর্ষীয়দের নিকট প্রবন্ধ ছিলেন, ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব ও সম্ভব।*

পুনাকালে গ্রীকদেশীয়দিগের দ্বারা ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশ-
জাত এমনতর কতকগুলি ঔষধ ব্যবহৃত হইত যে, তাহা কেবল পূর্ব-
দেশেই পাওয়া যাইত।†

ইজিপ্টদিগের কোন কোন মতভঙ্গি দেখিয়া এইরূপ বুঝা
যায় যে, গ্রীকগণই ইউরোপীয় ভৈষজ্যবিজ্ঞান এবং অন্যান্য
শিল্পবিদ্যার আদিম শিক্ষাগুরু। কিন্তু প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের
মতে ইহা অসম্ভব সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ
ইজিপ্টদিগেরই সুশ্রুতান ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে,
তাহাদের অধিকাংশ জ্ঞানরাশিই পূর্বদেশীয় কোন অনির্গত-
জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দুগণই যে
সেই পূর্বদেশীয় জাতি তাহা আমরা বিশেষরূপেই সম্ভাষণ

* "Transactions of the second session of the international
congress of the orientlists for 1874, PP. 255—259."

† "Many medicines produced in Persia, and India were employ-
ed by the early Greeks and could only have been procured
from the east." (H. M. page 47.)

কল্পিয়াছি । এই হিন্দুগণের মধ্যেই সর্বপ্রথমে বিজ্ঞান এবং শিল্পের সমধিক চর্চা হইয়াছিল । এবং তাঁহারাষ্ট ভৈষজ্য বিজ্ঞানে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া ধর্মোপদেশক পরম্পরায় ঐক্যগণকে তদ্বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন * ।

“হিন্দুদিগের নিকট হইতেই আমবা ভৈষজ্য বিজ্ঞানের প্রথমমূল্য অবগত হইয়াছি ।” †

উইলসন এবং ওয়াইজ প্রভৃতি সুপণ্ডিত ইউরোপীয়গণের উল্লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে বোধহয় আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না যে হিন্দুগণ সভ্যজগতের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় শাস্ত্রবিদ্যারও শিক্ষাগুরু । অপিচ তাঁহাদের এই জ্ঞানোন্মেষ যে অসভ্য বা অর্ধশিক্ষিত জাতির ন্যায় চিরকালই মুখপরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাও নহে । বহুগহ্বর বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ষে এই সকল বিদ্যা পুস্তকাকারে রচিত হইয়া বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্যপ্রদান

* “With some hints from the Egyptians, the Grecians were the originators of both the medical science and art of Europe. A more extended knowledge of history proves that this is not correct, their own most ancient records proving that they obtained much of their knowledge from a mysterious nation of the east, which we have proved was Hindu, among whom the arts and sciences were successfully cultivated, and whose great progress in medicine attracted attention, and was communicated through the priesthood, to the philosophers of Greece.” (H. M. page 49:)

† “It is to the Hindus we owe the first system of medicine.” (H. M. page 58.)

করে । স্মৃতরাং অনায়াসে বলা যাইতে পারে, শাস্ত্রবিদ্যার আলোচনা করা দূরে থাকুক, ইংলণ্ড যখন তার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই, হিন্দুগণ তাহার বহুপুর্বে এই সকল তত্ত্বের আলোচনায় আদর্শ স্থানীয় হইয়া গিয়াছেন । প্রমাণস্বরূপ আমরা এখানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।

ভৈষজ্য বিষয়ক ঐ সকল প্রাণালীবদ্ধ গ্রন্থাবলী অতি পুরাকালেও যে বর্তমান ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । *

“ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক আরব ও পারস্য দেশের ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই সেই দেশে প্রচারিত হয় । উযূন্ অল্ অশ্বা ফিতল্ কাতুল্ অত্বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোম্বাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন । ইহার মধ্যে কাহারও নাম মল্লঃ, কাহারও বা কল্লঃ, কাহারও নাম বা বাখর বলিয়া লিখিত আছে । মল্লঃ মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন । আরব রাজ্যেশ্বর হরুন্ অল্ রমীদেব উৎকট পীড়া হয় । কোন রূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মল্লঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন । তদ্বিধ ঐ আরবী পুস্তকে দাহর, জব্বর, রাহঃ, অক্লর, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল্, জারি, জওদর, যানাক, মনজহল্ এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ইহাদেব প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও

* “ That systematic works on medicine existed at a very early period, must be allowed.” (H. M. Page. 56) *

পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয় । পুরোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই । উহাতে আরব-দেশে নীত গিরক্, মর্মদ ও যেদান্ নামে তিনখানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক-গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে ; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নয় । ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে অলুম্নসুর নামক আরবীয় নরপতির অনুমতিক্রমে আরবী ভাষায় একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুবাদিত হয় ; উহার আরবী নাম সিন্দ্ হিন্দ্ । কোলুক্ক উহাকে সংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন । যাকুব নামে একজন গ্রন্থকার ঐ সিন্দ্ হিন্দ্ পুস্তক অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রস্তুত করেন । বীজগণিত বিদ্যা প্রথমে ভারত-বর্ষেই প্রবর্তিত হয় । ডায়োফেণ্টিস্ নামে একটি গ্রীক গণিতবেত্তা গ্রীশ্দেশে ঐ বিদ্যা প্রথম প্রচার করেন ; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারবার উদ্ধৃত করিয়া-ছেন * । অতএব গ্রীকেরা এবিষয়েও হিন্দুদের নিকট ঋণী আছেন । অলুম্নামুন্ নামক বাদশাহের সময়ে একখানি সংস্কৃত বীজ-গণিত আরবীতে অনুবাদিত হয় । ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯; এই নয় অঙ্ক মূর্ত্তি এবং একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনার যেরূপ প্রণালী সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আখ্যেয়রাই তাহা উদ্ভাবন করেন । 'আরবী ও পারসী পাণীগণিত-প্রণেতারা সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । (A. R. VOL. XII, PP. 183 and 184.) আরবীয়েরা হিন্দু-দিগের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশকরিয়া দেন ও তদ্বিময়ক গ্রন্থরচনা ও বাণিজ্যবিস্তার দ্বারা বোম্বাইনগর হইতে ম্যেঙ্গোর অন্তর্গত কার্ভোরানগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান ।

* Asiatic Researches, VOL. XII, PP. ১৫১—১৬১

খুলাস-উল-হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাহাদের এই অঙ্ক-প্রণালী-শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্টে লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস একখানি গ্রন্থে অঙ্ক-গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন, এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এই ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একটি ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত (Charles) বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খৃষ্টানেরা আরবীয়দের পূর্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালী অবগত হইয়াছিল। ৭৮৬-৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরবীয় নরপতি হরুন অলুরবীদের আদেশানুসারে পূর্বেকৃত সূক্ষ্মত ও চাণক্য-কৃত বিষ-চিকিৎসা-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মন্তঃ কর্তৃক পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। চাণক্য-কৃত বলিয়া লিখিত পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-শাস্ত্রও আরবীও পারসী উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে সূক্ষ্মত-গুরু কর্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশুচিকিৎসা-বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। অলুবীরুণী নামক আরবীয় পণ্ডিত ১৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক এক এক খানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিবরণাক্রমে অন্য একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যান। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে আবুসালেহ রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিশর দেশীয় এলেগজেড্রিয়া-নগরের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হয়, এবং মোসলমানেরা স্পেনদেশে অধিকার করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে, তাহাতে

আরবীভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সমস্ত জ্যোতিষাদি খাজেন
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্তিত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হইয়া যায়।
পীজানগরবাসী লিয়োনার্ড নামে একটি পণ্ডিত বার্বারিদেশে
গিয়া আরবীভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২
খৃষ্টাব্দে তাহার লাতিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া
ফান। জগদ্বিখ্যাত জর্মেণপণ্ডিত হম্বোল্ট বলিয়া গিয়াছেন,
আরবীয়দের কর্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্কপ্রণালী এবং গ্রীষ্ম ও ভারতবর্ষ
উভয়দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণি-
তাংশের বিশেষরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টি
বিজ্ঞান, প্রাকৃতিকভূগোল, তেজোবিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞানের
দুর্লভতর ভাগ সমুদায় মানুষের বুদ্ধি-গম্য করিয়া দিয়াছে। নচেৎ, ঐ
সকল বিজ্ঞান ঐ সমস্ত অংশের, হয়ত, দ্বারোদঘাটনই হইতনা *। না
হইলে দুর্বোহ বিজ্ঞানবেদীর ঐ দুইটি ভারতবর্ষীয় অনশ্বর গোপা-
নের অসম্ভাব্য আনেকানেক অতীত গুরুতর অংশে মানবীয় বুদ্ধির
অসামান্য মহিমা প্রকাশই পাইত না। পশ্চিমের ন্যায় পূর্বাধিকে ও

* Both these effects—the simultaneous diffusion of the know-
ledge of the science of numbers and of numerical symbols with value
by position—have variously, but powerfully favoured the advance
of the mathematical portion of natural science, and facilitated
access to the more abstruse departments of astronomy, optics,
physical geography, and the theories of heat and magnetism,
which, without such aids, would have remained unopened.—
Cosmos translated by E. C. Otto. VOL. II. 1849, PP. 599
and 600.

† Relation des voyages faits par les Arabes dans l'Inde et a
la Chine, par Reinaud, tome I., six; tome II. PP. 36.

ভারতবর্ষীয় গণিতবিদ্যা প্রচলিত হয় । শ্রীমান্ রেনো নামে একটি ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় ।। মোগলসম্রাট আকবর রাগায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্কবেদ (বা কতকগুলি উপনিষদ) পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন । তাঁহার প্রপৌত্র দ্বারা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ সকল অনুবাদ করেন; এবং পশ্চাৎ আঁকেতীই দুপেরঁকর্তৃক ঐ পারসীক অনুবাদের লাতিন ও ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন হয় ।—Revd. W. Cureton's Extract from the Arabic work entitled Ayan ul Amba &c with H. H. Wilson's remarks in the journal of the Royal Asiatic Society. VOL. 6, PP. 105—119, Max Muller's lectures on the science of language, first series, 1862, PP. 145—153, Colebrooke's dissertation on the Arithmetic and Algebra of the Hindus, Strachey's early History of Algebra in the Asiatic Researches, VOL. XII, PP. 159—185, Alexeander Von Humboldt's Cosmos translated by E. C. Otto, VOL. 11, 1849, PP. 535 and 593—600, Memoire sur l' Inde, par Reinand, PP. 312—322 and Elliot's Historians of India, PP. 259 and 260." ভা: উ:

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদে শরীরতত্ত্ব ।

শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ।

ভিষগ্বিদ্যেয়ম্ । জ্ঞাত্বা হি শরীরতত্ত্বং

শরীরোপকারকেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে ।

তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রাশংসন্তি কুশলাঃ”

[চরক, শারীরস্থান, ষষ্ঠ অধ্যায় ।]

কিসে শরীর ভাল থাকে, কি করিলে শরীরের উপকার হয়, রোগাদি হইলে কি উপায়ে তাহার নিবারণ করা যায়, এ সকল তথ্য জানিতে হইলে প্রথমতঃ শরীর কি, কি কি উপাদানে শরীর নির্মিত হইয়াছে, কিরূপ সংস্থানে এবং কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়ায় ইহা বিধ্বত বা অবস্থিত আছে, এ সকল তথ্য জানিতে হয় । না জানিলে কোন ক্রমেই শরীরের হিত করা যায় না । অহিত হইলে তাহা নিবারণ করাও যায় না । স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলুন, চিকিৎসাবিজ্ঞান বলুন, সকলই শরীরতত্ত্বমূলক । শারীর-বিজ্ঞান হইতেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান জন্ম লাভ করিয়াছে, ইহা অত্যন্ত মনোনিবেশ করিলেই বুঝা যায় ।

মুনিপ্রবর চরক স্মৃতিগ্রন্থের শারীরস্থানের প্রারম্ভ পঙক্তিতেই বলিয়াছেন যে, শরীরের উপকারার্থ শারীরতত্ত্বের অন্বেষণ অথবা শারীরতত্ত্বের বিজ্ঞান ইচ্ছা করিবেক । শারীরতত্ত্বের জ্ঞান বা অনুসন্ধান ভিষকগণের বা চিকিৎসকগণের প্রধান বিজ্ঞা । এই বিজ্ঞা জানিলে, এই বিজ্ঞায় পারদর্শী হইলে, যাহা এই পুদ্গল দেহের বা ক্ষয়োদয়যুক্ত শরীরের হিত বা উপকারক, তাহা বিনা ক্লেশে

* বিচয়ঃ বিশ্লেষণ অন্বেষণং বিজ্ঞানং বা ।

ও অব্যভিচারিতরূপে জানা যাউতে পারে। সেই জন্যই পূর্ন পূর্ন আচার্যাগণ ও উপদেষ্টীগণ শরীরসম্বন্ধীয় অনুসন্ধানকে বা জ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

শরীরতত্ত্ব বা শারীরবিজ্ঞা নিষ্ঠাস্ত্র দুজোড়। তাহার স্কলভর অংশটি চিকিৎসকগণ বিদিত হইতে পারেন; সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ সকল অযোগী পুরুষের অজীব দুর্লভ। নিজ্জীব শরীর কর্তন করিলে যাহা চর্মচক্ষুর গোচর হয়, চিকিৎসকগণ তাহারই বিজ্ঞ-মানতা ও সংস্থান অসম্ভব করিতে সমর্থ; সজীব দেহের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব তাঁহাদের জ্ঞানাতীত। স্বতরাং সে সম্বন্ধে তাঁহারা অনভিজ্ঞ। চিকিৎসক যে দিন যোগী হইবেন, যোগগম্যতত্ত্ব অধিকার করিতে পারিবেন, সেই দিন তাঁহার বিজ্ঞা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, অন্যথা চিরকালই অসংপূর্ণ থাকিবে।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পূর্বে শারীর বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বহিঃপদার্থের সহিত শরীরের সম্বন্ধ নির্ণয়,—এ সকল দ্বিবিধ পথে পরিচালিত বা প্রসারিত হইত। যোগীদিগের পথ এক প্রকার এবং বৈজ্ঞানিকদিগের পথ অন্য প্রকার। এই দুই পথ আজ কাল পৃথক না থাকায় অর্থাৎ এক বা সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আগরা অনেক সময়ে সংশয়িত হই, বিসম্বাদিতা আছে ভাবিয়া পুরাতন মতকে ভ্রমসংকুল জ্ঞান করি ও সেই সেই মতে দোষারোপ করি। যদিও আয়ুর্বেদসঙ্গীখনী আয়ুর্বেদোক্ত বৈদ্যবিজ্ঞাই বলিবেন সত্য, বৈজ্ঞানিক শরীরতত্ত্বই বলিবেন সত্য, তথাপি সঙ্গীখন ক্রিয়ার সাহায্য প্রত্যাশায় ইনি মতান্তরকে উপেক্ষা করিবেন না।

• মতান্তর গুলি ইহার নিকট দীক্ষাস্থানীয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। বৈজ্ঞানিকের অন্তর্গত শরীরতত্ত্ব প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই অবশ্য জ্ঞাতব্য; ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তন্মধ্যে প্রথম দ্বিজ্ঞা-ধর উচিত যে তাঁহারা এই বিদ্যার সূক্ষ্ম অংশ পরিত্যাগ করিয়া

প্রথমে স্থূল স্থূল বিষয়গুলি অধিকার বা জ্ঞানগোচর করিবেন । এই জীবাবাস দেহে ও এই ব্যাধি মন্দিরে অনেক জ্ঞাতব্য আছে । পরন্তু সে সকলের মধ্যে অস্থি পদার্থটি সর্বাঙ্গপেক্ষা স্থূল, সুতরাং প্রাথমিক এই প্রথম জ্ঞাতব্য । সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি বৈদ্য মুনিগণ অস্থিতত্ত্বকে মধ্যস্থানে উপদেশ করিলেও বোধনৌক্যার্থে আমরা উহাকে প্রথমেই গ্রহণ করিলাম ।

অস্থি কি ? এবং তাহা কি প্রকারে জন্মে ? এসকল তথ্য পশ্চাৎ বিবেচ্য । প্রথমে দেখিতে হইবে যে শরীরে সর্কসমেত কতগুলি অস্থি আছে এবং কোন স্থানে কিরূপ অস্থি বিদ্যমান আছে । এই দুই তত্ত্ব জানা হইলে, পরে জানিতে হইবে যে, সেই সেই অস্থির সেই সেই আকারের দ্বারা শরীরের কি কি ক্রিয়া সাধিত হয় ও কি কি উপকার দর্শে । তাহার পরে ভাগস্বান জ্ঞানার্থ তত্ত্বাবত্তের উপাদান প্রভৃতি অনেকগুলি অস্থিতত্ত্ব জানিবার আবশ্যক আছে ।

অস্থির সংখ্যা ।

শরীরে কতগুলি অস্থি আছে ? আমরা সহসা এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব না । কেন না প্রাচীন বৈদ্যবিদ্যার অন্তর্গত শারীর বিদ্যার লিখিত অস্থিসংখ্যা আধুনিক ইংরাজ চিকিৎসক গণের লিখিত সংখ্যার সহিত ঐক্য বা সমানতা না থাকায় আপাতদর্শী অনভিজ্ঞ লোক হয় ত বৈদ্যগণে অবিশ্বাস করিবেন অথবা বুদ্ধি মোহ বশতঃ না বুঝিয়াই “বৈদ্যেরা মূর্থ ছিল” বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন । সুতরাং আমরা অগ্রে স্মৃতির বিস্মাদি-মতগুলি উল্লেখ পূর্বক তাহার সামঞ্জস্য দেখাইব, পশ্চাৎ পর-মতের সহিত ত্রৈনিকোর কারণ দেখাইয়া সিদ্ধান্তিত সংখ্যার উল্লেখ করিব ।

পুরাতন পণ্ডিতেরা কেহ ৩৬০ কেহ বা ৩০০ এই দুই প্রকারে

অস্থিসংখ্যা গণনা করিতেন। সুশ্রুত ভিন্ন সমস্ত আচার্য্য নরদেহে ৩৬০ খানি অস্থি থাকার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সুশ্রুতাচার্য্য বলিয়াছেন, তিন শত মাত্র অস্থি আছে, অধিক নাই। তিনি বলেন যে, বেদবাদীরাই তিন শত বাইট খানা অস্থি থাকার কথা বলেন, কিন্তু শল্যশাস্ত্রে তিন শত অস্থি থাকাই নির্ণীত হয়। *

এসম্বন্ধে বেদের ও বেদবাদী ঋষিদিগের মত, যাহা আমরা এখনও দেখিতে পাইতেছি, তাহা এই স্থানেই প্রদর্শন করিলাম। যথা,—

“অস্থীনি চ হ বৈ ত্রীণি শতানি ষষ্টিশ্চ।”

[অথর্ববেদীয় গর্ভোপনিষদ]

“অথাস্মিন্ কায়ে ষষ্ঠ্যধিকানি শতানি ত্রীণ্যস্থীনি বিদ্যাৎ।”

[আথর্বণ শারীরোপনিষৎ]

“অস্থীঃ ত্রিভিঃ শতৈঃ ষষ্ঠ্যধিকৈঃ ধার্য্যমানঃ।”

[বিষ্ণুস্মৃতি ৯৬]

“তথাস্থীঞ্চ সহ ষষ্ঠ্যা শতরয়ং।” [যাজ্ঞবল্ক্য]

“ত্রিণি ষষ্ঠ্যধিকানি শতান্যস্থীঃ সহ দন্তোল্লুখলনথৈঃ।”

[চরক, শারীরস্থান]

* “ত্রীণি সমষ্টানি অস্থিশতানি বেদবাদিনোভাষন্তে। শল্য তন্মৈ তু ত্রীণ্যেব শতানি।” সুশ্রুতের শারীরস্থান দেখুন। এখনকার প্রায় সকল স্কুলেই “সমষ্টানি” এইরূপ পাঠ দেখা যায়, সুতরাং সকলেই তদনুসারে বেদবাদীর মতে ৩৬০ খানা অস্থি এইরূপ বাখ্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু বেদবাদীর মধ্যে ৩৬০ ভিন্ন ৩০৬ অস্থি গণিত হয় নাই; এজন্য এখনকার প্রসিদ্ধ পুস্তকের “সমষ্টানি” পাঠ ভুল।

এইরূপে সকল বেদবাদীই তিন শত যাট সংখ্যক অস্থি থাকা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । কেবল সুশ্রুতাচার্য্য “ত্ৰীণ্যেব শতানি” এই উক্তির দ্বারা তিন শত অস্থির উপদেশ করিয়াছেন । *

পাঠক বলিতে পারেন, এ কি অদ্ভুত কথা ! অস্থির সংখ্যা গণনাতেও মতভেদ ? তাহাই বা কেমন করিয়া হয় ? বুঝিতে পারিলাম না । অস্থি কাল্পনিক পদার্থ নহে, অস্থি অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ নহে, উহা অতি সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট দৃশ্য, উহা সকল লোকেই দেখিতে পায়, এমন বস্তু গণিতে মত ভেদ হয় কেন ? বুঝিতে পারিলাম না । বিশেষতঃ অল্প প্রভেদ নহে, কোথায় তিন শত, কোথায় তিন শত যাট । এরূপ মত ভেদ দেখিলে কে না মনে করিবে যে পূর্বের বৈদ্যেরা ও পূর্বের ঋষিরা শবচ্ছেদ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন ? অথবা প্রত্যক্ষ দর্শনে বিমুখ থাকিতেন ? অনুমান হয়, আন্দাজী কল্পনার আশ্রয় লইয়া যিনি যাহা বুঝিতেন, তিনি তাহাই বলিতেন ; খাটুক বা না খাটুক, তাহা ফিরিয়া দেখিতেন না, বা পরীক্ষা করিতেন না ।

এ আপত্তির প্রত্যুত্তর বা সংক্ষেপ গৌমাংসা এই যে, ঋষিরা শবচ্ছেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকুন বা না থাকুন, তাহার ফল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না । কেহ বা অস্থির অংশ বিশেষকে অথবা উপাস্থি গুলিকে পৃথকরূপে গণনা করা বিধেয় বিবেচনা করিতেন ; কেহ বা তাহা করিতেন না । এইরূপেই তাঁহাদের কেবল মাত্র সংখ্যা গণনা বিষয়ে মত ভেদ হইয়াছিল, তন্নিম্ন কার্যোপযোগী

* মুদ্রিত সুশ্রুত সংহিতায় যে “সযষ্ঠানাস্থিশতানি ভাষন্তে” পাঠ দেখা যায়, বোধ হয় তাহা লেখক প্রমাদ । কেননা প্রত্যেক বেদবাদীর প্রস্থে ৩৬০ খণ্ড অস্থির উল্লেখ ও গণনা আছে এবং সে উল্লেখ ও সে গণনা যথাযথ নির্দেশ দ্বারা সঙ্গমার্ণিত আছে । বিশেষতঃ ষষ্ঠ শব্দে ৬ সংখ্যা গৃহীত হয় না, ছয়ের পূরণ একটি মাত্র গৃহীত হয় । একারণ, তিন শত ছয় সংখ্যা গ্রহণ করিবার উপায় না থাকায় প্রোক্ত “সযষ্ঠানি” পাঠ ভুল ।

বস্তুনির্গম সম্বন্ধে তাঁদের আদৌ বিস্ময়াদিতা ছিল না । এ সিদ্ধান্ত
সত্য কি অসত্য তাহা এতৎপ্রবন্ধের শেষভাগ দেখিলেই বুঝিতে
পারিবেন ।

বলা হইয়াছে যে, বেদবাদী ঋষিরা শরীরে ৩৬০খণ্ড অস্থি থাকা
শ্রীকার করিতেন ; কিন্তু তাহার বিভাগ কিরূপ অর্থাৎ শরীরের
কোথায় কিরূপ আকারের কয়খানি অস্থি আছে তাহা বলা হয়
নাই ; সুতরাং প্রথমে ষষ্ঠাধিক-ত্রিশত-অস্থি-বাদীর গণতের ৩৬০
অস্থির স্থান নির্ণয় ও উক্ত সংখ্যক অস্থির বিভাগ অর্থাৎ সন্নিবেশ
প্রকার বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে ।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রদর্শিত অস্থির স্থানবিভাগ ও

সংখ্যাসংগ্রহ ।

বেদবাদী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

“স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টিদন্তা বৈ বিংশতিনখাঃ ।

পাণিপাদশলাকাস্চ তেষাং স্থানচতুষ্টিয়ম্ ॥

ষষ্ঠ্যঙ্গুলীনাং দ্বৈ পাণ্যেণ্ডুগূলফেষু চ চতুষ্টিয়ম্ ।

চত্বার্ষ্যরত্নিকাস্থীনি জজ্ঞয়োস্তাবদেব তু ॥

দ্বৈ দ্বৈ জানুকপোলোক ফলকাংসমুদ্ভবে ।

অক্ষতালুঘকশ্রোণীফলকে চ বিনির্দ্দেশে ॥

ভগাস্থ্যকং তথা পৃষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।

গ্রীবা পঞ্চদশাস্থী স্যাৎ জত্রৈকৈকং তথা হনুঃ ॥

তন্মূলে দ্বৈ ললাটাক্ষিগণ্ডে নামা যনাস্থিকা ।

পাশ্বকাঃ স্থালকৈঃ সার্কমৰ্কুদৈশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ ॥

দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা ।

উরঃসপ্তদশাঙ্গিম্যাৎ পুরুষাঙ্গাঙ্গিমংগ্রহঃ ॥”

অস্য টিকা ।

“স্থালানি দন্তমূলপ্রদেশস্থান্যঙ্গীনি দ্বাত্রিংশৎ । তৈঃ সহ দ্বাত্রিংশৎ দন্তাঃ ।
মিলিত্বা চতুঃষষ্টির্ভবন্তি । নখাঃ কবচরণরূপাঃ বিংশতিঃ । হস্তপাদস্থানি
শলাকাकाराणाङ्गीनि मणिवक्त्रसोपरिवर्तीनि अङ्गुलिमूलस्थानि विंशतिरेव ।
तेषां नथानां शलाकाङ्गुलिं स्थानचतुष्टयं द्वौ चरणौ करोतेति ।
ইতোব মস্ত্রাং চতুষ্কন্তরং শতং । বিংশতি রঙ্গুলমঃ । তাগাং একৈকম্যাং
জীণি জীণি পক্ষীয়াঙ্গীনি । ইতোবঃ অঙ্গুলিসম্বন্ধীনাঙ্গীনি ষষ্টির্ভবন্তি ।
পাদযোঃ পশ্চিমৌ ভাগৌ পার্শ্বৌ । তয়োরাঙ্গীনি দ্বৈ । একৈকস্মিন্ পাংদে
ওল্ফৌ দ্বৌ । চতুর্ষু ওল্ফেষুঙ্গীনি চত্বারি । বাহ্যোবরত্নি প্রমাণানি
চত্বার্যাঙ্গীনি । জঙ্ঘযোস্তাবদেব চত্বার্যোব । ইতোবঃ চতুঃসপ্ততিঃ ।
জঙ্ঘাঙ্গুসন্ধির্জানুচ্যতে । কপোলোগল্লঃ । উরুঃ সন্ধি তৎ ফলকম্ ।
অংশোভুজশিরঃ । অক্ষঃ কর্ণনেত্রয়োর্মধ্যে শঙ্খাদধোভাগঃ । তালুযকং
কাকুদম্ । শ্রোণী ককুগাতী তৎফলকম্ । তেষামেকৈকত্র অঙ্গীনি দ্বৈ দ্বৈ
বিনির্দ্দেশেৎ । ইতোবঃ চতুর্দশাঙ্গীনি ভবন্তি । ওক্ষাশ্চ্যেকম্ । পৃষ্ঠে পশ্চিম-
ভাগে পঞ্চচত্বাবিংশদঙ্গীনি ভবন্তি । গ্রীবা কক্ষরা । সা চ পঞ্চদশাঙ্গী ম্যাৎ ।
বক্ষোহংসয়োঃ সন্ধির্জজ্ঞঃ । প্রতিজ্ঞজ্ঞঃ একৈকম্ । হস্তশ্চিবুকম্ । তত্রাপ্যে-
কমঙ্গি । ইত্যেবং চতুঃসপ্তিঃ । হনোমূলে অঙ্গীনি দ্বৈ । ললাটং ভালং ।
অক্ষি চক্ষুঃ । গণ্ডঃ কপোলান্ধয়োর্মধ্যপ্রদেশঃ । তত্র প্রত্যেকমঙ্গি যুগলম্ ।
নাসা ঘনসংজ্ঞাস্থিমতী । পার্শ্বকাঃ কক্ষাধঃপ্রদেশসম্বন্ধাঙ্গীনি । তদা-
ধার ভুতানি চ স্থালকানি । তৈঃ স্থালকৈঃ অর্কুদৈশ্চ অঙ্গিবিশেষৈঃ সহ
পার্শ্বকাঃ দ্বিসপ্ততিঃ । পূর্বোক্তৈশ্চ নবভিঃ সার্কিমেকাশীতির্ভবন্তি । জক-
র্ণয়োর্মধ্য প্রদেশে অঙ্গিবিশেষৌ শঙ্খকৌ । শিরসঃ সম্বন্ধীনি চত্বাবি কপা-
লানি । উরুঃ বক্ষঃ তৎ সপ্তদশাঙ্গিকম্ । ইত্যেবং পুরুষাঙ্গিসংগ্রহঃ কথিতঃ ॥”

(বিজ্ঞানেন্দ্রব) .

এই সকল সংস্কৃত কথার বঙ্গানুবাদ নইয়া যদি তালিকা প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে এইরূপ হয় ।

(১)	স্থানকান্ধি	৩২	(Alveolar processes of the superior and inferior Maxillary bones.)
(২)	দন্ত	৩২	Teeth
(৩)	নখ	২০	Nails
(৪)	শলাকান্ধি	২০	Metacarpel bones
(৫)	অঙ্গুল-পর্লান্ধি	৬০	Phalanges
(৬)	পাখি' দ্বয়ে	২	Calcaneum or os calcis

(১) যে স্থানে দন্তপঙ্ক্তি স্থাপিত থাকে সেই স্থানের নাম স্থানক ও উল্লুখল । ৩২ খণ্ড স্থানক আছে ; পবস্ত তাহা সংযুক্ত প্রায় থাকায় নীচে ও উপরে দুই খানির নাম দেখায়, ৩২ বলিয়া বোধ হয় না ; না হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে ৩২ ।

(২) দন্তকে অস্থি মধ্য গণনা করিবার বিশেষ অভিপ্রায় আছে । যে অভিপ্রায় হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অনুগত । চিকিৎসার সহিত তাহার যনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই । দেখিতে অস্থিতুল্য বলিয়াও অস্থিমধ্যে গণ্য হইয়াছে ।

(৩) নখ যদিও অস্থি নহে; তথাপি অস্থি-মল বলিয়া অস্থিমধ্যে গণিত হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম শাস্ত্রোক্ত গঙ্গা-স্নিগ্ধপ্রক্ষেপের সাহায্যকারী বলিয়াও অস্থিমঞ্জার যোগ্য হইয়াছে ।

(৪) দুই হস্তে ও দুই পদে ২০ অঙ্গুলি, এই সকল অঙ্গুলির মূলে শলাকাকার ২০ খানা অস্থি আছে । শলাকাকার বলিয়া উহাকে শলাকান্ধি বলে ।

(৫) প্রত্যেক অঙ্গুলে ছোট বড় তিনটি করিয়া পর্ল আছে ; সেই সকল পর্লের অস্থি পরস্পর পৃথক ।

(৬) পদের পশ্চাৎ দিক্কে পাখি' বলে । ইহার ভাষা নাম "গোড়" ।

(৭) গুল্ফচতুষ্টয়ে	৪	Internal and external malleolar processes of the Tibia and Fibula
(৮) অরত্নিকাস্থি	৪	Radius and Ulna
(৯) জজ্ঞাস্থি	৪	Tibia and Fibula
(১০) জাম্বুর অস্থি	২	Patella
(১১) কপোলাস্থি	২	Malar (cheek bones)
উরুং বা সন্ধি	২	Femur
(১২) অংশাস্থি	২	Humerous.
(১৩) অক্ষকাস্থি	২	Zygomatic process of the temporal bones.

(৭) যে স্থানে পদের সহিত জজ্ঞার সংযোগ হইয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে টিপির মত দুইটা গাঁইট আছে সেই গাঁইট দুটিকে গুল্ফ বলে । দুই পদে ৪ টি গুল্ফ ; সুতরাং গুল্ফাস্থি ৪ ।

(৮) হাতের কজীর উপরে কনুই পর্য্যন্ত লম্বা এতোক হস্তে দুই খানি করিয়া অস্থি আছে, তাহাকে অরত্নিকাস্থি বলে ।

(৯) গুল্ফের উপরে হাটু পর্য্যন্ত জজ্ঞা । এতোক জজ্ঞায় দুই খানি অস্থি ; দুই জজ্ঞায় ৪ খানি অস্থি ।

(১০) জজ্ঞার সহিত উরুতের সংযোগ স্থলে সংযোজক অস্থি আছে । ইহার ভাষা নাম “ হাঁটুর মালা ” সংস্কৃত নাম জাম্বু ।

(১১) কেহ বলেন, কপোলাস্থি না বলিয়া কফোলাস্থি বলা সংগত কফোণ শব্দের ভাষা কথা “ কনুই ” । বস্তুতঃ কপোল শব্দের অর্থ এস্থলে “ গাল ” ।

(১২) কনুইয়ের উপরে কঁাদ পর্য্যন্ত ।

(১৩) কর্ণ ও নেত্র এই দুএর মধ্যস্থানে ও অস্থি নীচে ।

(১৪) তালুয়ক	২	Spinal processes of the 6th & 7th cervical vertebrae
(১৫) ত্রোণিকাস্থি	২	4th & 5th Lumbar vertebrae
(১৬) গুহাস্থি	১	Pubic portion of the os innominata.
(১৭) পৃষ্ঠাস্থি	৪৫	Vertebrae, divided into 5 regions *—according to some anatomists' opinion it is divided into 4 regions
(১৮) কঙ্করাস্থি	১৫	7 Cervical vertebrae 2 clavicals 2 Scapulae manubrium gladiolous. Xoihyed or Ensiform cartilago.

(১৪) ককুদ স্থানের নাম তালুয়ক, ইতর ভাষায় ইহাকে “ঘাড় ও বুজি” বলে । কোন কোন দেশে এই স্থানটিকে গরদানা বলে ।

(১৫) কটিপার্শ্ব—নিতম্বের উপরিভাগ । ইহার অন্য নাম ফলক ।

(১৬) ইহার অন্য নাম ত্রিকাস্থি ।

(১৭) যে সকল অস্থিখণ্ডে মেরুদণ্ড নির্মিত হইয়াছে ।

(১৮) যাহার উপর মস্তক স্থাপিত তাহার নাম কঙ্কর । ইহার ভাষা নাম “কাঁদ” । এই স্থানে ছোট বড় ১৫ খণ্ড অস্থি আছে ।

(a) Cervical region composed of 7 pieces.

(b) Dorsal region composed of 12 pieces.

(c) Lumbar region composed of 5 pieces.

(d) Sacral region composed of 5 pieces.

(e) Coxygial region composed of 3 pieces.

(১৯)	জক্রর অস্থি	২	Clavicals
	হনু বা চিবুক(দাড়ি)	১	Inferior maxillary bone
	হনুমূল বা হনুবন্ধন	২	†—Vertical portion of the inferior Maxillary bone.
	ললাটাস্থি	২	Frontal bone.
	অক্ষিগোলক(কোটর)	২	Horizontal portion of the frontal bone.
(২০)	গণ্ডাস্থি	২	Superior maxillary bones
(a)	নাসাস্থি বা ঘনাস্থি	১	(a) Nasal bone
(২১)	পার্শ্বক বা পঞ্জরাস্থি		Ribs' their cartilages and
	স্থালক ও অর্কুদ সহ	৭২	dorsal and lumbar regions of the vertebrae column
(২২)	শঙ্খাস্থি	২	Temporal bones
(২৩)	কপালাস্থি	৪	Cranial bones
	বক্ষ অস্থি	১৭	Two Parietals
		৩৬০	One occipital and one frontal

(১৯) কণ্ঠের দুই দিকে কাঁদ পর্যন্ত লম্বা, বুক ও অংশের যোজক অস্থি । ইহার সংস্কৃত নাম জক্র ।

(২০) কপোল ও অক্ষ এই দুইএর মধ্যস্থলের অস্থি ।

(২১) কক্ষের অধোভাগকে পাঁজড়া বলে । এই পাঁজড়ার মূলে দস্তাধার স্থালকের ন্যায় স্থালক ও অর্কুদ নামক অস্থ্যংশ আছে ; সে সমস্ত গণনা করিলে সর্ব সমেত ৭২ সংখ্যা নির্ণীত হয় ।

(২২) জ ও কর্ণের মধ্যবর্তী অস্থি । এই স্থানের ত বা নাম "রগ"

(২৩) মস্তকের খুলি প্রভৃতি ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে পুরুষাশ্বিনীমংগ্রহ ও তত্তাবতের স্থান নির্দেশ (বিভাগ প্রদর্শন) করিয়াছেন। বেদবাদী বিষয় ঠিক এইরূপ বিভাগ ও সংখ্যা উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

“তেষাং বিভাগঃ । সূর্য্যোঃ সহ চতুষ্টয়টিদশনাঃ । * ।
বিংশতিনখাঃ । পানিপাদশলাকাম্ । যষ্টিরমূলীনাং পঞ্চাশি ।
দ্বৈপাশেষ্যঃ । চতুষ্টয়ং গুল্ফেযু । চত্বার্য্যরত্নোঃ । চত্বারি
জজ্বয়োঃ । দ্বৈ দ্বৈ জানুকপোলয়োঃ, উর্ধ্বংশয়োশ্চ । অক্ষ-
তালুযকশ্রোণীফলকেযু চ । ভগাশ্চ্যেকং । পৃষ্ঠাশ্চ পঞ্চ চত্বা-
রিংশদ ভাগম্ । পঞ্চদশাঙ্গী গ্রীবা । জক্ৰন্যেকম্ । তথা হনুঃ ।
তস্মৈ চ দ্বৈ । দ্বৈ ললাটাক্ষিগণ্ডে । নাশা যমাহিকা । অর্ধদৈঃ
স্থানকৈশ্চ সার্কং দ্বাসপ্ততিঃ পার্শ্বকাঃ । * উরঃসপ্তদশ । দ্বৌ
শাঙ্খকৌ । চত্বারি কপালানি, শিরসশ্চেতি ।”

ইহার বঙ্গানুবাদ ঠিক পূর্বোক্ত অনুবাদের তুল্য । এজন্য ইহার পৃথক অনুবাদ অপ্রয়োজনীয় । বৈদ্যকাচার্য্য চরক মুনিও বেদবাদী ঋষিদিগের ন্যায় যষ্ট্যধিক ত্রিংশত অস্থিদাদী ছিলেন, এবং তিনিও উক্ত প্রকার অস্থি বিভাগ উপদেশ করিয়াছেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রান্ত উপদেশ করেন নাই । যথা,—

‘ত্রীণি যষ্ট্যধিকানি শতাশ্চ ২২ সহ দন্তোলু খলদন্তনখৈঃ ।
তদ্যথা—দ্বাত্রিংশৎ দন্তোলু খলানি । দ্বাত্রিংশৎ দন্তাঃ । বিংশতি-
নখাঃ । বিংশতিঃ পানিপাদশলাকাঃ । চত্বার্য্যধিষ্ঠানান্যামাম্ ।

* সূর্য্যোঃ দত্তাধারভূতৈঃ শলাখৈরশ্বিনীমংগ্রহঃ সহ ।

* পার্শ্বকা বজ্রয়ঃ । তাসাং বজ্রমি সক্ষাঙ্গীনার্জুনানি উভয়তো দশ দশেতি
বিংশতিঃ । তাসামেব পৃষ্ঠতঃ সক্ষাঙ্গীনি স্থানকা উভয়ত জয়োদশ
জয়োদশেতি যড়বিংশতি রিতি ব্যাখ্যাস্তরম্ ।

পাণিপাদপৃষ্ঠানীতি । যষ্টিরঙ্গুল্যস্থীনি । দ্বৈ পাণ্যোঃ । দ্বৈ
কুর্চ্চাঃ । চত্বারঃ পাণ্যোর্মণিকাঃ । চত্বারঃ পাদয়োঃ লফাঃ ।
চত্বার্যরভ্রোঃস্থীনি । চত্বারি জঙ্ঘয়োঃ । দ্বৈ জানুনোঃ । দ্বৈ উর্বোঃ ।
দ্বৈ বাহ্বোঃ । দ্বাবংসয়োঃ । দ্বাবক্ষকৌ । দ্বৈ তালুনী । দ্বৈ
শ্রোণীফলকে । একং ভগাস্থি । পুংসাং মেঢ়াশ্চ্যকং । ত্রিক
সংশ্রিতমেকং গুদাস্থি । পৃষ্ঠগতানি পঞ্চত্রিংশৎ । দ্বৈ হনুমূল-
বন্ধনে । দ্বৈ ললাটে । দ্বৈ অক্ষোঃ । দ্বৈ গণ্ডয়োঃ । নামিকায়াং
ত্রীণি ঘোণাখ্যানি । দ্বয়োঃ পান্থয়োঃ চতুর্বিংশতিশ্চতুর্বিংশতিঃ
পঞ্জরাস্থীনি পান্থকাখ্যানি । তাবন্তি চৈষাং স্থালকান্যবুদা-
কারাণিচ । তানি দ্বিসপ্ততিঃ । দ্বৌ শঙ্খকৌ । চত্বারি শিরঃ-
কপালানি । বক্ষসি সপ্তদশ । ইতি ত্রীণি যষ্ট্যধিকানি শতান্য-
স্থাম্ ।” (চরক ৭অঃ, শরীরস্থান) *

অন্য ব্যাখ্যা ।

দন্তোলুপলানি দন্তানামাধারভূতানি তনুলপ্রদেশস্থানি স্থাপারপর্যায়-
য়ানি । উৎপাটিতেষু দন্তেষু তানুলুপলবৎ দৃশ্যন্ত ইত্যলুপলান্যুচ্যন্তে ।
তানি চ দন্তাশ্চ নখাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ । তৈঃ সহ অস্থীঃ যষ্ট্যধিকানি ত্রীণি
শতানি পূর্বাভ্যে ইতি শেষঃ । পাণীচ পাদৌচ পাণিপাদৌ । তেযাং শলাকাঃ
শলাকাকারান্যস্থীনি বিংশতিঃ । হস্তদ্বয়ে মণিবন্ধস্যোপরিবর্তীনাঙ্গুলিমূল-
জ্ঞানি দশ, পদদ্বয়েহপ্যঙ্গুলিমূলস্থানি দশ ইতি মিলিত্বা শলাকাস্থীং বিংশতি-
রেন সংখ্যা জায়তে । আসাং শলাকানাং অধিষ্ঠানানি স্থিতিস্থানানি পাণি
পৃষ্ঠদ্বয়ঃ পাদপৃষ্ঠদ্বয়ক্ষেতি চত্বারি । যষ্টিরঙ্গুল্যস্থীনি পর্শ্বাস্থীনি । বিংশতি

* এ পর্য্যন্ত যে কয়েক খানি চরক সংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সকল
গুলিই অশুদ্ধ পাঠে পরিপূর্ণ সুতরাং এতৎ পাঠের সহিত যে সকল পুস্তকের
পাঠের অনেক অনৈক্য দেখিতে পাইবেন । পরন্তু পাঠক অভ্যাস অনুসন্ধান
করিয়া দেখিলেই কোন পাঠ ভাল তাহা বুঝিতে পারিবেন ।

রাজ্যলয়স্তাম্যমৈককম্যাক্ষীনি জীব পক্ষ্মানি । স্মৃতরাং পক্ষ্মাঙ্গীনি যষ্টিরিভ
 বিস্তারঃ । পাদয়োঃ পশ্চিমো ভাগো পাক্ষী তয়োরাঙ্গিনী ধে । অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি
 মধ্যভাগঃ কূর্চঃ তস্যাধস্তাৎ ধে । কনারঙ্গিসন্ধিস্থানং মণিকা, মণিবন্ধ ইত্যপি ।
 হস্তদ্বয়ে তদঙ্গীনি চত্বারি । জঙ্ঘাপাদসংযোগস্যোভয়তো গ্রন্থিলো ভাগো গুল্ফ
 ইত্যুচ্যতে । একৈকস্মিন্ পদে ধৌ গুল্ফৌ । চতুর্ গুল্ফেদঙ্গীনি চত্বারি ।
 কূর্ণাধস্তাৎ মণিবন্ধস্যোপরি বাহ্যে রঙ্গিগ্রামাণানি চত্বার্বো বাঙ্গীনি ।
 জঙ্ঘায়াস্তাবদেব চত্বার্বো ব । জঙ্ঘারঙ্গনক্ষির্জালুঃ । তদ্বয়ে ধে । উকঃ সন্ধি ।
 তদ্বয়েহপি ধে । অংসয়োঃ ভুজশিরসোঃ ধে । অক্ষকঃ কর্ণনৈত্রয়োর্মধ্যে
 শাঙ্গাদধোভাগঃ তদ্বয়ে ধে । তালুনি (তালুকে) কাকুদে ধে । পৃষ্ঠগতান্য-
 ঙ্গীনি মেরুগ্রন্থিরূপানি প্রধানতঃ পঞ্চত্রিংশৎ । গ্রীবা কক্ষরা । বক্ষো-
 হংসয়োঃ সন্ধির্জঙ্ঘাঃ । তদ্বয়ে ধে । হস্তশ্চিবুকং তজৈকম্ । কপোলাক্ষয়ো
 র্মধ্যপ্রদেশো গণ্ডঃ । কক্ষাধঃপ্রদেশঃ পার্শ্বঃ । তত্রৈকস্মিন্ পার্শ্বে চতুর্বিংশতি-
 রপরাঙ্গিমপি চতুর্বিংশতিরিত্যেবমষ্টচত্বারিংশৎ । তেষাং শর্কুদাকারানি
 স্থানকাঙ্গীনি চ তাবন্ত্যেব চতুর্বিংশতিরেব । ইতোবং তানি দ্বিসপ্ততিঃ । *
 ভ্রাকর্ণয়োর্মধ্যপ্রদেশেহৌ গ্রন্থিবিদ্যেহৌ শাঙ্গকৌ । শিরঃসংস্থানি কপালানি
 কপালাখ্যান্যঙ্গীনি চত্বারি । বক্ষসি সপ্তদশ । ইতোবং যথৈধিক ত্রিশতাংগীনি
 বিদ্যাৎ ।

বঙ্গভাষায় ইহার নিষ্কর্ষ এইরূপঃ—

শরীরের দস্ত, দস্তাধার ও নখ গণনা করিলে সর্বসমেত ৩৬০
 সংখ্যক গ্রন্থি লক্ষ হয় । সে সকলের বিভাগ ও স্থানিক সংখ্যা
 এইরূপ—

দস্তমূল সকল চ্যাপ্টা ও গর্তাকার, এজন্য তাহা দস্তোলুখল
 ও স্থালক নামে প্রসিদ্ধ । দস্তের সংখ্যা ৩২ ; স্মৃতরাং দস্তো-
 লুখলের সংখ্যাও ৩২ । প্রত্যেক অঙ্গুলি-গুস্তকে নখ নামক পদার্থ

* অর্কুদাখ্যানি ইতি পাঠে বক্ষসি যৎপার্শ্বক সন্ধ্যস্থি বর্ততে তৎ অর্কুদং ।
 পৃষ্ঠতো যৎ পজ্বরসন্ধ্যস্থি অস্তি তৎ স্থালকম্ ইত্যর্থোজ্ঞেয়ঃ ।

আছে, অঙ্গিমল বলিয়া তাহাও অঙ্গিমধ্যে গণ্য এবং তাহাদের সংখ্যা ২০ । হাতের পৌছায় ও পায়ের পাতায় প্রত্যেক অঙ্গুলীর মূল প্রদেশে এক এক খণ্ড লম্বা অঙ্গি আছে ; সে গুলি শলাকাকার বলিয়া শলাকাস্থি এবং তাহাদের সংখ্যা ২০ । প্রত্যেক পদের পিছু দিকে (গোড় বা গুড়মুড়ায়) এক এক খণ্ড অঙ্গি আছে ; সেই দুই অঙ্গিকে পার্শ্বাঙ্গি বলে ; পার্শ্বাঙ্গির সংখ্যা ২ । পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলে যে স্থানটী গ্রন্থিল বলিয়া বোধ হয়, তাহার নিম্নে এক এক খণ্ড অঙ্গি আছে সুতরাং দুই পদের কূর্চাঙ্গি ২ । প্রত্যেক হাতের কজীতে দুই দুই খণ্ড ক্ষুদ্রাঙ্গি আছে ; তৎকারণে দুই হাতের মণিকাঙ্গি ৪ । পদের দুই পার্শ্বে গ্রন্থিল স্থান আছে, তাহার নাম গুল্ফ, দুই পদে গুল্ফ চারিটি, তাহাতে ৪ অঙ্গি আছে । হস্তের কণ্ঠেই হইতে কব্জী পর্য্যন্ত অরঙ্গি, প্রত্যেক অরঙ্গিতে দুই দুই অঙ্গি ; সমুদায়ে অরঙ্গিকাঙ্গি ৪ । হাঁটুর নীচু ভাগ জঙ্ঘা নামে খ্যাত । প্রত্যেক জঙ্ঘায় দুই দুই অঙ্গি ; সুতরাং জঙ্ঘাঙ্গির সংখ্যা ৪ । হাঁটুর সংস্কৃত নাম জানু । তথাকার অঙ্গি ২ (ইহাকে হাঁটুর মালা বলে) । হাঁটুর উপরে উরু ; ইহার ভাষা নাম উরুৎ । দুই উরুতে দুই খণ্ড অঙ্গি আছে, অধিক নাই । কণ্ঠেইয়ের উপরিভাগ বাহু ; দুই বাহুতে দুই খণ্ড দীর্ঘাঙ্গি আছে । প্রত্যেক বাহুর মাথায়, প্রত্যেক কাঁধের পার্শ্বপ্রান্তে, এক এক খণ্ড যোজক অঙ্গি আছে ; তাহার নাম অংশাঙ্গি ; অংশাঙ্গির সংখ্যা ২ । চক্ষু ও কর্ণের মধ্যপ্রদেশে এবং শঙ্খাঙ্গির নীচে অক্ষক নামক দুই খণ্ড অঙ্গি আছে । ভাষা কথায় যে স্থানকে ঝুঁটী বলে, সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে তালুযক ও ককুৎ বলে । সেই ককুৎ দুই খণ্ড অঙ্গির দ্বারা নির্মিত । শ্রোণীস্থানের ফলকাঙ্গি (তক্তার ন্যায় চাপটা) দুই এবং স্ত্রীলোকের ভগাঙ্গি এক । পুরুষগণের তৎপরিবর্তে মেঢ়াঙ্গি এক (মেঢ়ে অঙ্গি নাই সুতরাং মেঢ়াঙ্গি

শব্দের অর্থ তাহার মূল প্রাদেশস্থ অস্থি অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি-স্থানস্থ অস্থি) । তদ্বিষয় গদাশ্চি অর্থাৎ মলদ্বার নিষ্পাদক অস্থি এক । এগুলি একসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ত্রিকোণিত্র অবয়ব মাত্র । পৃষ্ঠাশ্চি অর্থাৎ মাহাকে গেরু বা গেরুদও বলিয়া অভিহিত করা যায়, প্রাধান-কল্পে তাহা ৩৫ খণ্ড অস্থি দ্বারা নির্মিত । মস্তক গেরুদওর উপরে সংস্থাপিত বটে ; পরন্তু তদুভয়ের সংযোগস্থান অর্থাৎ গ্রীবাদেশে ছোট বড় ১৫ পণন খানা অস্থি আছে । কঠের দুই দিকে দুই খানি কঁাদ পর্য্যন্ত লম্বা অস্থি আছে; তদুভয়ের নাম জত্র । এই জত্র অস্থি দুই । হনু, চিবুক বা দাড়ি । দাড়ি নাগক স্থানটি এক খণ্ড অস্থি দ্বারা নির্মিত । তাহার মূলে তাহার বন্ধনাশ্চি দুই । ললাটে দুই । অক্ষি কোর্টারেবও দুই । কপালের ও চক্ষুর মধ্যভাগকে গণ্ড বলে । গণ্ড দুই সুতরাং গণ্ডাশ্চিও দুই । নাগাব ঘোণাশ্চি তিন । দুই পার্শ্বের পঞ্জবাস্চি, তাহার মূলগ্রন্থীস্থালক ও অর্কদ, সমুদায়ে ৭২ । অর্থাৎ ছোট বড় পাঁজডাব কাটি $২৪।২৪ = ৪৮$, আর তাহার সন্ধিস্থানস্থ গ্রন্থি ২৪ । ভ্রুকর্ণের মধ্যভাগের নাম শঙ্খ । ইহার ভায়া নাম রগ । দুই বগে দুই খণ্ড অস্থি আছে । মস্তকেব অস্থির নাম কপাল, তাহার সংখ্যা ৪ । এতদ্ভিন্ন বক্ষঃপ্রদেশে ছোট বড় স্তূর খান অস্থি আছে । সমুদায়ে ৩৬০ খানা অস্থি এই মানব শরীরে বিদ্যমান আছে ।

জিজ্ঞাসু এখন জানিতে চাহিবেন, মোট সংখ্যার ঐক্য হইল বটে, কিন্তু স্থানিক সংখ্যার ঐক্য না হইল কেন ? অর্থাৎ প্রত্যেক বেদবাদী ৩৬০ অস্থি বলিয়াছেন এনথা সত্য ; কিন্তু সে সকলের স্থানিক সংখ্যা অর্থাৎ যে যে স্থানে যে নএক খানা করিয়া অস্থি থাকে তাহার নির্ণয় বা গণনা পরস্পর মিল বা ঐক্য না হইল কেন ? বেদবাদী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সঙ্ঘিত ভগবান্ বিয়ুর সম্পূর্ণ একতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু শরীরতত্ত্ববিৎ চরক মুনির সঙ্ঘিত যাজ্ঞবল্ক্য

ঋষিব স্থানিক সংখ্যা সম্বন্ধে অনৈক্য ঘটনা হইল কেন ? চরক মুনি পৃষ্ঠাঙ্খি ১০ খানা কমাইয়া দিয়া কূর্টাস্থি ২, হস্তগণিকা ৪, ভগাস্থি ও মেট্রাস্থি ২, নাগিকা স্থানে ২, এই দশ খানি বাড়াইয়া দিয়া ৩৬০ সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন ইহার অভিপ্রায় কি ?

যদিও ইহার যথোচিত প্রত্যুত্তর বা মীমাংসা অসম্ভব হইলেও ; তথাপি আমরা এই অস্বাভাবিক উপসংহার কালে উক্ত প্রকার অনৈক্যের কারণ ও তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করিব না । ত্রিশতাব্দীস্থিবাদী স্মৃতি ও দ্বিশতাব্দীস্থিবাদী আধুনিক ইংরাজ, ইহারা যে কি জন্ত নূনসংখ্যার পক্ষপাতী, কি কারণে দুইকে এক বলেন, তাহা যখন আমরা বুঝিতে পারিব, তখন আর কোনও মীমাংসা অবশিষ্ট থাকিবে না । আপাততঃ আমরা মোটামুটি দেখিতে পাইতেছি, স্মৃতি মুনি নখগুলিকে আদৌ গণনা করেন নাই, সুতরাং ২০ সংখ্যা কমিয়া গেল । দস্তাধার স্থালক বা দস্তোলুখলগুলিকে পৃথক বলিতে চাহেন নাই, নিতাস্ত সংযুক্ত অর্থাৎ একটু দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছুক হন নাই, সুতরাং ৩২ সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে । পৃষ্ঠবংশে যে দ্ব্যঙ্গুরীয়ক অস্থি আছে, সে গুলিকে তিনি দুই না বলিয়া এক বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, কায়েকায়েই পৃষ্ঠাঙ্খির সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে । এই সকল তথ্য অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবেন, কোনও মুনি মিথ্যা কথা বা আন্দাজী কথা বলেন নাই, সকলেই সত্য ও পরীক্ষিত তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন । ঐরূপ অঙ্গ ভারতম্যে চিকিৎসকের চিকিৎসার ব্যাঘাত হয় না ; কিন্তু যোগীর যোগজ্ঞানের ব্যাঘাত হয় ; তজ্জন্তই বোধ হয় বেদবাদী ঋষিরা কিছু কিছু অন্যথা উপদেশ করিয়াছেন । আধুনিক ইংরাজ চিকিৎসকগণ যে দুই শত মাত্র অস্থি থাকা নির্দেশ করিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিব ।

সুশ্রুত মুনির অস্থি-সংখ্যা নির্দেশ সম্বন্ধে আমরা এবারে কিছুই বলিতে পারিলাম না, আগামীমাসের সঞ্জীবনীতে তাহা সাবধানতা সূচকাবে বিবেচনা পূরক বর্ণনা করিব এবং সত্যাস্তরের সহিত তাহাব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিব । নব্য ডাক্তারগণ ২০০ অস্থি থাকা নির্ণয় করিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহাই প্রত্যক্ষ হয় । এমন স্থলে ৩০০ অস্থি থাকার উল্লেখ করিলে অবশ্যই তাহা ভ্রম বা আন্দাজী উল্লেখ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । সুতরাং সত্যবাদী স্বামির অভ্রান্ততা দেখাইবার নিমিত্ত সামঞ্জস্য বিধানের আবশ্যক আছে । সুশ্রুত মুনি যে কারণে ৩০০ অস্থির উল্লেখ করিয়াছেন সে কারণ অগ্রে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব ; পরে প্রস্তাব শেষ করিব ।

ক্রমশঃ ।

কালতত্ত্ব ।

শিশিরীয় কর্তব্য বিধান ।

পূর্বে যে ঋতুসন্ধির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি ।

প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গহৃদয়কর্তা “বাতট” বলিয়াছেন, “ঋতুহারা দ্যস্ত-মণ্ডাহারতুসন্ধিঃ” অর্থাৎ বর্তমান ঋতুর শেষ মণ্ডাহ এবং আগামী ঋতুর প্রথম মণ্ডাহ এই পঞ্চদশ দিন ঋতুর “সন্ধিকাল” অর্থাৎ উভয় ঋতুর মেলন সময় । এই পঞ্চদশ দিনের প্রথম দিবস হইতে বর্তমান ঋতুর আচরিত আহার ব্যবহার পরিবর্ত করিতে হইবে অর্থাৎ আগামী ঋতুর আহার ব্যবহারের কথঞ্চিৎ প্রবর্তনা এবং বর্তমান ঋতুর আহারাদির কোন কোন নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হইবে । কেননা একদা সাত্ম্য পরিত্যাগ করিলে শারীরিক অসুস্থতা ঘটিবার ঐকান্তিক সম্ভাবনা । অতএব ঋতুর সন্ধিকাল হইতে অপর ঋতুর কর্তব্য ব্যবহারে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে স্বভাবে আনিতে হইবে ।

প্রস্তাবিত শিশির ঋতু হেমন্ত ঋতুর তুল্যগুণবুক্ত ; সুতরাং তুল্য ফলদাতা, কেবল আদানিক ঋতু বিধায় অতিঅল্পমাত্র প্রভেদ থাকায় যাহা অতিরিক্ত কর্তব্য তাহাই লিখিত হইতেছে ।

ঔষমস্তিকোচিত আহার ব্যবহার সকলই শিশিরে আচরণ করিতে হইবে, কেনন বেগবান উত্তর দিগ্ভব শীতল বায়ুর সহিত জলবর্ষণহেতু,এইসময়ে অত্যন্ত তীব্র শীতানুভব,এবং আদান কালের স্তূত্রপাত হয় । এই নিমিত্ত এই সময়টি কিঞ্চিৎগাত্র রক্ষা । অতএব এই শিশির ঋতুতে লঘুপাকী এবং বায়ুজনক বস্ত্র ও কটু, তিক্ত, কষায়, রসযুক্ত বস্ত্র আহার করিবে না ।পরন্তু অতি শীতল নষ্ট আহার অথবা যেসকল আচরণ দ্বারা পূর্বোক্ত বস্ত্র সকলের ফল পাওয়া যায়,তাহাও পরিত্যাগ করিবে । বাহ্যশীতল বায়ু শরীর দূষিত করিতে না পাবে

এমত উষা গৃহে নাম এবং উষা লোমশ শয্যা ব্যবহার করিবে ও সর্বদা লোমতন্তুকৃত বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবে। এই শিশির ঋতুর কুর্ভব্য ক্রিয়া সকল হেমন্ত ঋতুতে বর্ণিত হইবে। কেননা শীতল্যঞ্জন ঋতুদ্বয় একটি আদানিক একটি বৈশর্গিক। অতএব এস্থলে কেবল আদানিক বিধানের উল্লেখ করিয়াই প্রাপ্ত শেষ করিলাম। উভয় ঋতুর সমবিধান হেমন্ত ঋতুতে প্রকাশ করিব। রণায়ন, বাজীকরণ, এবং বয়ঃস্থাপন তদমম সকল এই ঋতুতে ব্যবহার আরম্ভ করিবে।

বসন্ত ঋতু ।

(চৈত্রমাস এবং বৈশাখমাস । মীন এবং মেঘ রাশি ।)

এই ঋতু আদান কালের মধ্যবর্তী সূর্য্যের মন্দগতি ব্যঞ্জক। সূর্য্যদেব এইসময় পৃথ্বীগণ্ডলের কেন্দ্রস্থ হইয়া একদিন মাত্র সমস্ত ধরাগণ্ডলে সমপরিমাণ কর প্রদান করিয়া থাকেন। মায়ন ফাল্গুন মাসের একাদশ দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাসের একাদশ দিবস পর্য্যন্ত সমষ্টি ঊনষষ্টি দিন মাত্র প্রোক্ত ঋতুর ভোগ। এই ঊনষষ্টি দিবসীয় দৈনিক ক্রমবৃদ্ধিপল সকল যোগ করিলে তিন দশ বিংশতি পল মাত্র অধিক হইবে। অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের একাদশ দিবসীয় আটশ দশ পঁচিশ পল হইতে বৃদ্ধি হইয়া বৈশাখ মাসের একাদশ দিবসীয় একত্রিশ দশ পঁয়তাল্লিশ পল দিবসানে ঊনষষ্টি দিবসে ঋতুর পূর্ণ ভোগ হয়।

অচিন্ত্যবীৰ্য্য আদি পুরুষ বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির সাময়িক পরি-বর্তন দর্শনে কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সময়ে সময়ে স্বকীয় বা পরকীয় কল্পনা কুসুমের কাল্পনিক আশ্রাণে ঘোহিত হইয়া বসন্ত ঋতুকেই সৃষ্টির আদিকাল নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। এবং কবিসম্প্রদায়ও বাসস্তিক গুণ ও প্রকৃতি বর্ণনাবেশ ধারণে অসমর্থ

হইয়া আপন আপন রূচির অনুযায়ী বর্ণনা করিতে শত বা সহস্র বদনের ন্যায় বাগ্জাল বিস্তার করিয়া ভারতীয় মানব প্রকৃতির উদ্দীপনা সাধন করিতে ক্রটি করেন নাই। ফলকথা এই উভয় সম্প্রদায় কি অপরাপর সাধারণ সকল মনুষ্য বসন্ত ঋতুর ভাব মনে করিলেই একটি নূতন আনন্দরসে আত্মাবিত হয় ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি ? যখন দেখা যায় সকল ঋতুতেই কোননা কোন উদ্ভিদ নূতন পল্লব কি ক্ষুদ্রশাখা বা ফল পুষ্পাদি দ্বারা সুসমা বিস্তার করিতেছে এবং জাতিভেদে পশুরাও সকল ঋতুতেই শাবক বা অণ্ড প্রসব করিতেছে এইরূপ প্রত্যক্ষ দৃশ্য বিদ্যমানে, যে কারণে প্রস্ফাবিত ঋতুর এতাদিক গুণ গরিমা গানে উন্মত্তপ্রায় ভারতীয়কবিগণ মানসিক বেগ নিরন্তর নিমিত্তে বহুতর আয়াম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে পাঠক সমীপে প্রত্যেকের কারণ সহ উপহার প্রদান করিতেছি।

বসন্ত ঋতুর লক্ষণ এবং উপপত্তি ।

আচার্য্য সূক্তত বলিয়াছেন ।

দিশো বসন্তে বিগলাঃ কাননৈরূপশোভিতাঃ

কিংশুকশ্চোজ-বকুল-চুত্ৰাশোকাদি-পুষ্পিতৈঃ ।

কোকিলাষট্পদগণৈরূপনীতা মনোহরাঃ

দক্ষিণানিলসংবৃত্তাঃ সুমুখাঃ পল্ললোজ্জ্বলাঃ ।

সূত্রস্থান ।

বসন্তঋতুর উপস্থিতে দিকসকল মেঘ এবং কুব্জবাটিকা বিরহিত হইয়া নির্মল দর্শন হয়, এবং বনজ এবং গ্রাম্য তরু ও লতা সকল নবীন পল্লবাদি দ্বারা সুন্দর শ্রীগম্পন্ন এবং কিংশুক, জলপদ্ম, বকুল, আম্র এবং অশোক প্রভৃতি উদ্ভিদ জাতীয়েরা পুষ্পিত হইয়া মনোহর মূর্তি ধারণ করিলে, দিকসকল আরও সুশোভিত হয়। কোকিল

প্রাচীণ পক্ষীগণের ও মধুপানোন্মত্ত মধুপগণের নানা প্রকার প্রাচীণ-মধুর ও মনোহারী অরসংযোগে জগৎপাতার কুশলগীতি দ্বারা দিক সকল প্রুতিধ্বনিত হইতে থাকে । দক্ষিণদিকস্থ মলয়াচলসংস্পর্শী মন্দ গতি বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রাক্ষুটিত কুম্ভম সুরভি দ্বারা দিক সকলকে আমোদিত করে । চতুর্দিকস্থ পল্লব সকল স্নমুখ নামা শাকোদ্ভূত দ্বারা সুন্দর শ্যামল মূর্তি ধারণ করে ।

আমরা সূক্ষ্মতাচার্যের প্রণীত লক্ষণটির উপপত্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাকৃতিক ঘটনার আদি অন্ত অনুসন্ধান করিলে অনেককেই ভ্রমে পতিত হইতে হয় । এই বিবেচনায় আচার্য্য চতুরতা করিয়া শাস্ত্রাস্তরের ব্যবস্থা সকল পরিত্যাগ পূর্বক কেবল দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ লক্ষণটি লিখিয়া স্বতুর পরিচয় করিয়াছেন । অতএব ঐ লক্ষণটিকে শাস্ত্রাস্তরের যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা গৌমাংসিত করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব ।

পূর্বের বলিয়াছি যে জল বায়ু এবং তেজঃ এই ত্রিবিধ পদার্থই মণ্ডবিধ ঋতু বিভাগের মুখ্য কারণ । আচার্য্য সূক্ষ্মতও বলিয়াছেন “শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্বানীং বিবস্মান শোযয়ত্যপি” ইত্যাদি লিখিত প্রমাণে শীতাংশু শব্দের অর্থ চন্দ্র হইলেও এই চন্দ্র শব্দ জলবাচক বলিতে হইবে । কারণ জল, অগ্নি, বায়ু ইহারাই ঋতুবিভাজক । অর্থাৎ এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে কখনও সূর্য্যবল প্রধান, কখনও চন্দ্রবল (জল) প্রধান, কখনও বায়ুবল প্রধান, ক্রিয়া প্রকাশ হইতেছে, অথবা কখনও এই ত্রিবিধ পদার্থের সমতায় কার্য্য হইতেছে । প্রস্তাবিত বসন্ত ঋতুকে পূর্বোক্ত ত্রিবিধের ক্রিয়ানাম্যজ্ঞাপক বলিলে, বোধ হয় পাঠকগণ অসম্বৃত্ত না হইতে পারেন, কেননা ফাল্গুন মাসের একাদশ দিবসীয় দিবামান আঠাশ দণ্ড পঁচিশ পল হইতে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাসের একাদশ দিবসীয় একত্রিশ দণ্ড পঁয়তাল্লিশ পল পর্য্যন্ত এই ঋতু ভোগের কাল ; অতএব মনে করি-

বেন সাড়ে আঠাশ হইতে পোঁনে বত্রিশ পর্য্যন্ত তুল্য সময় নির্দ্ধারিত থাকিলে ঋতুর মধ্যসময়টি দিব্যাত্রির মান বিশ কি ত্রিশ পল ইতর বিশেষ থাকিলেও প্রায় সমতাই বোধ করাইবে । * এইক্ষণ পাঠক দেখিবেন প্রকৃতির কি অনির্কচনীয় আশ্চর্য্য কোশল । পরস্পর বিরোধী প্রচণ্ডবীৰ্য্যবান পদার্থত্রয় যে কোন সময়ে সাম্যমূর্তি ধারণ পূৰ্ব্বক সমভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে, ঐ সময়টি যে হৃদয়বান শ্রেষ্ঠ জীবের অতুল আনন্দ ভোগের নিদান রূপে প্রতীয়মান হইবে তাহা আর লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র । অতএবই পৌরাণিক আচার্য্যগণ এই ঋতুকে সৃষ্টির প্রথম কাল এবং কবিগণ “ঋতুরাজ” “সুখঋতু” “কামগথা” প্রভৃতি নাম দ্বারা পীয় পীয় রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ।

পূৰ্বে বলা হইয়াছে এই ঋতু আদান কালের মধ্যবর্তী, দিব্যাকরের মন্দগতি বাঞ্জক । বিসর্গকালের অস্তিম হিমঋতু অপেক্ষায় এই ঋতুতে সূর্য্যের স্থায়িকাল পাঁচ দণ্ড পনের পল অধিক, সূর্য্যদেব মকরাস্তরত পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ক্রমে ভূমণ্ডলের মধ্যস্থ গ্রীষ্ম মণ্ডলের মধ্যবর্তী হওয়াই এই প্রকার অধিককাল স্থায়িত্বের কারণ ; কেননা পরস্পর আকর্ষিত গোল পদার্থদ্বয়ে কেন্দ্র সম্মিলনের অব্যবহিত পূৰ্বে এবং পরে কিছুকালের নিমিত্তে উভয় পদার্থেরই গতির ন্যূনতা হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ । অতএবই এই ঋতুতে সূর্য্যদেব মন্দগতি অবলম্বন পূৰ্ব্বক ক্রমে ভারতক্ষেত্রের অভিমুখে আগমন করিয়া শিশির ঋতুর প্রথম হইতে বসন্ত ঋতু পর্য্যন্ত সমষ্টি পাঁচ দণ্ড পনের পল ভোগে আদানিক বাসস্তিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করেন ।

পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার মন্দগতি ও স্থায়িত্বের আধিক্য হেতু শিশির অপেক্ষায় ভারতক্ষেত্র কি তৎসমস্থান সকল ক্রমে যে পরিমাণ উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তদেবশস্য সূক্ষ্ম জলরাশিও তদনুরূপ উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত লঘুভাব ধারণ করে এবং মন্দগতি দক্ষিণ

বায়ুর আঘাতে উল্লগাত আশ্রয় করিলে দিক্‌মকল শাস্ত্র ও নির্মল-
কাঙ্ক্ষা বিকাশ পূর্বক লোকের মনোহর দর্শন হয়।

এই সময়ে দিবাকর ক্রমে দক্ষিণ গোলাক্ৰি পরিত্যাগে মুখ
হওয়ায় তৎসহচর শীতঋতুর উত্তরধারাবাহী বায়ুর ধারা পরিবর্ত
হইয়া দক্ষিণদিকস্থ মলয়াচল সংস্পর্শী বায়ু বহন হইতে থাকে। কিন্তু
এই বায়ু দক্ষিণগোলে যে পরিমাণ বেগে বহন হয় উত্তর গোলে
তদপেক্ষ অধিকাংশ বেগের ন্যূনতা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শীতঋতুর
বলবান ঔত্তরিক ধারাকে বনপূর্বক বিপরীত দিকে চালিত করিতে
করিতে নিজের বল হ্রাস হইলে উত্তর গোলে (ভারত প্রভৃতি
স্থানে) মন্দগতি আশ্রয় করে। এই মন্দগতি বায়ু প্রাণিমান্বয়ের
সুখস্পর্শ জনক এবং দূরস্থ ও সমীপস্থ কানন সমূহের প্রস্ফুটিত
কুসুমনিকরের সুরভি বিস্তারক।

অপিচ যদিও আদান কালিক সূর্যের তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত শিশির
ঋতু অপেক্ষায় বায়ু অধিক রুদ্ধ হয় বটে, তথাপি নানাবিধ সুকুমার
সুগন্ধ কুসুমালিঙ্গিত এবং নবীন লতাপল্লবাদি সংস্পর্শী হওয়ায়
রুদ্ধতার অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু কার্যতঃ তাহার
রুদ্ধত্বের অপলাপ সুদূর পরাহত মনে করিতে হইবে। পরন্তু
দিবাকরের মাধ্যমিক তীক্ষ্ণতা হেতু প্রাণিগণ দিবাভাগে অল্পমাত্র
উষানুভব করে, কিন্তু দিবাবসানে নির্মল অথচ শীতল চন্দ্রকিরণ
সংস্পর্শী মন্দগতি বায়ুর কোমলালিঙ্গনে রুদ্ধমস্তাপ জনিত ব্যথার
আর অনুভব করিতে পারে না।

আয়ুর্বেদে শারীর-তত্ত্ব ।

নরদেহের অস্থিসংখ্যা—দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

আচার্য্য স্বষ্কৃত নীচের লিখিত সংস্কৃত বাক্যের দ্বারা মানব-
দেহের অস্থিসংখ্যা উপদেশ করিয়াছেন ।

“একৈকম্যাস্তু পাদাস্থূল্যাং ত্রীণি, ত্রীণি তানি পঞ্চদশ ।
তল-কূর্চ গুল্ফ-সংশ্রিতানি দশ । পাশ্চাত্যমেকম্ । জঙ্ঘায়াং
দ্বৈ । জাহ্নুন্যেকম্ । একমুরৌ । ইতি ত্রিংশৎ । এবমেক-
স্মিন্ সন্ধি ভবন্তি । এতেনেতরসন্ধিষাং চ ব্যাখ্যাতৌ ।
শ্রোণ্যাং পঞ্চ । তেষাং গুদ-ভগ-নিতম্বেষু চত্বারি ত্রিকসংশ্রিত-
মেকম্ । পাশ্বে ষট্‌ত্রিংশৎ । এবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েহপ্যেবম্ ।
পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ । অষ্টাবুরসি । দ্বৈ অঙ্গকসংজ্ঞে । গ্রীবায়াং
নবকম্ । কণ্ঠনাল্যাং চত্বারি । দ্বৈ হন্বোঃ । দন্তা দ্বাত্রিংশৎ ।
নাসায়াং ত্রীণি । একং তালুনি । গণ্ড-কর্ণ-শাশ্বেষ্চৈকম্ । ষট্
শিরসি ।,

অন্য টীকা ।—একস্মিন্ পাদেহস্থূল্যাঃ পঞ্চ । তত্রৈকম্যাস্থূল্যাং ত্রীণি
ত্রীণি পর্কাস্থীনি বিদ্যন্তে । তানি পর্কাস্থীনি গুণিতেন পঞ্চত্রিকেন
পঞ্চদশ ভবন্তীতি শেষঃ । তলং পাদতলম্ । কূর্চমস্থূল্যস্থূলিমধ্যস্যোপরিভাগঃ ।
গুল্ফঃ পাদগ্রন্থিঃ । এতেষু স্থানেষু সংশ্রিতানি সমাক্ষথাবিভাগে স্থিতান্য-
স্থীনি দশ । বিভাগশ্চ—পঞ্চাঙ্গুলিগুল্ফভূতানি শলাকাকারাণ্যস্থীনি পঞ্চ, তল-
প্রবন্ধনমেকং, কূর্চে দ্বৈ, গুল্ফে দ্বৈ ইতি বচনান্তরৈকবাক্যভয়া মভ্যতে ।
পাদস্য পশ্চাত্তাগঃ পাশ্চিস্তত্রৈকম্ । অন্যৎ পৃষ্ঠম্ । সন্ধিষাং সন্ধিপৰ্য্যন্তায়াম-
মধ্যশাখায়াম্ । এতেনেতি—যথা একস্যামধ্যশাখায়াং তথাহপরস্যামপীত্যর্থঃ ।
বাং চ ব্যাখ্যাতাবিতি বাহুদয়েহপি তথা বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ । এবং উক্তাধঃ-

শাখায়াং চিত্রশাচ্চতুর্থেণ যবিরশাম ৮শতমস্থায় (১২০) ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। শাখায়াং
 পঞ্চ ইত্যগ্য বিবরাং ওদেত্যাদি । ত্রি চং মেত্রাদ ওয়াগো ভাগকপমস্থিৎ ওং ওদ-
 গস্থরসোথুনিবর্ত্তে । পার্শ্বযট্‌ত্রিংশদেবমেতন্নিহ্ন দ্বিতীয়েহপ্যেবমিত্তানেন
 পার্শ্বকানাং দ্বিসপ্ততিতমুৎতম্ । তচ্চাশ্বিন্দুশ্বালকমংজকৈঃ এবন্ধনাস্থিভি-
 স্তদুপাস্থিভিঃ সহিতং ভবতি । তদাহ চরকঃ “দ্বয়োদ্যোয়াঃ পার্শ্বযো-
 শ্চতুর্বিংশতিশ্চতুর্বিংশতিঃ পঞ্চবাস্থীনি (পার্শ্বকাস্থীনি) তাবন্তি চৈবাং শ্বাল-
 কান্যর্কদাকাবাগি চ । তানি চ দ্বিসপ্ততিঃ ।” অত্র—তাবন্তি চ চতুর্বিংশতি-
 রেষ । বিষ্ণুরূপোবসাহ “অর্কদৈঃ শ্বালকৈশ্চ মার্কৈঃ দ্বাসপ্ততিঃ পার্শ্বকাঃ ।”
 যাজ্ঞবল্ক্যোহপাহ স্বগংহিতায়াং “পার্শ্বকাঃ শ্বালকৈঃ মার্কৈর্মার্কদৈশ্চ
 দ্বিসপ্ততিঃ ।” ইতি । পৃষ্ঠবংশে যৎ পার্শ্বকাস্থিমংযোগস্থানস্তদর্কদং বক্ষসি
 যৎ পার্শ্বকাস্থিসন্ধিস্থানং তৎ শ্বালকমিতি ভেদঃ । এবঞ্চ পার্শ্বকাস্থাবৎ
 দ্বাদশ এব তদুপস্থীনি চ দ্বাদশ তদর্কদা শ্বালকাস্চ দ্বাদশ ইত্যেকম্নিহ্ন
 পার্শ্বে যট্‌ত্রিংশৎ তথা অন্যস্থিন্নপি যট্‌ত্রিংশৎ মিলিত্বা । দ্বিসপ্ততিরেব
 পার্শ্বকাঃ (৭২) । পৃষ্ঠ পৃষ্ঠবংশে কশোৰ্কাস্থীনি । যদাহ ভোজঃ
 “পৃষ্ঠাশ্বনি কশোকঃ স্যাংস্তে চতুর্বিংশতির্মতাঃ । যট্‌ চ তেষু নিবধ্যস্তে
 ততস্তিঃশ্রুদিত্তি স্মৃতাঃ” । উগ্রসি বক্ষসি । বক্ষসি পার্শ্বকাস্থালশ্বনীভূতমেক
 মস্থান্তি তচ্চাশ্বিন্দুকেন নিষ্পাদ্যত ইতি তয়া যট্‌তম্ । কণ্ঠনিম্নে চ দ্বয়-
 মিত্যর্চ্যে । ভুজাংশয়োঃ সন্ধিরক্ষকং তদাশ্রিতে বে অংশকীলকে । গ্রীবা—
 কক্ষরা । সা চ নবাস্থিমতীতার্থঃ । কণ্ঠনাল্যাং গলনাল্যাম্ । হস্তচিবুকং
 তদ্রূপি বে । নাসাপার্শ্বাস্থিদ্বয়ং নাসানিগ্রাস্থিচৈকমিতি নাসায়াং ত্রীণি ।
 তালুনি জিহ্বামূলে । গণ্ডো চ কর্ণো চ শল্যোচেতি বিণ্যেহ—গণ্ডমোর্ধ্ব,
 কর্ণয়ো ধ্ব, শল্যযোরপি ধ্ব । কপোলাক্ষয়োর্মধ্যাদেশোগণ্ডঃ । তথা ক্র-
 কণ্ঠয়োর্মধ্যাদেশঃ শংখঃ । কপালাশ্চিহ্নচতুষ্ঠয়মক্ষিকোটরদ্বয়কোতি শিরসঃ
 সম্বন্ধীনাশ্বীনি যট্‌ । এবঞ্চ মর্কৈকেয়ন ত্রীণ্যেব শতানাস্থীনি ভবন্তীতি
 শল্যতজ্জগতম্ । এবঞ্চোৎকমলকরণং ভবন্তি ।

অঙ্গুলীমাবভা উর্ধ্বজাযামধঃ শাখায়াং যষ্টিঃ ... (৬০)

শ্রোণীগতানি পঞ্চ ... (৫)

পার্শ্বোভয়গতানি দ্বাসপ্ততিঃ ... (৭২)

পৃষ্ঠবংশস্থিতানি ত্রিংশৎ	...	...	...	(৩০)
বক্ষঃ সম্বন্ধীন্যষ্টৌ	...	...	...	(৮)
অক্ষকাম্ব্রিতে দ্বৈ	...	...	...	(২)
গ্রীবা সম্বন্ধীনি নব	...	...	...	(৯)
কণ্ঠসম্বন্ধীনি চত্বাবি	...	...	...	(৪)
বাহুনামকোর্দ্ধশাখায়াং যষ্টিঃ	...	...	...	(৬০)
হৃদস্থিষয়ং	...	...	...	(২)
দস্তা দ্বাত্রিংশৎ	...	...	...	(৩২)
নাসায়াং ত্রীণি	...	...	...	(৩)
তাম্রশ্চ্যকম্	...	...	...	(১)
গণ্ডাস্থিষয়ং	...	...	...	(২)
কর্ণাস্থিযুগলম্	...	...	...	(২)
শঙ্খাস্থিষয়ম্	...	...	...	(২)
শিরসঃ সম্বন্ধীনি ষট্	...	...	...	(৬)

পদাঙ্গুলির অস্থি ১৫৭।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিন খানি করিয়া পর্কাস্থি আছে । এই পর্কাস্থির ইংরাজী নাম ফেলেঞ্জস্ (Phalangos,) যদিও বুদ্ধাঙ্গুলীতে দুইটি মাত্র পর্কাস্থি দেখা যায় সত্য, তথাপি উহার প্রথম পর্কমূলে কাহার কাহার অপর এক খানি ক্ষুদ্রাস্থি উপর হইতে দেখা যায় । ইংরাজ ডাক্তারেরা এই অনিশ্চিতাবস্থিতি অস্থি খণ্ডকে সিসেসমুরেড Sesamaured নামে উল্লেখ করেন । স্ক্রুতমুনি তাহাকেও অঙ্গুলাঙ্গিমধ্যে গণ্য করায় পঞ্চদশ (১৫) সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে ।

পদতলের অস্থি ১১৮

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিমূলে এক এক খানি দীর্ঘাকার অস্থি আছে, ইহাদের সংস্কৃত নাম শলাকাস্থি এবং ইংরাজী নাম মেটেটার্সাল (Metatarsol), ইহাদেরই দ্বারা পদতল নির্মিত হইয়াছে । এই

শলাকাস্থি সমূহের বন্ধনযোগ্য এক খণ্ড অস্থি জঙ্ঘা ও পদতলের সংযোগস্থানে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং কূর্চ ও গুল্ফদ্বয়ে অপর ৪ খানি অস্থি বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন পার্শ্বিক্তে অর্থাৎ পদ-পশ্চাচ্চাগে অপর এক খণ্ড অস্থি আছে।

জঙ্ঘাস্থি ২ ।

পদের উপরে জাহ্নু পর্য্যন্ত লম্বা ২ খণ্ড অস্থি আছে। এই দুই খণ্ড অস্থির ইংরাজী নাম টিবিয়া ও ফিবিউলা (Fibula) ।

জাহ্নুস্থি ১ ।

যে স্থানটিতে জঙ্ঘার সহিত উরুত্তের সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানটির নাম জাহ্নু। ইহার বাদালা নাম হাঁটু। এই হাঁটুতে এক খণ্ড খপরাকার অস্থি স্থাপিত আছে। ইহার ইংরাজী নাম পেটেল (Patella) ।

উরুস্থি ১ ।

হাঁটুর উপরিভাগের নাম উরু। এই উরু এক খণ্ড দীর্ঘাশ্চর্য দ্বারা নির্মিত।

এইরূপে অঙ্গুলি হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদে ৩০ খানি করিয়া অস্থি থাকায় পদদ্বয়ের অস্থি সংখ্যা ৬০ হইয়াছে। এইরূপ হস্তাঙ্গুলি হইতে বাহুমূল পর্য্যন্ত প্রত্যেক হস্তে ৩০ খানি করিয়া অস্থি থাকায় হস্তদ্বয়েও ৬০ খানি অস্থি থাকা নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, সমুদায় একত্রিত করিয়া ১২০ খানি শাখাস্থি থাকা উপদিষ্ট হইল।

শ্রোণীর অস্থি ৫ ।

কটীর নীচে শ্রোণিকাস্থি ৫। উরুদ্বয়ের সমুদায় উপরি ভাগটা শ্রোণিকাস্থির দ্বারা নির্মিত এবং বস্তিকোটরও ঐ শ্রোণিকাস্থির দ্বারা সম্পাদিত। শ্রোণিকাস্থির যথার্থ সংখ্যা ৫। তন্মধ্যে নিতম্ব দ্বয়ে ২, মলদ্বারে ১, মূত্রনিষ্কাশ স্থানে ১ এবং মলদ্বারের উপরে ১। আধুনিক ডাক্তারেরা মলদ্বারের অস্থিখানিকে পৃথক বলিয়া গণ্য

করেন না, উহাকে মেরুদণ্ডের সমাপ্তিস্থান-বক্ষক উপাস্থি বলিয়া বিবেচনা করেন; সুতরাং তাঁহারা বলিয়াছেন যে, “বস্তিকোটের চারি খানি অস্থির দ্বারা নির্মিত” । তাঁহাদের মতে পার্শ্বদ্বয়ে ২ অর্থাৎ দুই পার্শ্বে অস্‌ইনুগিনেটে (Os Inminata) তাহার পশ্চাত্তাগে কক্সিস্ (Coccy) ও সেক্রাম (Sacram) এতদ্বিন্ন তাঁহাদের অন্য এই এক কথা আছে যে, পদ ও দেহসম্মিলক অস্থি যৌবনে এক হইয়া যায় । ইহাতে আমরা এই বলিতে পারি যে, যায় যাউক, গণনা করিতে হইলে পৃথক গণনা করাই ভাল ।

পার্শ্বক বা পঞ্জরাস্থি ৭২ ।

দেহপিণ্ডের অর্থাৎ ধড়ের ও বক্ষঃ কোটরের নির্মাণ এইরূপে হইয়াছে । যথা—পশ্চাতে পৃষ্ঠকশেরুকা, দুই পার্শ্বে পার্শ্বকাস্থি বা পঞ্জরাস্থি, সম্মুখে বুকাস্থি । পার্শ্বদ্বয়ের পার্শ্বকাস্থির গণনা প্রধান কল্পে ২৪ খানির অধিক হয় না বটে, কিন্তু তাহার উপাস্থি ২৪ ও স্থালাকারুদ ২৪,—এ গুলি গণনামধ্যে আনিলে অবশ্যই ৭২ সংখ্যা লব্ধ হইবে । পৃষ্ঠকশেরুকায় গাত্রের পার্শ্বকাস্থি সকল বসান আছে এবং বুকাস্থিগাত্রেরও তাহার যোড় আছে । অপিচ, সেই সেই সন্ধিস্থান গুলি দেখিতে স্থালকাকার ও অর্কুদাকার, (অর্কুদ—আব) । পৃষ্ঠকশেরুকায় অর্কুদাকার এবং বক্ষঃস্থ পঞ্জরদণ্ডগাত্রের স্থালকাকার । এই জন্যই সে সকল সন্ধ্যস্থি আকারানুযায়ী পৃথক্‌নামে গণ্য হওয়াতে গণনায় সংখ্যাধিক্য হইয়াছে । প্রধান পঞ্জরাস্থির সংখ্যা ২৪ হইলেও কাহার কাহার পঞ্জরে উক্ত সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হইয়া থাকে । অর্থাৎ কখন কখন কাহার কাহার ২১ খানি অস্থি কম থাকা দৃষ্ট হয়, কখন বা কাহার ২১ খানি অধিক থাকাও দৃষ্ট হয় । কম হইলে লোকে তাদৃশ ব্যক্তিকে উনপাঁজড়ে বলে ।

পৃষ্ঠাঙ্খি ৩০ ।

পৃষ্ঠাঙ্খির প্রত্যেক খণ্ডের নাম কশেরু । কশেরু সকল পর-
স্পা। এণিত হইয়া মেরুদণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে । কশেরুগণের
প্রকৃত সংখ্যা ২৪ এবং মধ্যস্থলবর্তী কশেরু সকল উল্লিখিত সংযুক্ত
খাঁকায় তদুপরি আবণ্ড ছয় সংখ্যা গণিত হয় । এইরূপে পৃষ্ঠাঙ্খির
সংখ্যা গণনা ৩০ হইয়াছে ।

বক্ষাঙ্খি ৮ ।

বক্ষের মধ্যস্থলে এক খানি অঙ্খি আছে; তাহা তিন ভাগে
বিভক্ত হইলেও ছয় খানি অঙ্খির দ্বারা নির্মিত হওয়ায় ছয় সংখ্যা
গণনা করা হয় এবং কঠমোজক দুই খণ্ড অঙ্খিকেও বক্ষাঙ্খিমধ্যে
গণিয়া ৮ সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে ।

অক্ষকাঙ্খি ২ ।

বাহুদ্বয়েন কীলকাঙ্খি দ্বয়কে অক্ষকাঙ্খি বলে, সুতরাং তাহার
সংখ্যা ২ ।

গ্রীবাঙ্খি ৯ ।

যাহার উপর যন্তক স্থাপিত তাহার নাম গ্রীবা । গ্রীবাদেশে
কশেরুকার অঙ্খি ৭ এবং পশ্চাদ্বিগের ভুজবন্ধন অঙ্খি ২ । এইরূপে
গ্রীবাঙ্খি সকল ৯ সংখ্যায় গণিত হইয়াছে ।

কণ্ঠাঙ্খি ৪ ।

কণ্ঠাঙ্খি অর্থাৎ গলনালীস্থ অঙ্খি । মনুমোর গলনালীটি ৪ খানি
অঙ্খির দ্বারা নিষ্কাশিত হইয়াছে ।

হৃদাঙ্খি ২ ।

চিবুক বা দাড়ি হৃদাঙ্খির দ্বারা নির্মিত । তাহার সংখ্যা ২ ।

দন্ত ৩২ ।

নাসাঙ্খি ৩ ।

দুই পাশ্বে ২ এবং নিম্নে ১ । সমুদায়ে ৩ । এই ৩ খানি অঙ্খি
সমবেত হইয়া “ধন” নামক নাসাঙ্খি নির্মিত হইয়াছে ।

তালুর অস্থি ১ ।

জিহ্বানূলের উপরিভাগে ১ খণ্ড অস্থি আছে, তাহার নাম তালুস্থি ।

গণ্ডাস্থি ২ ।

বর্ণাস্থি ২ ।

শঙ্খকাস্থি ২ ।

● মস্তকাস্থি ৬ ।

কপোল ও চক্ষু এই দুইয়ের মধ্য স্থানকে গণ্ড বলে এবং কর্ণ সমীপস্থ অস্থি বিশেষকে শঙ্খ বলে । ইহার ভাষা নাম রগ ।

মস্তক দুই ভাগে বিভক্ত । করোটিভাগ ও মুখভাগ । মুখভাগের অস্থিসমূহ পৃথক্ গণিত হইয়াছে ; সুতরাং "শিরসি ষট্" ইহার দ্বারা করোটি ভাগের কথাই বলা হইতেছে । করোটি ভাগে প্রধান কল্পে ৪ খানি অস্থি আছে । অল্পবয়সে কাহার কাহার করোটি ভাগে পৃথক্ ৬ খণ্ড অস্থি থাকে, যৌবনে তাহা পরিপুষ্ট ও সংশ্লিষ্ট হইয়া যায় ; তাহা দেখিয়া নব্য ডাক্তারগণ করোটির অস্থি ৪ খানি বলেন, পরন্তু শ্রদ্ধাশ্রম মুনি পূর্বপ্রকৃতি অনুসারে ঐ স্থানে ৬খানি অস্থি থাকা উপদেশ করেন । এইরূপে পুরুষদেহে সর্বসমেত ৩০০ অস্থি গণিত হইয়াছে । যাহারা নখ ও লিঙ্গক ও ক্ষুদ্র অস্থ্যংশ বিশেষকে গণনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে ৩৬০ সংখ্যা হওয়া অসম্ভব নহে । অস্থি গণনার এতদ্রূপ অবস্থা দেখিলে বুদ্ধিমান্ সাত্রেই বুঝিবেন যে, যাহারা ৩৬০ অস্থি বলিয়াছেন, তাহাদের কথাও সত্য, যাহারা ৩০০ বলিয়াছেন তাহাদের কথাও সত্য এবং নব্য ডাক্তারেরা যে কেহ ২০৪, কেহ ২০০, কেহ ২৯৪ অস্থি থাকা বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উক্ত প্রকার মতভেদ অযুক্ত বা অসঙ্গত নহে । যেহেতু তাঁহারা সকলে সকল স্থলের অস্থিকে ধর্তব্য বলিয়া গণ্য করেন নাই ।

আকার, স্থান ও কার্যকারিতা অনুসারে অস্থির নাম ।

ইন্দ্ৰাজ ডাক্তারেরা অস্থি সমুদায়কে চারি শ্রেণী করিয়া বিভক্ত করেন । যথা,—দীর্ঘ (long) খর্ষ (short) চ্যাপ্টা (Flat) ও অনিয়ত (Irregular) ; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতেরা উহাদিগকে পাঁচ শ্রেণী করিয়া উপদেশ করেন । প্রাচীনেরা বলেন যে,—

“বলয়ানি কপালানি ক্ৰচকাস্তরণানি চ ।

নলকানীতি তান্যাহঃ পঞ্চধাবীনি সুরয়ঃ ॥”

[শার্ঙ্গদেব ।]

প্রোক্ত সংখ্যক অস্থির মধ্যে বলয়, কপাল, ক্ৰচক, আস্তরণ ও নলক,—এই পাঁচ প্রকার বা পাঁচ শ্রেণীর অস্থি আছে ; ইহা পণ্ডিত গণ বলিয়া থাকেন । আচার্য্য সুশ্রুত ঠিক এইরূপ বলিয়াছেন । যথা :—

“এতানি পঞ্চবিধানি ভবন্তি । তদ্যথা—

কপাল-ক্ৰচকাস্তরণ-বলয়-নলক-সংজ্ঞানি ॥”

[সুশ্রুত ।]

সেই সকল অস্থি পাঁচ প্রকার আকার বিশিষ্ট ; তজ্জন্ত তাহারা পঞ্চমা বিভক্ত । যথা ;—কপাল, ক্ৰচক, আস্তরণ, বলয় ও নলক ।

কপাল—চ্যাপ্টা ও কিঞ্চিম্মূঙ্গ ।

ক্ৰচক—কেবল দন্তগুলির নাম ক্ৰচক (চিরুণীর আকার) ।

আস্তরণ বা তরুণ—(যেন পাতা আছে ।)

বলয়—গোলাকার প্রায় ।

নলক—লম্বা বা দীর্ঘ ।

এই পাঁচ প্রকার অস্থির স্থান অর্থাৎ কোন্ অঙ্গে কোন্ শ্রেণীর অস্থি আছে, সুশ্রুত মুনি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বাক্ত করিয়াছেন । যথা ;—

“তেষাং জাম্বু-নিতম্ব-গণ্ড-তালু-শঙ্খ-শিরঃসু কপালানি ।
দশনাস্ত্র কূচকানি । ভ্রাণ-কর্ণ-গ্রীবাঙ্কি-কোষেষাস্তুরণানি ।
পানি-পাদ-পৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি । শেযানি নলকমঞ্জরানি ।”*

জাম্বুতে, নিতম্বে, অংশ-কলকে, গণ্ডুগিতে, তালুদেশে, শঙ্খ
স্থানে ও মস্তকে কপালাস্থি সকল স্থাপিত আছে । দশতুলিকে
কূচক অস্থি বলা যায় । নামাতে, কর্ণস্থানে, গ্রীবাদেশে ও অঙ্কি-
কোষে তরুণ বা আস্তুরণাস্থি মন্নিবিষ্ট আছে । পানিমূলে, পদমূলে
পৃষ্ঠবংশে, বক্ষঃস্থ পঙ্কজদণ্ডে বলয়াস্থি সকল স্থাপিত আছে । অব-
শিষ্ট অঙ্গে গ্রায়ই নলকাস্থি থাকা দৃষ্ট হয় ।

শরীর নির্মাণের এমনি সুকৌশল যে, যেখানে যেরূপ অস্থি থাকা
আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ অস্থিই স্থাপিত বা উৎপন্ন হয় । শাখা-
গণের দ্বারা শরীরের ভারবহন ও গমনাগমনাদি নির্বাহিত হয়,
এজন্য তপায় দীর্ঘাস্থি সকল স্থাপিত হইয়াছে । যে যে স্থানে দৃঢ়তা
ও বলের আবশ্যক আছে, সেই সেই স্থানেই শর্কীরাস্থি সকল স্থাপিত-
হইয়াছে । যে যে স্থানে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের সংরক্ষণ ও পেশী
গণের ধারণ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, সেই সেই স্থানে তক্ষুপযুক্ত
চ্যাপ্টা অস্থি সকল বিন্যস্ত হইয়াছে । যে যে স্থানে গিত্রাকার্য্য
সম্পন্ন হইবে, সেই সেই স্থানে গিত্রাকার অস্থি বিদ্যমান আছে ।

* মূলে “শেযানি পাঠ আছে । ভোজরাজ “শেযানি” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । “দন্তপদাঙ্গুলিতলে কূর্কেষু মণিবন্ধয়োঃ । বাহুজ্ঞাঘ্রোঃ চাপি
জানীয়াত্তলকানি কু ॥” এই বচনটী ভোজরাজের “রাজসুগাক ” নামক
গ্রন্থে লিখিত আছে । “রাজসুগাক” গ্রন্থ খানি অতি বিস্তীর্ণ ও বিজ্ঞানবাদে
পরিপূর্ণ; সুতরাং ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট বৈদ্যক গ্রন্থ । হুঃখের বিষয় এই যে,
এই গ্রন্থ খানি একেই স্থাপনা নহে ।

অস্থির সন্ধি অর্থাৎ যোড় ।

উক্ত ত্রিণত অস্থি যথাযথ স্থানে সন্ধি ও হইয়া নরকক্ষাল নির্মাণ
কবে । শারীরবিদ্যাবিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে,
সমুদায় কক্ষালে সর্বসমেত ২১০ অস্থিসন্ধি অর্থাৎ অস্থির যোড়
আছে । যথা, —

“সংখ্যাতস্তু দশোত্তরে দ্বৈ শতে । তেষাং শাখাস্থ অষ্ট-
যষ্টিঃ । একোনযষ্টিঃ কোষ্ঠে । গ্রীবাং প্রত্যর্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ ।
একেকস্যং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্রয়ো দ্বাবঙ্গুষ্ঠে তে চতুর্দশ । জানু-
গুণ্ফ-বঙ্ফণেষ্টেককঃ । এবং মণ্ডদশৈকস্মিন্, সন্ধিবিন-
ভবন্তি । এতেনেতরসন্ধিবাঙ্গু চ ব্যাখ্যাতৌ । ত্রয়ঃ কটী-
কপালেষু । চতুর্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে । তাবন্ত এব পাশ্বয়োঃ ।
উরস্যষ্টৌ । তাবন্ত এব গ্রীবায়াম্ । ত্রয়ঃ কণ্ঠে । নাড়ীষু হৃদয়-
ক্লোম-নিবন্ধাস্থ অষ্টাদশ । দন্তপরিমাণা দন্তমূলেষু । একঃ
কাকলকে নামিযাঞ্চ । দ্বৌ বহ্নিগুণ্ফজৌ নেত্রাশ্রয়ো । গণ্ড-কর্ণ-
শাশ্বেষ্টেককঃ । দ্বৌ হনুসন্ধৌ । দ্বাবুপরিষ্টাদ্, ত্রয়োঃ শাখা-
য়োশ্চ । পঞ্চ শিরঃকপালেষু । একো মূর্ধ্ণি ।”

[সূত্রাত, শারীরস্থান ।]

অস্য টীকা ।—শাখাস্থ বাহুদ্বয়াদ্বয়েষু । কোষ্ঠে কোষ্ঠোপলক্ষিতপিণ্ডে
দেহমধ্যভাগ ইত্যর্থঃ । গ্রীবাং প্রত্যর্দ্ধমিতি—গ্রীবাগারভ্য মূর্ধ্ণপর্য্যন্তম্ । বিশি-
নষ্টি একেকস্যামিতি । অঙ্গুষ্ঠবর্জং প্রত্যঙ্গুলং সন্ধিত্রয়মস্তি অঙ্গুষ্ঠে তু দ্বৌ ।
অস্থিত্রিতয়াবিত্তেহপি দ্বৈ সন্ধী । যথা পাদাঙ্গুষ্ঠে সন্ধিদ্বয়ং তথা হস্তাঙ্গুষ্ঠেহপি ।
অঙ্গুষ্ঠমূলসন্ধৌ যণিবন্ধসন্ধৌ চ অচ্যয়োবস্তর্ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ । একেকস্মিন্মিতি
বীজাশ্রয়োগঃ । তেন জানুদ্বয়কঃ গুণ্ফে পাদদ্বয়দ্বয়কঃ বঙ্ফণে উরু-
দ্বয়কৌ চৈক ইতি লভ্যন্তে । এবং অনেন প্রকারেণ একস্মিন্বেব সন্ধিবিন-

একস্যাংমেব সন্ধুপলক্ষিতায়াং শাখায়াং সপ্তদশ এব সন্ধয়োগ্যন্তে । এতেন একসন্ধুপলক্ষিতেনাঙ্গেন ব্যাখ্যাতেন ব্যাহু চ ব্যাখ্যাতাবিত্তিত্যনেন ভুঙ্গ-
দ্বয়েহপি পাদদ্বয়সন্ধিসমসংখ্যকসন্ধয়োগ্যবর্ত্তন্ত ইত্যতিদিশ্যতে । এবং সপ্তদশ-
চতুষ্কণ শাখাসষ্টযষ্টিঃ সন্ধয়োভবন্তি । কটীকপালেযু শ্রোণীস্থকপালান্বিযু ।
উরসি বক্ষসি । এবং কটিমারভ্য গ্রীবাধঃপর্যন্তঃ কোষ্ঠোপলক্ষিতে মধাকায়ৈ-
হস্থিসন্ধীনামেকোনযষ্টিঃ সম্পূর্ণ্যতে । তাবন্ত এব অষ্টাবেব । কণ্ঠে গলনলকা-
স্থনি ত্রয়ঃ । নাড়ীযু কণ্ঠপাশ্চনাড়ীযু হৃদয়ক্লোমনিবন্ধায়ু অন্নপানবহাস্থ
নলকান্বিসংজ্ঞাস্থিতার্থঃ । কাকলকে গ্রীবাস্থোন্নতদেশে । যস্যাপবৎ নাগ
গলমণিযুটিকেতি চ । নাগায়ামপ্যেকঃ । বহ্নর্মণ্ডলয়োঃ কর্ণাঙ্গদেশস্থ-
স্তরণাস্থ্যোঃ । গণ্ডো চ কর্ণো চ নাড্যো চেতি বিগ্রহে বডেব সন্ধয়ো লভ্যন্তে ।
শাস্ত্রয়োশ্চেতি তয়োবপ্যপরিষ্টাৎ দ্বাবিত্তি সন্ধনীয়ম্ । এবং গ্রীবাং প্রত্যক্ষুঃ
ত্র্যশীতিঃ সন্ধয়ো ভবন্তি ।

ইহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিতে হইলে বিস্তৃত, বিবরণ বুঝাইতে
হইলে, অনেক কথা বলিতে হয় । অস্থিসংখ্যা বুঝাইতে যে পরিমাণ
বাক্যব্যয় আবশ্যক, অস্থিসন্ধি বুঝাইতে তদপেক্ষা অধিক কথা
বলা প্রয়োজন । আবশ্যক হইলেও আমরা প্রস্তাব বাছিয়া ভয়ে
বিস্তৃতানুবাদ ত্যাগ করিয়া স্নাকথায় উহার সংক্ষিপ্ত সর্ম্ম বুঝাইতে
ইচ্ছুক হইলাম ।

বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অন্য অঙ্গুলির প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া
ঘোড় বা সন্ধি আছে ; কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২ টি ঘোড় বা সন্ধি
আছে । * সূত্রাং অঙ্গুলস্থিত সন্ধি ১৪ । এক পদের ন্যায়

* “বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ২ সন্ধি” এই কথায় বুঝা গেল যে, সূত্রাত মুনিও
বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ২ খানি পর্কাস্থি থাকে, স্বীকার করিয়াছেন । তবে যে তিনি
“একৈকস্যাং ত্রীণি ত্রীণি” বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় পৃথক । অর্থাৎ
বৃদ্ধাঙ্গুলীতে পর্কাস্থি ২ এবং পর্কাস্থি সন্ধিস্থলে অনিশ্চিত উপাস্থি ১, এই
রূপ অর্থ গ্রহণ কর, করিলে সূত্রতোক্তিব আর স্বাক্যবিরোধ দোষ হইবে
না এবং প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় মিলিয়া যাইবে ।

অপর পদের অঙ্গুলাস্থিত সন্ধিও ১৪ । এবংক্রমে ন্যাখ্যা করিয়া
গেলে নিম্নলিখিত সন্ধিতালিকা প্রাপ্ত হইতে পারে ।

ব্রহ্মাঙ্গুলী ভিন্ন প্রত্যেক অঙ্গুলীতে ২টি করিয়া ১২ এবং ব্রহ্মা-
ঙ্গুলীতে ২ । সমুদায়ে—

জাম্বু, গুলফ ও কুচকি, প্রত্যেক স্থানে ১ টি করিয়া	৩৮
ঐ ১৭ সন্ধি এক পায়ে ; অপর পায়েও ঐরূপ	১৭
পায়ের ন্যায় হাতেও ১৭ টি করিয়া	৩৪
শ্রোণীদেশে	৩৮
পৃষ্ঠদেশে	২৪
পাশ্বর্ষ্যে (পাঁজড়ায়)	২৪
বক্ষঃস্থলে	৮
গ্রীবাদেশে	১০
কণ্ঠে	৩
অন্নপানবহা গলনালী দেশে	১৮
মস্তমূলসন্ধি	৩২
কাকলী অর্থাৎ গলান টুঁটিতে	১
নানাসন্ধি	২
নেত্রাঙ্গিসন্ধি	২
গণ্ডাঙ্গিসন্ধি	২
কর্ণাঙ্গিসন্ধি	২
শাঙ্গাঙ্গ্যে (রগে)	২
হনুসন্ধি (দুই দিকে)	২
জ ও রগের উপরে (দুই দিকে)	২
মস্তক কপালে	৫
মূর্ধদেশে	১

অস্থিসন্ধির প্রকারভেদ ।

সন্ধি সকল অর্থাৎ অস্থির সহিত অস্থির সংযোগ স্থান সকল দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । এক চল-সন্ধি, অপর অচল-সন্ধি । মহাজ্ঞানী সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, হস্তদ্বয়ের, পদদ্বয়ের, কটিদেশের, হনুদ্বয়ের ও গ্রীবাদেশের সন্ধি সকল সচল; অবশিষ্ট সন্ধি সকল অচল অর্থাৎ চেষ্টাশীল নহে । ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সুশ্রুত বাক্যে চেষ্টা শব্দ থাকায় আঘূর্ণাদি প্রচলন উক্ত স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে নাই; কিন্তু অন্যরূপ গতি প্রত্যেক সন্ধিতেই আছে । রস্তুতঃ মস্তকসন্ধি ব্যতীত আর প্রায় সমুদায় সন্ধিতেই কিছু না কিছু গতি বা চলনক্রিয়া হইয়া থাকে । সচল সন্ধিতে এক প্রকার কোমল ও পিচ্ছিল পদার্থ থাকে, প্রাচীন শারীরবিদ্যা-বিশারদগণ তাহাকে স্নেহাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন । সন্ধিস্থানে সেই পদার্থ থাকায় সন্ধিত অস্থি সকল স্ব স্ব চলন ক্রিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হয় ।

অস্থিসন্ধির আকার ভেদ ।

অস্থিগণের পরস্পর সংযোগ স্থান গুলি বিভিন্ন আকারে রচিত ও দৃশ্যমাণ হইলেও সর্বপ্রকার সন্ধিস্থানকে প্রধানতঃ আট ভাগে বিভক্ত ও আট নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে । যথা—

“কোরকাঃ প্রতরাঃ স্নমসেবনাঃ স্মারুলুখলাঃ ।

সামুকাঃ মণ্ডলাঃ শঙ্খাবর্তাঃ বায়নভুতিকাঃ ॥

ইত্যষ্টধা সমুদ্ভিষ্টাঃ মুনীন্দ্রে রস্থিসন্ধয়ঃ ॥” (শাঙ্কদেব ।

মুনীন্দ্র সুশ্রুতের নিম্নলিখিত উপদেশ অবলম্বন করিয়াই শাঙ্ক-দেব এই শ্লোকটী প্রস্তুত করিয়াছেন মনে হইতে পারে ।

“ত এতে সন্ধয়োঃ ষষ্ঠবিধাঃ ।” কোরোলুখল-সামুকা-প্রতর-স্নম-সেবনী-বায়নভুতিকা-মণ্ডল-শঙ্খাবর্তাঃ ।” [সুশ্রুত দেখ ।

১ কৈর অর্থাৎ গজাকার কিংবা কলিকাকার ।

২ উলুখল অর্থাৎ ওলুলক ওলীর আকৃতির তুল্যাকৃতি ।

৩ সামুদ্রা অর্থাৎ সম্পুটাকার । (যেমন ছিদ্র কলায়শস্যের যোড় হয়, সেইরূপ আকারের যোড়) ।

৪ প্রান্তর অর্থাৎ ভেলার মত । লোকে ২৩৪ টি কলা, গাছ একত্র সংযোগ করিয়া ভেলা প্রস্তুত করে, তাহার সন্ধি যেমন দৃষ্ট হয়, প্রান্তরসন্ধিও তদ্রূপ দৃষ্ট জানিবেন ।

৫ নুন্নসেবনী অর্থাৎ দেখিতে শোলাই করার মত ।

৬ বায়নতুণ্ড = কাক চঞ্চুব আকৃতি ।

৭ মণ্ডল = গোল ।

৮ শঙ্খাবর্ত = শঙ্খচন্দ্রের আকার (থাক থাক) ।

কোন স্থানে কিরূপ আকারের সন্ধি আবশ্যক হইয়াছে, সুশ্রুত মুনি তাহাও বলিয়াছেন । যথা ;—

অঙ্গুলী, মণিবন্ধ, গুলফ, জাম ও কনুই, এই সকল স্থানে “কৈর” সন্ধি ।

বগল, কুচকি, ও দস্তে “উলুখল” সন্ধি ।

শ্রক্ষে, মলদ্বারে, যোনিদেশে ও নিত্যস্থে “সামুদ্রা” সন্ধি ।

গ্রীবাণ ও পৃষ্ঠবংশে “প্রান্তর” সন্ধি ।

মস্তকে, কপালে ও শ্রোণীকপালে “নুন্নসেবনী” সন্ধি ।

হনুদ্বয়ে “বায়নতুণ্ড” সন্ধি ।

কণ্ঠ, হৃদয়, নেত্র ও ক্লামসংলগ্ন নাল-স্থানে “মণ্ডল” সন্ধি ।

কর্ণে ও শৃঙ্গাটক স্থানে “শঙ্খাবর্ত” সন্ধি ।

বর্ণিত প্রকার সন্ধি স্থানের আকার ওলি হৃদয়ঙ্গম করণপূর্বক বিবেচনা করিতে গেলে ইহাই স্থির হয় যে, কোথাও বা অস্থিগণের পরস্পর অব্যবহিত সংযোগ বা তাদাত্ম্য সন্ধি আছে, কোথাও বা

ব্যবহিত সংযোগ, কোথাও বা আংশিক সংযোগ বা মিশ্রসংযোগ মাত্র আছে। সন্ধির বা সংযোগের স্থানগুলির আকার দেখিলে উক্ত জাতি প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সংযোগের ভাবকার বা স্বভাব দেখিতে গেলে তিন প্রকারের অধিক প্রকার বলা যায় না। সেই জন্যই বোধ হয় নব্য পণ্ডিতেরা বলেন “সন্ধি প্রকারে সন্ধিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—Synarthrosis Diarthrosis এবং amphiarthrosis।”

অস্থি ও অস্থিসন্ধিদর্শনের উপায়।

প্রাচীন কালে নিম্নলিখিত প্রকারে অস্থির স্থান, আকার ও সন্ধি সকল পরিদৃষ্ট হইত।

“সমস্তগাত্রমবিশোপহত মদীর্ঘব্যাধিপীড়িত মবর্ষশতিকং নিঃশৃষ্টোক্তপুত্রীযং পুরুষং অবহন্ত্যামাপগায়ং নিবদ্ধং পঞ্জবস্থং মুণ্ড-বল্লল-কুশ-শগাদীনাগন্যতমেনাবেষ্টিতাম্ অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুচিতক্ষেপ্তত্যা ততো দেহং সপ্তরাত্রাৎ উশীৰ-বাল-নৈবু-বল্লল-কুটীনাগন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ময়ন্ ভগাদীনু সর্ঙ্গানেন বাহ্যভ্যন্তরাজপ্রত্যঙ্গনিশেয়ান্ যথোক্তান্ লক্ষ্যমুচ্চক্ষুযা।” [স্বস্ত্যত।]

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাবৎ আছে, কোনরূপ বিষের দ্বারা ব্যাহত হয় নাই, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া মরে নাই, শতবর্ষ বয়স, (এখনকার কালে ৫০ ধরিতে হইবে), পূর্ণ হয় নাই, এরূপ একটা মৃত দেহ আহরণ করিয়া তাহার উদরের অঙ্গ ও পুত্রীষ (নাড়ী ভূড়ি) বাহির করিয়া ফেলিবে। বহমানা নহে, অর্থাৎ শ্রোত না থাকে, এরূপ কোন এক নদীতে সেই শব পঞ্জরমধ্যে স্থাপিত করতঃ ডুবাইয়া রাখিবে। জলে ফেলিবার পূর্বে সেই শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মুক্ত

নাগক তুণের দ্বারা, কিংবা কুশের দ্বারা অথবা শবকনের দ্বারা (পাটের দ্বারা) বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ পূর্কোক্ত প্রকার নদী-জলে রাখিয়া পচাইবে । এইরূপ করিয়া পচানোর নাম “কোথন” । এই কার্য্যটি ছায়াযুক্ত জলে অর্থাৎ রৌদ্র তাপ না লাগে এরূপ নদীজলে রাখিয়া নির্বাহ করিবেক । যখন দেখিবে যে, তাহা সম্যক রূপে কুণ্ডিত হইয়াছে, পচিয়াছে, তখন, সাত দিন অতীত না হয় অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যে উক্ত শবকে ধীরে ধীরে উপরে তুলিবে । অনন্তর উলু তুণের কুচী (ব্রহ্ম) অথবা কাঁচা বাঁশের ছালের কুচী প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা শবগাত্র অঙ্গে অঙ্গে ও ধীরে ধীরে অবঘর্ষণ করিবে । এবম্প্রকার অবঘর্ষণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে ত্বক্, মাংস, মাংসপেশী, অস্থি, অস্থিসন্ধি প্রভৃতি যে কিছু বলা হইয়াছে সে সমস্তই প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারিবে । হে ক্ষত্রত ! শরীরাবস্থিত সমস্ত বস্তুই চক্ষুর্গম্য হয়, কেবল আত্মা কোনও কালে ও কোনও উপায়ে চক্ষুর্গম্য হন না ।

পূর্নকালে শবচ্ছেদ করিবার জন্য এইরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইত । এই প্রণালীই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান কালের ব্যবচ্ছেদ সিদান উৎপাদন করিয়াছে । হয় ত অনেকেই মনে করিবেন যে, এ প্রণালীতে শিরা প্রভৃতি জানা যায় না, কেবল অস্থি ও অস্থি সন্ধি জানা যাইতে পারে বটে, পরন্তু ইহা অন্য কিছু জানিবার সুন্দর উপায় নহে । কেন না, ৩৭ দিন জলে থাকায় শরীরের মাংসাদি সমুদায় পচিয়া জলের সহিত মিশিয়া যায় । এই অপত্তিত প্রকৃত প্রত্যুত্তর আমরা বারাস্তরে ব্যক্ত করিব ।

ক্রমশঃ

কালতত্ত্ব ।

ইতিপূর্বে বসন্ত ঋতুর রমণীয়তার কারণ এক প্রকার ব্যক্ত করা হইয়াছে । এইক্ষেণে নৃতনব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রানুযায়িনী যুক্তি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

আযুর্বেদাচার্যগণ বলিয়াছেন যে, বিসর্গকাল প্রাণিগাজের বলজনক, যথা,—“ভ্রোপচিহ্নবলাঃ প্রাণিনঃ সূ্যঃ সোমবলজ্ঞাৎ” বিসর্গকালে চন্দ্রের বল অধিক হয়, অতএব প্রাণিগাত্র ক্রমে বলবান হইতে থাকে । পুনরপি বলিয়াছেন, “আদানন্তে চ দৌর্ভাগ্যং বিসর্গা-দানয়ো নৃণাম্ । মধ্য মধ্যবলং তন্ত্রে শ্রেষ্ঠমন্ত্রে বিনির্দ্দেশেৎ ।” বিসর্গকালের আদি বর্ষা ঋতু এবং আদান কালের অন্ত গ্রীষ্মঋতু প্রাণি সাধারণের দুর্ভলতাজনক । উভয় কালের মধ্য শরৎ এবং বসন্ত ঋতু মধ্য-বল-কারক । বিসর্গকালের অন্ত এবং আদান কালের আদি হিমা ঋতু এবং শিশির ঋতু শ্রেষ্ঠ বহুজনক ।

আচার্য্যদ্বয় কেবল চন্দ্র বল এবং সূর্য্যবল, হেতু দর্শাইয়া তদনু-যায়ী রসের গুণকে বলব্যঞ্জক এবং বল নাশক বলিয়া অতিশয় সংক্ষেপোক্তি করিয়াছেন; কেন না পূর্বাচার্য্যগণের মত এই যে সকল শাস্ত্রের বিষয় এক শাস্ত্রে নিবেশ থাকিলে শাস্ত্রবাহুল্যদোষে নিবৃত্ত বিষয় জটিল ও বিস্তৃত হইয়া লোকের অভিগম্যের অসু-বিধা-জনক হইয়া পড়ে । অতএবই সংক্ষেপোক্তি দ্বারা গম্য পদমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন ।

আচার্য্য দ্বয়ের বচন দ্বয়ের যথার্থ অনুমান করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, বর্ষাকালীন অবিবল দ্বারা বর্ষা-সময় গ্রীষ্ম ঋতুর প্রায় সূর্য্য সমুপে তাপিত এবং শুষ্ক প্রাণিগাজের শরীরে অধিক পরিমাণে জল প্রবেশ করিয়া শরীরকে শুষ্কিত করিতে

থাকে, তদুপ ভারত ক্ষেত্রও নবীন ঘন রাশি দ্বারা আজ হইয়া
অবিশুদ্ধ তেজঃ সংস্পর্শে উৎকর্ষতার অপলাপে ক্লেদযুক্ত হয় ।
পুনশ্চ শারদীয় মধ্যস্থ সূর্য্যের সস্তাপে সংমিশ্র ভৌতিক পদার্থের
সুহিত পরিপাক হইয়া জীবসমূহের আসন্ন বলের কারণ রূপে পরি-
ণত হয় এবং তদাশ্রয়ীভূত। বসুন্ধরা ও উর্ধ্বর হইতে থাকে, এই
নিয়মে প্রাণি সামারণ ও ভারতবর্ষ ক্রমোন্নতির পথে পদার্পণ
করিয়া হিমশ্রুতে সম্পূর্ণ বীৰ্য্যবান হয় । এই বীৰ্য্যবত্বই বাগন্তিক
মৌল্যের কারণ । পাঠক দেখিবেন দেশভেদে প্রাণিগণের প্রকৃতি
এবং আকৃতির নৈমগ্য স্বতঃসিদ্ধ । ভারতীয় সামারণ প্রাণিগণ
যে নিয়মে এবং যে প্রকৃতিতে গঠিত, দেশান্তর জাত প্রাণী
তাহা হইতে অবশ্য পৃথক হইবে । ভারতবর্ষ যে সকল বন্য কি
গ্রাম্য পক্ষী ও উদ্ভিদের আশ্রয়, ইহারা অধিকাংশই বাগন্তিক ।
ইহার তাৎপর্য্য উদ্ভিদ প্রাণিগণই ভূমির উৎকর্ষতা দ্বারা উৎকর্ষ
লাভ করিয়া থাকে এবং ভূমির উৎকর্ষতাও জল, বায়ু, অগ্নি এই
ত্রিবিধের অধীন । পাঠক মনে করিবেন, যখন ভারত ভূমি শীত
ঋতুতে পূর্ণ বীৰ্য্য হইবে, তখন তদুজ্জাত উদ্ভিদ প্রাণীও ঐ সময়
হইতেই গর্ভ গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্ত হয় । ইহার প্রত্যক্ষ দর্শন, শীত
ঋতুতেই ভারতীয় উদ্ভিদ প্রাণিগণ অধিকাংশ নিষ্পত্র হইয়া পড়ে ।
এই নিষ্পত্রতার কারণ গর্ভ গ্রহণ (দ্বিতীয় পত্রাক্ষুরের আবির্ভাব)
পুরাতন পত্রের মূলদেশে যখন নূতন পত্রাক্ষুরের আঘাত প্রাপ্ত হয়
এবং নূতন গর্ভই মৌলিক রসাকর্ষণ করিতে থাকে, তখনই পুরাতনপত্র
গুলি শুষ্ক হইয়া আপনা আপনি খসিয়া পড়ে । পাঠক জ্ঞাত আছেন
যে, ছায়াতে কোন উদ্ভিদ ফলবান হইতে পারে না, কি হয় না ।
ইহার প্রকৃত কারণ বহিঃস্থ তাপের অভাব, যে সকল রক্ষ কি লতা
অথবা গুল্ম অধিক পরিমাণ তাপের সাহায্যে ফল পত্রাদির প্রসবিতা,
কখনও ছায়াতে তাহারা পত্র কি পুষ্প প্রসব করিতে সক্ষম হয় না ।

এই নিমিত্তে শৃঙ্খলিত জাতীয় উদ্ভিদগণ শীতঋতুতে মূল মাত্র সজীব থাকিয়া শাখা পত্রাদি রহিত হইয়া পড়ে । পুনরায় বসন্ত ঋতুে পুর্য্যাপ্ত হইলে এই মূল হইতেই লতা বিস্তৃত হইয়া মনোহর শ্রীসম্পন্ন হয় । ইহার প্রধান কারণ ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, এই প্রকার দেশে যে সময় জল, বায়ু, অগ্নি সমব্যবহার প্রত্যক্ষ হইবে, এই সময়ে স্থানের উৎকর্ষতা এবং তৎসহকৃত কষায় রস প্রধান কিসা তৎসমান গুণযুক্ত উদ্ভিদ জীবের উৎকর্ষতার প্রতিবন্ধক অসম্ভব ।

দ্বিতীয়, বসন্ত ঋতুতে আরাগ কাননাদির সুন্দর ও মনোহারি দৃশ্যের কারণ ;—

পূর্বেক্ত কারণকলাপের বশবর্তী ভারতীয় অধিকাংশ তরু-লতা, গুল্ম প্রভৃতি নবোদ্ভূত শাখা পত্রাদির সহিত কুসুমালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলে দক্ষিণদিকস্থ সর্গয়াচল নিবাসী সদাগতির মন্দগতি হেতু কোনও প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হয় না এবং মেঘ জলের অভাব ও অল্প পরিমাণে নীহার পতনে পুষ্পবসের সুস্বাদুতার স্থিরতা জানিয়া মধুপ শ্রেণীর মধুলোভোন্মত্ত গন্ধিকাগণ পুষ্পে পতিত হয় । অথচ পূর্বেক্ত বায়ুর মন্দগতি হেতু সুরভি আত্মাণের ও মধুকরগণের সুগন্ধর অক্ষুট গুণ গুণ শব্দ শ্রবণের কোনই প্রতিবন্ধক থাকে না এবং নবপল্লবের সহিত পুষ্পগুলি অতিশয় মনোহারী দৃশ্যে বিরাজ করে । সুতরাং শ্রেষ্ঠজীবভাবুক মনুষ্যগণের অপার আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে । নতুবা অপর ঋতুতেও এই সকল কার্য্য হয় বটে ; কিন্তু কোন সময়ে বায়ু, কোন সময়ে জল (বৃষ্টি) কোন সময়ে তাপের অতিতীব্র প্রতিবন্ধকতা হেতু ভারতীয় জনগণ এই প্রকারে সুখান্বাদনে বঞ্চিত হইয়া থাকে ।

বাসন্তিক বিধান ।

হেমন্তে নিচিত্তঃ শ্লেষ্মা দিনকৃত্তাভিরীরিতঃ ।

কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহুন্ ॥

তস্মাৎ বসন্তে কৰ্ম্মাণি বসনাদীনি কারয়েৎ ।

গুৰ্বন-স্নিগ্ধ-মধুরং দিবাস্বপ্নাধু বৰ্জয়েৎ ॥

বায়ামোদ্বৰ্ত্তনং ধূম-কবরগ্রহ মঞ্জুনং ।

সুখানুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুসুমগমে ॥

চন্দনোগুরুদিগ্ধাক্ষে যবগোধূমভোজনঃ ।

শারভং শামৈনৈয়ং মাংসং লাব-কপিঞ্জলং ।

ভক্ষয়েন্নিগদং মৌধুং পিবেন্মাক্ষীকমেববা ॥

চরক, — সূঃ ।

অমুবাদ ।—হেমন্ত কালের প্রবল শীতলতাদ্বারা সঞ্চিত বনীভূত শ্লেষ্মা বসন্তকালের মাদ্যমিক সূর্য্য সত্তাপে তারল্য অবলম্বন করে এবং স্রীষ আশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্য শরীরের সমস্ত অবয়বে বিক্ষিপ্ত হইয়া শ্লেষ্মাজাত ব্যাধির কারণ রূপে পবিণত হইলে বহুলা শ্লেষ্মা বোগের প্রাচুর্ভাব হয় । অতএব বসন্ত ঋতুতে বসন নিবেচন প্রভৃতি কক্ষ নাশক ক্রিয়া অবলম্ব্য করিবে । মাত্রা গুরু অথবা পলিপাকে গুরু (পাষ্ট্রাদি) আহার, স্নিগ্ধ (তৈল স্বতাদিন মাত্রাধিক), মধুভিন্ন মধুনবন (গুড়শর্করাদি), দিবানিজা, পরিত্যাগ করিবে ।

বায়াম [পরিশ্রম অথবা শাস্ত্রানুগোদিত ব্যায়াম (কুস্তি)] অতি অল্প মাত্রায় করিবে । অদগাহন স্নান এবং মার্জ্জন স্নান কক্ষ্মধূম এবং কবল অঞ্জন ব্যবহার করিবে ইমং উষা জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্নান এবং গৌচ ও হস্তপদাদি দৌত করিবে । অগুরু মন প্রভৃতি স্নিগ্ধ অমুলেপন বস্ত্রদ্বারা শরীর ওপলেপিও করিবে ,

যব গোমুগ প্রভৃতির অন্ন সারভ, শশ, ঐশেয় এই ত্রিবিধ হরিণ মাংসের যুগ্মের সহিত এবং মাংস (তিত্তিরি) কপিঞ্জল (পক্ষীনিগেয) মাংসের যুগ্মের সহিত ভক্ষণ করিবে । মদ্যপায়ী বক্তিগণ সৌধু এবং মাধ্বীক মদ্যপান করিবে । স্তম্ভাচার্য্যের মত যে বসন্ত কালে রমণীয় বনিতার সহিত বিবিধ বনরাজি বিনাজিত বন, উপবন ভ্রমণ করিবে এবং তৃতীয় দিবসে একবার কয়িয়া স্ত্রীসন্তোগ করিবে । কিন্তু ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস ব্যক্তি ব্যায়াম, উষ্ণ সেবা, পরিশ্রম এবং স্ত্রীসন্তোগ নিয়তই পরিত্যাগ করিবে ।

বাসস্তিক বিধানে আচার্য্যদ্বয় যে সকল বিধি এবং নিষেধ সূচক বচন প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিধেয কোন কারণ দর্শাইয়া উপসংহার করেন নাই অতএব তদনুগতভাবে যতদূর প্রকাশ করিতে বক্ষম ভদ্রিস্থাপিত নিম্নে প্রকাশ করিলাম ।

আচার্য্য হেমন্ত ঋতু উপলক্ষে বলিয়াছেন,—“তা এবৌষধয়ঃ কালপরিণামাং পরিণতবীর্যা বনবত্যাঃ” ইত্যাদি । “আপম্ভঃ প্রসঙ্গা অত্যর্থঃ গুরুশ্লিষ্কাঃ” তাউপযুক্ত্যমানাঃ “শ্লেহাং শৈত্যাং গৌরবাং শুষ্কিত দেহানাং শ্লেষ্মাঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি” ইত্যাদি ।

হেমন্তকালে ওষধি সকল (আহারীয় ধান্যাদি) পরিপক্ব হইয়া সংপূর্ণ বীর্য্যবন্ত হয় এবং বর্ষাকালের অপরিপক্ব জলরাশি শারদীয় প্রভাকরের প্রভায় পরিপক্ব হইয়া নির্মল এবং অত্যন্ত গুরু ও শ্লিষ্কগুণ বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ ভানুমান অধিকতর দূরবর্তী হওয়ায় মনুষ্য শরীর অত্যন্ত শুষ্কিত হইয়া পড়ে । সতরাং ঐ সকল নূতনায় ভক্ষণ এবং গুরু শীতল জলপান করিলে অবশ্যই শরীর শ্লিষ্ক গুরু এবং শীতল হইবে । শরীরের এতদূশ অবস্থাই যে কফ সঞ্চয়ের অব্যভিচারী কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই । পরন্তু ঐসময় সঞ্চয় হয় বটে, কিন্তু শীতের প্রাদুর্ভাবে হৈম জগেব ন্যায় যনতা প্রাপ্ত হওয়ায় কার্য্যকর হইতে পাবেনা, ।

পরে বসন্ত ঋতুন সাধামিক সূর্য্যসম্মুখে উত্তপ্ত এবং তরলতা প্রাপ্ত হইয়া জীব সমূহের আপাদ মস্তক ও অধিকাংশ উদ্ভিদ জাতির আমূল পর্য্যন্ত বিচরণ করে তদ্বারাই গনুয়া পশু ও পক্ষী প্রভৃতি জীবগণ শারীরিক চিক্ণতার সহিত ও উদ্ভিদ জাতীয়েরা নুতন পল্লবাদির সহিত সুন্দর স্রীধাবণ করে, অথচ শীতের কিঞ্চিৎ আভা থাকে সত্ত্বে ঘর্ম্মপ্রস্রাব নাহওয়ায় ঐ জলীয় কফই নানা প্রকার ব্যাধির জনক এবং শারীরিক কষ্টদায়ক হয় । অতএব আচার্য্যগণ সঞ্চিত কফের নিষ্কাশন করিতে বিধান করিয়াছেন, অর্থাৎ সঞ্চয়ের মধ্য-সময়ে যদি পারিমাণিক ন্যূনতা সম্পাদন করিতে পারা যায় তবে প্রকোপের সময়ে ততদূর বাধা জনক হইতে পারে না । ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে বক্তব্য ।

[ক্রমশঃ]

আয়ুর্বেদীয়-ধাতুবিদ্যা ।

ধাতুবিবরণ ।

সমাকৃপক আহারীয় রস হইতে ক্রমশঃ পরিপাকক্রিয়া দ্বারা জী, পুরুষ উভয় জাতীয় মনুষ্যের রস, রক্ত, মাংস মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র নামক সপ্তধাতু, এবং কেবল নারী জাতির “আর্ন্তব-শোণিত” নামক তদতিরিক্ত একপ্রকার ধাতু, সমুৎপন্ন ও পবিপুষ্ট হইয়া থাকে । (১)

উহা (আর্ন্তবশোণিত) সাধারণ রক্ত অপেক্ষা ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ, ও গন্ধ বিহীন । উপযুক্তকালে ঐ “আর্ন্তবশোণিত” বায়ুত্বক চালিত হইয়া গর্ভাশয়স্থ (জরায়ুকোষস্থ) দুইটি ধমনী দ্বারা যোনিমুখে নির্গত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ উহাকে “রজোদর্শন” বলা যায় ॥ (২)

সুস্থ শরীরে স্বভাবতঃ সাপ্তমিক কালান্তরে এক একবার রজঃ-স্রাব হইয়া তিনদিনস কিংবা পাঁচদিনস পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে । (৩)

(১) রসাদেবজ্জিয়ারক্তং রজঃসংজ্ঞং পবর্ততে ।

তদধ্বাদাদশাদূর্জং যতিপকাশতঃকয়ং ॥

রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্নেদঃ প্রজায়তে ।

মেদমোহস্থিততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য মন্তবঃ ।

তত্রৈমাং ধাতুনা মনপানবসঃ প্রীণয়িতা ॥ (সুশ্রুতসংহিতা)

ততঃস্থলভাগোবসঃ মাসেন পুংসাঃ শুক্রং জীণাকার্ত্তবং শুক্রকৃতবতি ॥

(ভাবপ্রকাশঃ)

(২) মাসেনোপচিতং কালেধমনীভ্যাং তদার্ত্তবং ।

ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধকবায়ু যোনিমুখান্নুগেৎ ॥ (সুশ্রুতসংহিতা) . .

(৩) মাসিমাসি রজঃপ্রীণাং রসজং অবতি জ্যহং ॥ (বাগ্ভটঃ)

“—পঞ্চরাত্রাভুবক্ষিচ ।” (চরকসংহিতা)

নাদারগতঃ নারীজাতির দ্বাদশবর্ষ বয়সে প্রথম রজোদর্শন
হইয়া থাকে, এবং প্রায়ই পঞ্চাশবর্ষ বয়সে শরীরজীর্ণ হইলে (*)
অভাবতঃই রজঃক্ষয় হইয়া থাকে । সুতরাং তৎপরে আর রজো-
দর্শন হয় না । (৪)

যেমন পুষ্পমুকুলস্ত গন্ধ বিদ্যমান থাকিতেও মুকলিতাবস্থায়
আরতরও অল্পর হেতু উহার উপলব্ধি হয় না । কালক্রমে অপ্রা-
মানাদিক্যখটিলেও পত্র কেশর সমূহ বিরুদ্ধ ও বিরত হইলে সম্যক
উপলব্ধ হয় । তদ্রূপ শুক্র, আর্ভবশোণিত, স্তন, স্তন্য, রোগাবলী,
ও শল্যপ্রভৃতি নৈশবাসস্থায় দেহে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও

(*) এখানে অ'চার্য্য, জরাজীর্ণতাকে রজঃক্ষয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন । জরাজীর্ণতা কিরূপে রজঃক্ষয়ের কারণ হয়, তাহা চিন্তাকরিলে
দেখা যায় যে শরীরের জীর্ণবস্থায় অভাবতঃই দৈহিকবায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত
হইয়া থাকে । ঐ বর্দ্ধিত বায়ু, যে আহারীয় রস হইতে শরীরে ধাতুসমূহ
পরিপুষ্ট হয়, গেই আহারীয় রসকে শোষণকরিতে থাকে । সুতরাং পোষক
হেওর অলাভে জীর্ণব্যক্তির শরীরে ধাতু সমূহ পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ
হইতে থাকে । বলা বাহুল্য যে উক্তরূপ কারণেই জরাজীর্ণ রোগীর রজো-
রূপ ধাতুও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধাতুসমূহের
সুপুষ্টতাই রজোদর্শনেরহেতু এবং ধাতু সমূহের ক্ষীণতাই রজোদর্শনাভাবের-
হেতু । সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অ'চার্য্যকথিত দ্বাদশবর্ষ, প্রথম রজো-
দর্শনের সম্ভাবিত কালমাত্র, বস্তুতঃ তৎপূর্বেও (দশম, একাদশ বর্ষে) ধাতু-
সমূহের সুপুষ্টতা খটিলে রজোদর্শন হইতে পারে । এবং তৎপরেও (ত্রয়োদশ,
চতুর্দশ বর্ষে) ধাতুসমূহ স্পৃষ্ট না হইলে রজোদর্শন হয় না । এইরূপ
পঞ্চাশবর্ষও রজঃক্ষয়ের সম্ভাবিত কালমাত্র । বস্তুতঃ পঞ্চাশবর্ষের পূর্বেও
ধাতু সমূহের ক্ষীণতা খটিলে রজোদর্শনের অভাব হইতে পারে । এবং
তৎপরেও ধাতুসমূহের পুষ্টতা থাকিলে রজঃস্রাব বর্তমান থাকিতে পারে ।

(৪) তদ্বর্ষাদ্বাদশবর্ষকালে বর্তমান মন্যুপুণঃ ।

জরাপক্শবীরগঃ যাত্রি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং । (মৃগত্বসংহিতা)

সুপ্ত হেতু তখন উপলব্ধ হয় না । কালক্রমে (দ্বাদশবর্ষাদিরূপ) সুপ্তাবস্থায় উহার অভিযুক্তি ও উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ (৫)

রজোদর্শনের প্রথমদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত কালকেই ‘ঋতুকাল’ বলা যায় । তদন্থো প্রথম দ্বিনদিবস সম্ভাব্যতাই সবেগে শোণিত নিঃসৃত হয় । তৎপরে কাহারও অঙ্গঅঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাহারও বা দৃষ্ট হয় না । কিন্তু উক্ত ষোড়শরাত্রি পর্য্যন্তই গর্ভসংস্কারের যোগ্য কাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । কারণ ঐকালে গর্ভাশয়ের দ্বার (জরায়ুমুখ) সম্পূর্ণ বিস্তৃত থাকে । (৬)

যেমন দিবা অবসান হইলে পদ্মিনী সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । তদ্রূপ ক্ষতুর ষোড়শরাত্রি অতীত হইলেই গর্ভাশয়ের দ্বার (জরায়ুমুখ) সঙ্কুচিত হইয়া যায় । সুতরাং তৎপরে পরবর্তী—ঋতুকালে; পূর্বপর্য্যন্ত আর আর্ন্তবশোণিত দৃষ্ট হয় না । এবং তৎকালে গর্ভ সংস্কারেরও সম্ভাবনা থাকে না । (৭)

গর্ভাবস্থায় রজোদর্শন না হওয়ার কারণ এই যে রজঃপ্রাণিণী নাড়ীর মুখ, সংকীর্ণ গর্ভ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং রজঃ নির্গত

(৫) তথা হি পুষ্পমুকুলস্থে। গন্ধো ন শক্যমিহাস্তীতি বক্তুং নৈব-
নাস্তীতি অথবাণ্ডি সত্যং ভাবানামভিব্যক্তিরিতি কুত্বা কেবলং সৌক্ষ্য্যমভি-
ব্যক্ত্যতে সএব গন্ধো বিবৃতপত্রকেশরৈঃ কালান্তরেণাভিব্যক্তিঃ গচ্ছতৌবং
বালানামপি বয়ঃপরিণামাৎ শুক্রপ্রাহুর্ভাবো ভবতি রোমরাজ্যাদয়োহথার্ন্তবা-
দয়শ্চ বিশেষা নারীগাং রূপসি চোপচীয়মানে শটনঃ শটনঃ স্তনগর্ভাশয়
মোচ্যতি বুদ্ধির্ভবতি ॥ (সুশ্রুত সংহিতা)

(৬) আর্ন্তবজ্রাবদিবসাদৃভুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ ।

গর্ভগ্রহণযোগ্যস্ত সএব সময়ঃ স্মৃতঃ ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৭) নিয়তং দিবসেহতীতে সংকুচভাষুজংযথা ।

ঋতৌ বাতীতে নার্যাস্ত যোনিঃ সংত্রিয়তে তথা ॥ (সুশ্রুত সংহিতা)

হইতে পারে না । (*) এই সংরুদ্ধ আর্তব রক্তের ক্রিয়াদংশ এবং অপর উপচীষমান রক্ত ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া অমরা (ফুল) রূপে পরিণত হয় । (এই অমরার সঞ্চিতই গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী সংলগ্ন থাকে ।) উক্ত আর্তব রক্তের অবশিষ্ট অংশ, স্তন্যবাহিনী নাড়ী দ্বারা স্তন দ্বয়ে নীত হয়, এই কারণেই গর্ভিণীর স্তন্যুগল অপেক্ষাকৃত পীন ও উন্নত হইয়া থাকে । (৮)

স্বাতুমতীর লক্ষণ ।

স্বাতুমতী রমণীর মুখ কিঞ্চিৎ পীন ও প্রাসন্ন, দন্ত ও মুখবিবর ক্ষেদযুক্ত, বাক্য অপেক্ষাকৃত সূত্রাব্য, ভুজদ্বয়, স্তন্যুগল, কটীদেশ, নাভি, উরু, জঘন ও নিতম্ব স্থান ঈষৎ কম্পিত, চিত্ত নিতান্ত শ্রুষ্ণ ও উৎসুক্য পরায়ণ হইয়া থাকে । কুক্ষি, চক্ষু, ও কেশ সমূহ স্বেদ হইয়া পড়ে এবং পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত অভিলাষ জন্মে । (৯)

(*) যে সমস্ত আহার ব্যবহার গর্ভিণীর পরিহার্য্য বলিয়া পরে উল্লিখিত হইবে, তাহা সেবন করিলে কিম্বা গর্ভিণীর কোন উৎকট পীড়া হইলে গর্ভাবস্থায়ও রক্তোদর্শন হইতে পারে । (ক) এইরূপ রক্তোদর্শন হইলে প্রায়ই গর্ভপাত হইয়া যায় ।

(৮) গৃহীত গর্ভাণাগার্তববহানাং শ্রোতমাং বজ্জীনাবক্ষ্যন্তে গর্ভেণ, তস্যাং গৃহীতগর্ভাণাগার্তবং ন দৃশ্যতে । ততঃ প্রতিলভ্যমুদ্যমগতমপরাং উপচীষমানমকোভিধীয়তে ।

শেষকোদ্ধিতরমাগতং পয়োধরাবতি প্রতিপদ্যতে ।

তস্যাং গর্ভিণাঃ পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি ॥ (স্বপ্রত-সংহিতা)

[৯] পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিষ্টাঙ্গমুখধিমাং ।

নরকাগাং ত্রিয়কথাং স্তম্বকুক্ষ্যক্ষি মুর্দ্ধজাং ।

ক্ষুরং ভুজকূচ শ্রোণীনাভ্যকুজঘনক্ষিচৎ ।

হর্ষোৎসুক্য পরাধাপি বিদ্যা দৃষ্টমতীগিতি । (স্বপ্রতসংহিতা)

[ক] "গর্ভিণ্যাঃ পরিহার্য্যাণাং সেবয়া রোগতোহপি বা ।

পুঠে দৃষ্টে"—

॥ (বাগ্ভটঃ)

খাত্তমতীর ব্যবহার নিয়ম ।

খাত্তমতী হইলে প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত, আগ্নি সহবাস, দিবা-
নিদ্রা, নেত্রে অঙ্গনব্যবহার, স্নান, অশ্রুপাত, গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন
তৈলাদি মর্দন, নখচ্ছেদন, বেগে গমন, অধিক হাস্য, অধিক বাক্য
কথন, উচ্চৈঃশব্দ শ্রবণ, অবলোকন (চিরুণী প্রভৃতি দ্বারা চুল আঁচ-
ড়ান) এবং বায়ু সেবন, ও অধিক আয়ামজনক কর্ম করণ নিতান্ত
অবিধেয় । কারণ, উক্তকালে ঐ সমস্ত আচরণ দ্বারা গর্ভাশয় ও
আর্তব শোণিত দূষিত হইয়া নিজের এবং তদার্তব সম্ভাবিত ভাবি
ক্রমের বহুপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে । (১০)

বিশেষতঃ খাত্তুকালে উপবাস, ভয়, ক্রম্ধ সেবন, ব্যূহ, ও মল-
মূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ, প্রভৃতি অহিতাচরণ পরিত্যাগ করা
বিধেয় । কারণ উহা দ্বারা অবমান আর্তব শোণিত দূষিত ও
সংরুদ্ধ হইয়া রক্ত গুল্মাদি রোগ উৎপাদন করিতে পারে । (১১)

খাত্তমতীর প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত আগ্নি সহবাস বিশিষ্টরূপে
অবৈধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । কারণ, খাত্তুর প্রথমাবস্থায় অব-
মান রক্ত নিতান্ত তরল, অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, ও অপরিপক্ব, স্তব্ধ ও দূষিত ।
প্রায়শঃ প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্তই আর্তব রক্তের ঐরূপ দূষিতাবস্থা
থাকে । অতএব প্রথম দিবসে সহবাস করিলে রমণীর প্রদরাদি
রোগ, এবং উক্ত দূষিত রক্তের সংস্রবে পুরাণের উপদংশ, প্রমেহ,
ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগ সমুৎপন্ন হইয়া আয়ুঃক্ষয় করে এবং

[১০] ঋতৌ প্রথম দিবসে প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাসপ্লাজনাশ্রপাত
ানান্নলেপনাদ্গমর্দননখচ্ছেদনপ্রধাবনহমনকথনাতিশব্দশ্রবণাবলোকনানিলায়া-
নান্ পরিহরেদিত্যাদি । (স্মৃতিত সংহিতা)

[১১] ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন বিরুদ্ধৈর্কৈগবিধারশৈশ্চ । সমস্তশুনো-
ল্লখন যোনিদোষৈ গুল্মাঃ ক্রিয়ানরক্তভবোহভ্যুপৈতি ॥ (চরকসংহিতা)

উক্ত দূষিত শোণিতরূপ বীজে গর্ভ সঞ্চার হইলে তদুপাঙ্গ সন্তান ভূগিষ্ঠ হওয়ার পাবেই গতাশ্ব হয় । দ্বিতীয় দিবসেও তদুপ ফল, অথবা স্মৃতিকা গৃহেই সন্তান বিনষ্ট হয় । তৃতীয় দিবসেও তদুপ ফল, অথবা সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্ক বা অজ্জায়ুঃ হইয়া থাকে । (১২)

অপিচ ধর্মার্থ ও পুত্রার্থ ভাৰ্য্যা পরিগ্রাহী সংসতেশ্চিয়- আৰ্য্যগণ ঋতুর প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত মহবাস না করিবার কারণ স্বরূপ আরও বলিয়াছেন যে, প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত গর্ভাশয় হইতে তদধোমুখ দ্বারা মনেগে আর্ভব শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে । সুতরাং তদবস্থায় মহবাস করিলে ক্ষরিত শুক্র উক্তরূপ শোণিত-প্রাবি জরাযুমুখ দ্বারা গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না । যেমন নদী স্রোতের প্রতিকূলে চালাইবার অভিপ্রায়ে কোন জব্য প্রক্ষিপ্ত হইলেও উহা প্রতিকূল গমনে অসমর্থ হইয়া স্রোতের অনুকূলগামী হয়; তদ্রূপ ঐ অবস্থায় পতিত শুক্র ও শোণিত প্রাবী গর্ভাশয় মুখ দ্বারা গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পাবিয়া অবগান শোণিত বেগেই সহিতই অধঃপ্রত্যায়িত । সুতরাং সেই বীজ দ্বারা গর্ভ-সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না । (১৩)

[১২] তুজ প্রথম দিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুনগমনমনায়ুগ্নঃ পুংসাং ভবতি যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ সপ্রসবোগানো বিমুচ্যতে । দ্বিতীয়েহপ্যেবং স্মৃতিকা-গৃহে বা । তৃতীয়েহপ্যেবমসম্পূর্ণাঙ্কোহজ্জায়ুর্মা ভবতি । + “উপদংশ-স্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রস্য চ ক্ষয়ঃ ।” (সুশ্রুতসংহিতা)

[১৩] ন চ প্রবর্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং শুণকরং ভবতি । যথা নদ্যাং প্রতি স্রোতঃ প্রাবিজ্যং প্রক্ষিপ্তং প্রতিনিবর্তবে নোদ্ধিৎ গচ্ছতি তদ্বদেব জষ্টব্যং তস্মাৎ নিয়মবর্তীং জিরাত্রং পরিহারেৎ ॥

(সুশ্রুতসংহিতা)

সহবাস বিষয়ক বিধি নিষেধ ও তাহার ফলাফল ।

ঋতুন চতুর্থ দিবস হইতে (গ) ঋতুন দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত বিহিত কালে স্নাত, চন্দন লিণ্ডাঙ্ক, সুগন্ধ পুষ্পমালাপারী, উত্তম বেশী, বসন, ও ভুষণ শোভিত, বীর্য্যবর্দ্ধক বস্তু ভোজনশীল, * পরস্পর অন্তরাগ-যুক্ত, কাগনেগার্ভ, সন্তানার্থী, বয়স্ক দম্পতির উত্তম শয্যায়া সহবাস বিধেয় । (১৪)

তাঁহাতে গর্ভনক্ষার হইলে তদাভিজাত সন্তান সম্পূর্ণাঙ্ক ও দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে । (১৫)

পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং স্ত্রীলোকের সোড়শ বর্ষ অবধি বয়সই (ঙ) পরস্পর সহবাসেব উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দিষ্ট হই-

[+] * চতুর্থাদি দিবসেও অত্যন্ত আর্তব রক্তের অনুবৃত্তি থাকিলে সহ-বাস বিধেয় নহে । কারণ তাঁহাতেও পূর্বোক্তরূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে । অতএব আর্তব রক্তের বেগ নিবৃত্তি হইলেই সহবাস বিধেয় । (খ)

[১৪] স্নাতচন্দনলিণ্ডাঙ্কঃ সুগন্ধসুমনোহরিভিঃ ।

* ভুক্তব্যাঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কতঃ ।

তাম্বূলবদনস্তম্যামম্বরক্তোহধিকম্বরঃ ।

পুত্রার্থী পুরুষোনারী মুপেয়াচ্ছয়নে শুভে ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(১৫) চতুর্থোক্ত সম্পূর্ণাঙ্কো দীর্ঘায়ুশ্চ ভবতি ॥

(সুশ্রুতসংহিতা)

[#] বাগ্ভট-মতে স্ত্রীলোকের সোড়শ বর্ষ এবং পুরুষের বিংশতি বর্ষ অবধি বয়সই পরস্পর সহবাসেব উপযুক্তকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । (গ)

[গ] চতুর্থাদি দিবসেইপি রক্তোনিবৃত্তৌ স্ত্রীপত্যা সংগচ্ছেৎ ।

ন তু রক্তোহবৃত্তৌ ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

[গ] “পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশতম সঙ্গতা ।

শুভে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেহনিলেহদি ।

বীর্য্যবস্তং সূত্রং স্মৃতে—” ॥ (বাগ্ভটঃ)

যাচ্ছে। কারণ উক্তকালে উভয়ের বীজই সম্যক পক্ক ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কিংবা স্ত্রীর সংযোগে গর্ভ-সঞ্চারণ হইলে তদগর্ভজ সন্তান গর্ভাশয়েই মৃত হয়। অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়াও অধিক কাল জীবিত থাকে না। কিংবা জীবিত থাকিলেও নিতান্ত দুর্বলেজিয় হইয়া থাকে। কারণ, পূর্কোক্ত বিহিত কালের ন্যূন বয়সে উভয়েরই বীজের সম্যক পরিপক্কতা বা পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। (১৬)

অত্যন্ত রুক্ষা কিম্বা কোন রোগ বীড়িতা স্ত্রী কিংবা অবশিষ্ট পুরুষের সংযোগে গর্ভসঞ্চারণ হইলেও পূর্কোক্তরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। [১৭]

ঋতুকালে বিপনীতভাবে (পুরুষ নিম্নে এবং রমণী উপরে থাকিয়া) সংসর্গ করা নিতান্ত অবিধেয়। কারণ তাহাতে গর্ভ-সঞ্চারণ হইলে যদি পুংজাতীয় সন্তান জন্মে, তবে তাহার আকার ও ক্রিয়া প্রকৃতি অধিকাংশই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে এবং স্ত্রীজাতীয় সন্তান জন্মিলে তাহার আকার ও ক্রিয়া প্রকৃতি অধিকাংশই পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে।

পরন্তু ঐরূপ সংসর্গ করিলে পুরুষের শুক্রাশ্রমী (পাথুরি) প্রভৃতি উৎকট রোগ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভব। [১৮]

[১৬) উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।

যদ্যধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিহঃ সবিপদ্যতে ।

জাতোবা ন চিবৎ জীবৎজীবৎ দুর্বলেজিয়ঃ ।

তন্মাদত্যন্তবালয়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ (সুশ্রুত সংহিতা)

[১৭] অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যামনোন বা বিকারেণোপস্থষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কারয়েৎ ॥ পুঙ্খমগ্ন্যাপ্যবস্মিধুস্য ত এন দোষাঃ সম্ভবন্তি ॥ (সুশ্রুত সংহিতা)

[১৮] নচাগাবধতিষ্টেদিত্তি, তথাহি স্ত্রীচেষ্টে: পুমান্ জায়তে ।

পুংচেষ্টা বা স্ত্রীচ ।

(অষ্টাঙ্গসংগ্রহঃ)

অপিচ পার্শ্বশায়িনী বা স্নানান্তরালে শায়িতা রোগীতে উপগত হওয়াও অবিমেষ্য । কারণ, তৎকালে রোগী স্নানান্তরালে থাকিলে বায়ু অতিশয় প্রাকুপিত হইয়া যোনিদেশে পীড়ন করে এবং বীজ গ্রহণের বাধকতা জন্মায় । এবং তৎকালে রোগী দক্ষিণ পার্শ্বশায়িনী থাকিলে স্নেহা উপীড়িত ও অস্থান চ্যুত হইয়া জরায়ু মুখ বন্ধ করে । সুতরাং বীজ গ্রহীত হইতে পারে না । এবং তৎকালে বামপার্শ্ব শায়িনী থাকিলে, পিত্ত, অস্থানচ্যুত হইয়া দম্পতির নিমিত্ত বীজকে (শুক্র ও আর্দ্রব শোণিতকে) বিদগ্ধ করে । সুতরাং তাহাতে গর্ভসংধারণ হয় না । [১৯]

অতএব পূর্বেল্লিখিত গুণশালিনী স্বেচ্ছচিত্তা, ও তদনান্য রোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ সুসংস্থিত রাখিয়া উত্তম ভাবে (চিত্ত হইয়া) থাকিয়া, পূর্বেল্লিখিত গুণশালী ও স্বেচ্ছচিত্তা স্মারিত সহিত সহবাস করিবে । তৎকালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ সুসংস্থিত রাখিয়া উত্তম ভাবে থাকিলে দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) অস্থানেই অবস্থিত থাকে, সুতরাং বীজ উত্তমরূপে গ্রহীত হইতে পারে ।

যোভার্যায়ামৃতৌ সোহাদিকেনৈব প্রবর্ততে ।

ততঃ ক্রীচেষ্টিতাকীরো জায়তে যৎসংজ্ঞিতঃ ।

ঋতৌ পুরুষবদ্যপি প্রবর্তেতাঙ্গনা যদি

কৃতকন্যা যদি ভবেৎ না ভবেন্নরচেষ্টিতা ॥

++ “উত্তানেচ ভবেচ্চীষ্রঃ শুক্রাশ্রয়াশ্চ গন্তব্যঃ ॥

(সূত্রসংহিতা)

[১৯] নচ স্নানান্তরালে বা সেবেত । স্নানান্তরালে বা সেবেত বনবান্ ময়োনিঃ পীড়য়তি । দক্ষিণপার্শ্বগতায়ঃ স্নেহা উপীড়িতচ্যুতাহপি দধাতি গর্ভায়ং । বামপার্শ্বগতায়াম্পিত্তং বিদহতি রক্তশুক্রে । তস্মাদুত্তমানাবীজং গ্রহীয়াদিত্যি । (অষ্টঙ্গসংগ্রহঃ)

ফলতঃ গর্ভাদানেন পূর্ণ হইতেই দম্পতির উত্তম গ্রাহার, ব্যবহার ও চিত্তেব স্থপ্ততা থাকা আবশ্যক । কারণ শ্রুতদশী আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে, দম্পতি যাদৃশ আহার, ব্যবহার ও চেষ্টাশালী হইয়া গর্ভাদান করেন, তদাভিজ সন্তান প্রাপ্তিই তাদৃশ আহার, আচার ও চেষ্টাতে অনুবর্ত্ত হইয়া থাকে ।

শ্রুতচার্য্য ইহাও শিখিয়াছেন যে, অবিধেয় প্রথম তিন দিবস ভিন্ন ঋতুর যুগ্ম দিবসে (চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ দিবসে) সহবাস করিলে পুত্র সন্তান হওয়াব সম্ভাবনা । এবং অযুগ্ম দিবসে (পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিবসে) সহবাসে কন্যা সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা । ত্রয়োদশ দিবস অবধি অবশিষ্টকাল নিত্যস্ত নিন্দনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । [*] সম্ভাবনা ।

কারণ ভ্রাহ্মতে গর্ভগণ্য হইবে নপুংসক সন্তান হওয়ার

শ্রীহরিশোহন দামগুপ্ত কবিরাজ । (ক্রমঃ)

* আচার্য্যের উক্ত প্রকার নির্দেশের কারণ স্বরূপে কেহ কেহ বলেন যে ঋতুর ষাঁদশ দিবস পর্য্যন্ত যুগ্ম দিবস অপেক্ষা অযুগ্ম দিবসে স্বভাবতঃই অর্থাযুকোমে আর্তবরক্তের অধিক্য হইয়া হইয়া থাকে । এবং যুগ্মদিবসে স্বভাবতঃই আর্তবরক্তের অল্পতা ঘটিয়া থাকে । এবং ত্রয়োদশ অবধি ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত আর্তবরক্ত নুনাতিরিক্ত না হইয়া সামান্যস্থায় বর্ত্তমান থাকে । পরে উল্লিখিত হইবে যে “গর্ভোৎপাদক শুক্র ও আর্তবরক্তের সংযোগ কালে শুক্রাধিক্য থাকিলে পুত্র, আর্তবাধিক্য থাকিলে কন্যা, এবং উভয়ের সামান্যস্থায় নপুংসক সন্তান হওয়াব সম্ভাবনা ।” একপ অবস্থায় যদি স্বীকার করা যায় যে, সবল ও সুস্থকায় রমণীর নুনাতিরিক্ত সামান্যস্থায় অবস্থিত আর্তবরক্তের সহিত সবল ও সুস্থকায় পুরুষের শুক্রের তুল্যতা আছে, কিন্তু আর্তবের ন্যায় যুগ্মাযুগ্ম দিবসে উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই । তাহা হইলেই প্রতী-
পাদিত হইবে যে, যুগ্ম দিবসে আর্তবরক্ত অপেক্ষা শুক্রের পরিমাণাধিক্য থাকিতে পুত্র, অযুগ্ম দিবসে শুক্র অপেক্ষা আর্তবরক্তের পরিমাণাধিক্য থাকিতে কন্যা, এবং ত্রয়োদশ দিবস অবধি উভয়ের সামান্যস্থায় থাকিতে নপুংসক সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গত বটে ।

গর্ভবিবরণ ।

সেগুন প্রভৃ (বর্ষাশরৎ পাত্তি), ক্ষেত্র, জল ও বীজের উপযুক্ত সংযোগে অক্ষুরোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদপ জীলোনেনু ঋতুনাম গর্ভাশয়, রস, ও বীজ (পুত্রমেব শুক্র ও জীজাতির আর্জন শোণিত) ঈহাদিগের উপযুক্ত সংযোগেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে । (২৪)

পূর্নোক্ত অবস্থায় সাধারণতঃ শুক্রও আর্জনশোণিতের উপযুক্ত সংযোগেই গর্ভোৎপত্তির সম্ভাবনা বটে, কিন্তু ঐ শুক্র ও আর্জন-শোণিত বিশুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত থাকিলে বিশুদ্ধ গর্ভসংস্কারের সম্ভাবনা, অর্থাৎ তদুৎপন্ন সন্তান সম্পূর্ণাঙ্গ ও নীরোগ হইতে পারে । আর বাতাদি দোষদ্বারা ঐ শুক্র ও আর্জন শোণিত দূষিত হইয়া থাকিলে তদুৎপন্ন সন্তান নিকৃষ্টাঙ্গ বা কোন রোগ যুক্ত হইতে পারে ।

যেহেতু কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত, স্তন্যদূষিতবীজ পিতা বা মাতা দ্বারাও সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখাযায় । কিন্তু সেই সন্তান প্রায়ই ততঃ রোগযুক্ত হইয়া থাকে ।

উক্ত প্রকার দূষিতবীজই জন্মাক্র, বধির, মূক ও পঙ্গু প্রভৃতি সন্তান উৎপত্তির অন্যতর কারণ । (২৫)

এস্থলে ঈহাও ব্যক্ত যে, বায়ু, পিত্ত ও কফাদি দ্বারা শুক্র ও

[২৪] এবং চতুর্গাং সান্নিধ্যাদ্গর্ভঃ স্যাৎসিদ্ধি পূর্ণকঃ ।

ঋতুক্ষেত্ৰাসু বীজানাং সান্নিধ্যাদক্ষুরো যথা ॥

(স্মৃতি সংহিতা ।)

[২৫] গর্ভঃ শুক্রঃ অশুদ্ধস্ত গর্ভোহশুদ্ধ শুক্রশোণিতয়োয়পি দম্পত্যো-
র্ভবতি । যত আহ দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যানুর্জশোণিত শুক্রযোঃ যদপত্যং
উযোজ্যতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতমিতি । যতু বাতাদিহৃষ্টরৈতসঃ প্রজোৎপাদনে
ন সমর্থ্যেতি স্মৃতিঃ, তত্র শুক্র প্রজোৎপাদনে ন সমর্থ্য ইতি বোধ্যং ।
বোগাদিনা শুক্রাশ্চ প্রজা বাতাদিহৃষ্টশুক্রা অপি জনয়ন্তি জন্মাক্রবধিরপঙ্গাদি-
সন্তবাং ॥

(ভাবপ্রকাশঃ ।)

আর্তবশোণিত অত্যন্ত দূষিত হইলে একেবারে উহা অবীজও হইয়া থাকে । অর্থাৎ ঐ বীজের গর্ভোৎপাদিনী শক্তি থাকেন ॥ (২৬)

বিশুদ্ধ শুক্রের লক্ষণ ।

যে শুক্র, স্নিগ্ধ, ঘন, পিচ্ছিল, মধুররস, অবিদাহী (যাহা নিঃসরণ কালে আলাকারক না হয়) ও নির্মল স্ফটিক সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট তাহাকে বিশুদ্ধ বলা যায় । (২৭)

বিশুদ্ধ আর্তব শোণিত লক্ষণ ।

যে আর্তব শোণিত, নিষ্পিচ্ছিল, যাহা নিঃসরণকালে আলা বা কোন প্রকার বেদনা কারক নাহয়, ও যাহা অনতি বহল ও অনতি অল্পরূপে সাতৈককালান্তবে পরিষ্কৃত হইয়া পঞ্চরাত্রানুবন্ধি হয়, (মতান্তরে ত্রিরাত্রানুবন্ধি) এবং যাহার বর্ণ শুভ্রাফল, ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণকীট বিশেষ) ও অলক্তক সদৃশ, তাহাকেই বিশুদ্ধ বলা যায় । (২৮)

পূর্বোক্ত লক্ষণের অনাথা ভাবাক্রান্ত শুক্র ও আর্তবশোণিত কেই সাধারণতঃ অবিশুদ্ধ বা দূষিত বলা যায় । দূষিত শুক্র ও আর্তব শোণিতের বিশেষ লক্ষণ স্থানান্তরে নিস্তারিতরূপে বলা হইবে ।

[২৬] বাতাদিকুণপগ্রস্থিযুষ্মকীণমলাক্ষয়ঃ । বীজানমর্গঃ রেতোহস্রঃ ।

বাগ্ভটঃ ।

[২৭] স্নিগ্ধং ঘনং পিচ্ছিলঞ্চ মধুরঞ্চাবিদাহি চ ।

রেতঃ শুক্রঃ বিজানীয়াৎ শুক্রস্ফটিক সন্নিভঃ ॥

(চরকসংহিতা ।)

[২৮] সানানিষ্পিচ্ছদাহার্জি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ ।

নৈবাতিবহলাত্যল্পমার্জবঃ শুক্রমাদিশেৎ ॥

শুভ্রাফলসবর্ণঞ্চ মদ্যালক্তকসন্নিভং ।

ইন্দ্রগোপক সঙ্কাশ মার্জবঃ শুক্রমাদিশেৎ ॥ (চরকসংহিতা ।)

গর্ভোৎপত্তি প্রণালী ।

জীপুষ্কযের সহসামকালে কামবেগবশতঃ এতৎ পাতঙ্গ্যম জন-
নেত্রিয়ের সংঘর্ষন বশতঃ সমুদ্গত দৈহিক বায়ু দ্বারা শারীরিক
উষ্ণা সমদিক উত্তেজিত হইয়া পুষ্কযের শরীরস্থ শুক্রকে জলীভূত
করে । অনন্তর ঐ জলীভূত শুক্র সহস্রাঙ্গের সফলবস্থায় পূর্কোক্ত
দৈহিক বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া পুংজননেত্রিয়া দ্বারা জী জন-
নেত্রিয়ে পতিত হয়, তদনন্তর উক্ত পতিত শুক্র, নিম্নতজরাযু
মুখদ্বারা জননেত্রিয়ের আন্তরিক ভাগে (গর্ভাশয়ে) প্রবিষ্ট
হয় । (২৯)

যেমন স্তূতপিণ্ড অগ্নিসংযোগে জলীভূত হইয়া গতিশীল হয়,
তদ্রূপ ঋতুকালে জীলোকের আর্কবশোণিত ও পৌরুষসংসর্গের
সফলবস্থায় বিসর্পিত হইয়া গর্ভাশয়ে সমাগত হয় । (৩০)

অনন্তর পূর্কোক্তরূপে গর্ভাশয়াগত পৌরুষ শুক্র ও রমণীর
আর্কব শোণিত বিশিষ্টরূপে সম্মিলিত হইয়া গর্ভরূপে পরি-
ণত হয় । (৩১)

[২৯] ঋতৌ জীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ ।

চেতুযোচ্চভিসংঘর্ষাচ্ছরী রোম্মানিলাহতঃ ॥

পুংসঃ সর্কশরীরস্থঃ রেতোজাবয়তেহথ তৎ ।

বায়ুমেহনমার্গেণ পাতঙ্গ্যদ্যননাভগে ॥

তৎ সংশ্রুত্যা ব্যাভ্রমুখং য়তি গর্ভাশ্রয়ং প্রতি ।

তজ শুক্রবদায়াতে নার্তবেন যুতং ভবেৎ ॥ (ভাবপ্রকাশঃ ।)

[৩০] স্তূতপিণ্ডো যথৈবাগ্নিসাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে ।

বিসর্পত্যার্তবঃ নার্য্যা স্তথা পুংসাং সমাগমে ॥

(স্মৃতিসংহিতা ।)

[৩১] ততোহগ্নীযোগনংযোগাৎ সংযজ্যমানো গর্ভো গর্ভাশ্রয়মস্থপ্রতি-
পদাতে ॥

(স্মৃতিসংহিতা ।)

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে পুরুষ মহাবাসকালে স্ত্রীলোকের ও শুক্র ক্ষরিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই স্ত্রী শুক্রের গর্ভোৎপাদনে কোন উপযোগিতা নাই বলিয়া এস্থলে তদ্বিষয় বিশেষরূপে কিছু উল্লিখিত হইল না । (৩২)

বস্তুতঃ পুরুষের শুক্র ও স্ত্রী জাতির আর্দ্রব শোণিতই গর্ভবীজ । স্ত্রীশুক্রের স্বভাবতঃই গর্ভোৎপাদিনী শক্তি নাই । কিন্তু উক্ত স্ত্রী-শুক্র দ্বারা স্ত্রীজাতির বল, বর্ণ, ও পুষ্টি প্রভৃতি সংসাধিত হইয়া থাকে । (৩৩)

গর্ভাশয়ে পুর্নোক্ত প্রকারে পৌরুষ শুক্র ও রমণীর আর্দ্রব শোণিত বিশিষ্টরূপে সন্মিলিত হইলে অনির্কচনীয় কারণে চেতনা-বান্ জীবাত্মা উহাতে অভিযুক্ত হইয়েন ॥ (৩৪)

উক্ত গর্ভাশয়স্থ শুক্র ও আর্দ্রবশোণিত চৈতন্যময় জীবাত্মার সহিত সন্মিলিত হইলেই তাহাকে “গর্ভ” বলা যায় ।

ইহা দার্শনিক মতে চতুর্কিংশতি তত্ত্বাক্রম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । (৩৫)

[৩২] যোষিতোহপি প্রবন্তোঃ শুক্রং পুংসাং সমাগমে ।

তন্নগর্ভস্য কিঞ্চিৎ কনোত্তীতি ন চিন্ত্যতে ॥

(অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ।)

[৩৩] স্ত্রীণাং গর্ভোৎপাদিন্যাং দার্দ্রবং সর্বমশ্নতঃ ।

তাসামপি বলং বর্ণং পুষ্টিং শুক্রং কনোত্তীতি হি ॥

(অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ।)

[৩৪] ক্ষেত্রজাঃ চেতনাবস্তাঃ শাস্বতাঃ লোহিতরেতসোঃ সরিপাতেষু ভি-
বাস্যন্তে ॥

(স্মৃতিসংহিতা ।)

[৩৫] গর্ভাশয়াগতং শুক্রমার্দ্রবং জীবগৎজকঃ ।

প্রকৃতি সর্বিকারা চ তৎ সর্বং গর্ভ সংজকং ॥

(ভাষ্যপ্রকাশ ।)

প্রায়শঃ কারণানুরূপই কার্য্য স্বভাব হইয়া থাকে, যেমন অগ্নি সম্ভাপে গমিত অর্ণরৌপ্যাদিখাত্তু যেক্ষপ আকৃতি বিশিষ্ট পাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ আকৃতিই গ্রহণ করে, তদ্রূপ প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মাধীন জীবাত্মাও কর্ম্মবশতঃ যখন যে যে জাতীয় গর্ভাশয়ে (মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি) সমাগত হন, তখন তত্তৎ জাতীয় আকৃতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন । (৩৬)

ক্রণের সঞ্জীবন হেতু ।

ক্ষিতি, আকাশ, অগ্নি (পাচক, ভ্রাজক, আলোচক, রজক ও সাধকাদিরূপ) সৌম (জলান্নক শ্লেষ্মা, শুক্রও রসাদিরূপ) বায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাদিস্বরূপ) মনোরূপে পরিণত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়, পঞ্চেন্দ্রিয় (শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ও ভ্রাণ শক্তি স্বরূপ) ও জীবাত্মা, এই সমস্তই গর্ভাশয়স্থ ক্রণের সঞ্জীবন হেতু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । (৩৭)

বীজগত ভৌতিকংশ ।

শুক্র, সৌম্য (জলীয়), আর্তবশোণিত আগ্নেয় ; অবশিষ্ট ভূতও (পৃথিবী, আকাশ, বায়ু) পরস্পরানুকূলতায় এবং পরস্পর সংযোগে সূক্ষ্মরূপে তাহাতে (শুক্রও আর্তবশোণিত) অবস্থিত আছে ॥ (৩৮)

[৩৬] কারণানু বিধারিহাং কার্য্যানাং তৎ স্বভাবত্ ।

নানাযোন্ত্যকৃতিঃ সত্ত্বো ধত্তেহতে। ক্রতলোহবৎ ॥

(বাগ্ভট ।)

[৩৭] অগ্নীযোর্মৌ মহীবায়ুর্নভঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ ।

পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতান্না গর্ভং সঞ্জীবয়ন্তিহি ॥

(ভাবপ্রকাশঃ ।

[৩৮] সৌম্যং শুক্রমর্তবগ্নেয়মিতরেষামপাত্তভূতানাং সান্নিধ্যমন্ত্যণুনা বিশেষেণ পরস্পরোপকারাং পরস্পরানুগ্রহাং পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ ॥

ক্রাসয়ক্ষীয় পাঞ্চভৌতিক ক্রিয়া ।

মেই চেতনামিষ্টিত পঞ্চভূতাত্মক গর্ভকে বায়ু, অক্ষপ্রাত্যঙ্গাদির বিভাগধুরা বিভক্ত করে । অগ্নি, পরিপাক ক্রিয়াদ্বারা একরূপ হইতে রূপান্তরিত করে । জল শ্রীয়গুণে ক্লেদযুক্ত করে । পৃথিবী শ্রীয়গুণে বঠিন করে । আকাশ অবকাশদানে দিন দিন বর্দ্ধিত করে । (৩৯)

এইরূপে বিবর্দ্ধিত গর্ভ যখন হস্ত পদাদি অক্ষপ্রাত্যঙ্গ যুক্ত হয়, তখন তাহাকে শরীরী বলা যায় । (৪০)

ক্রণের নাভিনাল বিবরণ ।

গর্ভের তৃতীয় মাসে অনির্কটনীয় কারণে ক্রণের নাভি হইতে একটা নাড়ী সৃষ্ট হইয়া জননীর রসবাহিনী ধমনীর সহিত সংযুক্ত হয় । যেমন ক্ষেত্র মধ্যে প্রবাহিত জল প্রণালীর জল দ্বারা ক্ষেত্রস্থ শস্য সমূহ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ গর্ভাশয়স্থ ক্রণের পূর্নোক্ত নাভি নাড়ী দ্বারা জননীর আহারীয় রস ও বীৰ্য্য ক্রণ দেহে বাহিত হয়, তদ্বারাই গর্ভের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

গর্ভাশয়ে শুক্র ও আর্ত্ব শোণিতের সংযোগ অনধি অক্ষ প্রাত্যঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার ও নাভিনাল সৃষ্টির পূর্ক পর্য্যন্ত যেমন মলিল পূর্ণ সরোবরের উপল্লব দ্বারা তন্তীরবর্তী তরু সমূহ পরিপোষিত হয়, তদ্রূপ জননীর সর্ব শরীর সঞ্চারী রসবাহিনী ধমনী সমূহের উপল্লব দ্বারা গর্ভ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় ॥ ৪১ ॥

[৩৯] তৎচেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি তেজ এনং পচতি । অপঃ ক্লেদয়ন্তি পৃথিবী সংহত্যাকাশং বিবর্দ্ধয়তি ॥ স্মৃতিসংহিতা ।

[৪০] ক্রমেন বর্দ্ধিতো গর্ভো যদ্যক্ষোপাঙ্গ সংযুক্তঃ ।

ভবেত্তদা সমুন্নিভিঃ শরীরিতি নিগদাতে ॥ ভাবপ্রকাশ ।

[৪১] মাতুস্ত গলু রসবহায়াং নাড়্যাং গর্ভনাভিনাডীনিবদ্ধা, মাস্য মাতু-

গর্ভাশয় মধ্যে জ্ঞানের মলমূত্র ত্যাগ ও
রোদন না করিবার কারণ ।

মলের অগ্ন্যুত্তাপ হেতু এবং পাকায়ের সহিত বায়ুর মিশ্রণ
হেতু গর্ভাশয়মধ্যে জ্ঞানের বাত, মূত্র ও পুরীষ নিঃসৃত হয় না ॥৪২॥

এবং জরায়ু দ্বারা মুখ আচ্ছন্ন ও কফদ্বারা বর্ধিত থাকে
বশতঃ এবং দোষ জনক বায়ুর পথ বন্ধ থাকে বশতঃ গর্ভাশয় মধ্যে
জ্ঞান রোদন করিতে পারে না । (৪৩)

গর্ভস্থ শিশু, জননীকে নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিজা দ্বারা
নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিজা লাভ করে । (৪৪)

শরীরের যথায়ুক্ত সন্নিবেশ, দন্তের পতন ও পুনরুদ্ধার, হস্তপদ-
তলে রোগের অনুৎপত্তি, দৃষ্টি ও শরীরের অনভিবুদ্ধি, শরীর
ক্ষীণ হইলেও নখ ও কেশের অতি বৃদ্ধি, এই সমস্ত আভাবিক
ইহার কারণ অনির্দেশ্য । (৪৫)

রাষ্ট্রার রসবীৰ্য্যমভিবহতি । তেনোপস্নেহেনাস্যা অভিবুদ্ধির্ভবতি । অসজাতাঙ্ক
প্রত্যক্ষ বিভাগমানিষেকাৎ প্রভৃতি সর্কশরীরাবয়বানুসারিণীনাং রসবহানাং
ধমনীনাং উপস্নেহো জীবয়তি ॥ সূত্রসংহিতা ।

[৪২] গলাগ্ন্যাদযোগাচ্চ বায়োঃ পাকায়স্য চ ।

বাতমূত্রপুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ কৰোতি হি ॥ সূত্রসংহিতা ।

(৪৩) জরায়ুনা যুগেচ্ছন্নৈ কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে ।

বায়োর্মার্গনিবোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি ॥

সূত্রসংহিতা ।

(৪৪) নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংকোভ স্বপ্নান্ গর্ভোহধিগচ্ছতি ।

মাতুর্নখনিভোচ্ছ্বাস সংকোভ স্বপ্নসম্ভবান্ ॥

সূত্রসংহিতা ।

(৪৫) সন্নিবেশঃ শরীরগাং দন্তানাং পতনোত্তরো ।

তলেষসম্ভবো যশ্চ রোগা মেতৎ স্বভাবতঃ ॥

সূত্রসংহিতা ।

ভ্রূণদেহের পিতৃজ মাতৃজাদি অংশ নিরূপণ ।

কেশ, শাশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, স্নায়ু ও শুক্র
প্রভৃতিস্থিৰবস্তু সমূহ পিতৃজ ।

মাংস, রক্ত, মজ্জা, মেদ, বক্রত, শ্লীহা, অঙ্গ, নাভি, হৃদয় ও মল
মার্গ প্রভৃতি স্নিগ্ধবস্তু সমূহ মাতৃজ ।

শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ, দেহস্থিতি ও ক্ষয় প্রভৃতি রসজ ।

ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ুঃ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি
আত্মজ । (৪৬)

গর্ভিণী লক্ষণ ।

গৃহীতগর্ভারমণীর প্রথমতঃ অকারণে শ্রমবোধ, ঘ্রানি, পিপাসা,
মক্খি দ্বয়ের অনশাদ, শুক্রশোণিতের অবরোধ ও জননেন্দ্রিয় ঈষৎ
কম্পিত হয় ।

তৎপরে ক্রমশঃ শরীরের ক্লান্ততা, উদরের গুরুত্ব, মূৰ্ছা, বমি,
অরুচি, জ্বরা, (হাই) প্রায়শ্চ (মুখে জল উঠা) অঙ্গাবসাদ,
রোগসমূহের অধিক প্রকাশ, অল্পজব্যে অভিলাষ, স্তনদ্বয় পীন ও
স্তন্য যুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ স্তনমুখেব ক্লমবর্ণতা, ঈষৎ পাদশোথ,
ভুক্ত বস্তুর অল্পপাক এবং নানা বস্তুভোগে অভিলাষ জন্মে । (৪৭)

[৪৬] গর্ভস্য কেশ শাশ্রুলোমাস্থিনখদন্তশিরাস্নায়ুধমনীরেতঃপ্রভৃতীনি
স্থিরাণি পিতৃজানি মাংসশোণিতমদোমজ্জোথ্ননাভিয়কুণ্ঠীহাস্তগুদপ্রভৃতীনি
স্নিগ্ধানি মাতৃজানি । শরীরোপচয়োবলং বর্ণঃ স্থিতির্হানিশ্চ রসজানি । ইন্দ্রিঃ
জ্ঞানবিজ্ঞানমায়ুঃসুখদুঃখাদিকথ্যাজানি ॥

সুশ্রুতসংহিতা ।

[৪৭] সদ্যো গৃহীত গর্ভালিঙ্গানি শ্রমোগ্রানিঃ পিপাসা মক্খিসদনঃ
শুক্রশোণিতয়োঃসববন্ধঃ ক্ষুরগন্ধ যোনেঃ ॥

সুশ্রুতসংহিতা ।

গর্ভবতীর ব্যবহার নিয়ম ।

গর্ভাবস্থায় শোক, ভয়, উদ্বেগ, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগদারণ, শ্রদ্ধাবিঘাত, উপবাস, অধিক পথ গমন, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিষ্টেষ্ঠী ও গুরুপাক দ্রব্যভোজন, রক্তবস্ত্র পরিধান, বৃহৎ গহ্বর বা কুপ দর্শন, মদ্য ও মাংস সেবন, উত্তানভাবে (চিত্ত হইয়া) শয়ন, বমন, বিরেচন, শরীর হইতে রক্ত মোক্ষণ, অষ্টম মাসের পূর্বে বস্তি প্রয়োগ (পিচকারি ব্যবহার) অধিক পরিশ্রম, স্নানস্নান, গুরুভার বহন, গুরুবস্ত্র দ্বারা শরীরাবরণ, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, কঠিন বা অসম (উচ্চ নীচ) আসনে উপবেশন, দুর্গন্ধ বস্তুর আশ্রয়, নয়নের অগ্রিম বস্তু দর্শন, কর্ণের অগ্রিম বাক্য শ্রবণ, শুষ্ক, পশু্যমিত, বা পুতি (পচা) অন্নভোজন, অত্যাচৈঃ স্বরে বাক্য কথন অধিক তৈলমর্দন বা গাত্র মার্জন, অমুচু আশ্রয় বিশিষ্ট শয্যা বা উচ্চ স্থানে শয়ন বা উপবেশন এবং এতদ্বিত্য প্রাচীন অভিজ্ঞা পুনক্ষীণ যানারোহণ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন ঐ সমস্তই গর্ভবতীর সর্কথা বর্জন করা বিধেয় । (৪৮)

ক্ষামতা গরিমাঃ কৃষ্ণমূচ্ছাহদিররোচকঃ ।

জুষ্টা প্রসেকঃ মদনং রোমরাজাঃ প্রকাশনং ॥

অম্লৈষ্টতা স্তনৌ পীনৌ মস্তন্যৌ কৃষ্ণচূর্কৌ ।

পানশোথো বিদাহোহয়ৈ শ্রদ্ধাশচ বিবিধাজ্ঞকা ॥ বাগ্ভট ।

[৪৮] শোকক্রোধভয়োদ্বেগ বেগশ্রদ্ধাবিধারণঃ ।

উপবাসাধ্বতীক্ষ্ণাঞ্চ গুরুবিষ্টেষ্ঠিভোজনং ॥

রক্তং নির্বমনং শুভ্রকূপেক্ষাং মদ্যমামিষং ।

উত্তানশয়নং যচ্চক্রিয়ো নেচ্ছন্তি তত্ৰাজ্ঞেং ॥

তথা রক্তশ্রুতিং শুক্লিং বস্তিমামাগতোহষ্টমাং ।

অতি বায়ুমায়াসং ভারং প্রাবরণং গুরু ।

অকালজাগরণপকঠিনোং কটকাগনং ॥ বাগ্ভটঃ ।

কারণ ঐ সমস্ত অহিত আহার ব্যবহার করিলে অকালে গর্ভ-
প্রাব অথবা কৃষ্ণি মধ্যেই গর্ভ শুষ্ক বা মৃত হইতে পারে । (৪৯)

অধিক্রাংশ মধুর রস, স্নিগ্ধ, হৃদয়ের প্রিয়, জ্ব, লঘুপাক,
সুসংস্কৃত ও অগ্নি দীপ্তিকর-জব্য ভোজন করা গর্ভিণীর
কর্তব্য । (৫০)

গর্ভাশয়স্থ আগ্নের অঙ্গ বিকৃতির কারণ ।

প্রধানতঃ পিতৃ মাতৃ বীজদোষে এবং গর্ভিণীর আহার ব্যব-
হারের দোষে এবং গর্ভিণীর শরীরে কোন প্রকার অভিব্যাদি
লাগিলে প্রায়ই আগ্নের অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়া থাকে । তন্মধ্যে সাধা-
রণ কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিত হইল ।

গর্ভিণীর যে যে জব্য ভোগে অভিলাম্ভ জন্মে, তাহা প্রাপ্ত না
হইলে গর্ভাশয়স্থ সন্তান কুজ, কুনী (বিকৃত হস্ত), মৃক (বোবা),
গিন্নীন (সান্নাসিক ভাষী), খঞ্জ (খোঁড়া), জড়, বামন, বিকৃত-
চক্ষুঃ (ট্যারা) অথবা অঙ্গ হইতে পারে । (৫১)

ন জিহ্বেদপিভূগন্ধং ন পশ্যন্নয়নাশ্রিয়ং ।
বচাংগি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োঃপ্রিয়ানিচ ॥
নাস্তং পশু্যমিতং শুকং ভূজীত কুণ্ডিতং ন চ ।
নোচ্চৈর্জয়াৎ ন তৎ কুর্ষ্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি ॥
তৈলান্ভ্যঙ্কোদ্বর্তনঞ্চ নাতার্থং কারয়েদপি ।
নামৃদ্বাস্তবগং কুর্ষ্যাৎ নাতুচ্চং শযনাসনং ॥
এতাংস্তু নিয়মান্ সর্জান্ যত্নাৎ কুর্কীত গুর্কিণী ।

ভাবপ্রকাশঃ ।

[৪৯] এভিগর্ভচ্যবেতামঃ কুর্কোশুযোম্মি য়েত বা ॥

বাগ্ভটঃ ।

[৫০] ভোজ্যস্ত মধুরাশ্রয়ং স্নিগ্ধং হৃদয়ং জ্বং লঘু ।

সংস্কৃতং দীপনীযস্ত নিত্যমেবোপযোগ্যেৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ ।

[৫১] দৌহদ বিধাননাৎ কুজং কুনীং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষং বা
নাবী পুতং জনয়তি ॥

* পুস্তকভ্রংশিতা ।

কারণ জননীর অভিলাষেই জ্ঞানের অভিলাষ প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ণ না হইলে অসম্পূর্ণতা হেতু জ্ঞানের অঙ্গ বিকৃতি ঘটিতে পারে ।

গর্ভাবস্থায় অধিকাংশ বায়ু-বর্দ্ধক রক্ষাদি বস্তু আহার কিম্বা বায়ু-বর্দ্ধক ব্যবহার করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভাশয়স্থ জ্ঞানকে কুজ, অক্ষ ও বামন করিতে পারে । অধিকাংশ পিত্ত-বর্দ্ধক আহার ব্যবহার করিলে জ্ঞান, পিঙ্গলবর্ণ ও তাহান গম্ভীর কেদারশূন্য হইতে পারে । অধিকাংশ কফ-বর্দ্ধক আহার ব্যবহার করিলে জ্ঞান পাণ্ডুবর্ণ ও শ্বিত্ররোগী হইতে পারে । (৫২)

বাতাদিদোষ কিম্বা কোন অভিঘাতাদি দ্বাবা গর্ভিণীর কোন অঙ্গ অত্যন্ত পীড়িত হইলে, তদগতস্থ জ্ঞানেরও সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা । (৫৩)

পঞ্চভূতাস্তর্গত তেজো দাতু, কোন কারণে গর্ভাশয়স্থ জ্ঞানের অঙ্গ বিভাগ কালে দৃষ্টি ভাগের সহিত মিলিত না হইলে ঐ সম্ভান জন্মাক হয় এবং ঐ কালে উক্ত তেজোদাতু নেত্রস্থ রক্ত আশ্রয় করিলে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ, শ্লেষ্মা-শ্রয় করিলে চক্ষুঃ শ্বেতবর্ণ হয় এবং ঐ তেজোদাতু বাত আশ্রয় করিলে জ্ঞান বিকৃত চক্ষুঃ (ট্যারা) হইয়া থাকে । (৫৪)

[৫২] বাতলৈশ্চ ভবেদগর্ভঃ কুজাকজড় বামনঃ ।

পিত্তলৈঃ খলতিঃ পিঙ্গঃ শ্বিত্রী পাণ্ডুঃ কফাক্রতিঃ ॥ বাগ্ভটঃ ।

[৫৩] দোষাভিঘাতৈত গর্ভিণ্যা বো যো ভাগঃ প্রপীড়্যতে ।

স স ভাগঃ শিশ্নোস্তস্য গর্ভস্থস্যপ্রপীড়্যতে । স্মৃতিসংহিতা ।

[৫৪] তত্র দৃষ্টিভাগমপ্রতিপন্নং তেজো জাত্যক্ষং কথোতি । তদেব রক্তানুগতং রক্তাকং পিঙ্গানুগতং পিঙ্গাকং শ্লেষ্মানুগতং শ্বেতাকং বাতানুগতং বিকৃতাকং মতি ।

স্মৃতিসংহিতা ।

গৌর, শ্যাম, প্রভৃতি বর্ণোৎপত্তির কারণ ।

পঞ্চভূতাস্তর্গত তেজোধাতুই সমস্ত বর্ণের প্রধান উৎপাদক । গর্ভোৎপত্তিকালে ঐ তেজোধাতু, পার্থিবাদি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিবিধ বর্ণের উৎপাদন করে ।

গর্ভোৎপত্তি কালে তেজোধাতু অধিকাংশ জলীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে জ্ঞান গৌর বর্ণ হয় । ঐ তেজোধাতু অধিকাংশ পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে জ্ঞান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অধিকাংশ পার্থিব ও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে জ্ঞান গৌরশ্যাম-বর্ণ হয় । (৫৫)

কেহ কেহ বলেন যে, গর্ভিণী অধিকাংশ যেরূপ বর্ণের দ্রব্য আহার করে, তৎসমস্তান প্রায় সেইরূপ বর্ণ বিশিষ্টই হইয়া থাকে । (৫৬)

পুত্র, কন্যা ও ক্রীষ সন্তান হওয়ার কারণ ।

গর্ভাশয়ে গর্ভোৎপাদক শুক্র ও আর্তব শোণিতের সংযোগ-কালে শুক্রের আধিক্য থাকিলে পুত্র, আর্তব শোণিতের আধিক্য থাকিলে কন্যা, এবং উভয়ের সাম্যাবস্থা থাকিলে নপুংসক সন্তান উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ॥ (৫৭)

(৫৫) তত্র তেজোধাতুঃ সর্ষবর্ণানাং প্রভবঃ । স যদা গর্ভোৎপত্তাবব-
ধাতুপ্রায়ো ভবতি তদাগর্ভং গোবং কয়োতি । পৃথিবীধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণঃ
পৃথিব্যাকাশ ধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণশ্যামঃ তোয়াকাশধাতুপ্রায়ঃ গৌরশ্যামঃ ॥

(স্মৃতিত সংহিতা)

(৫৬) যাদৃগ্বর্ণমাহারমূপসেবতে গর্ভিণী তাদৃগ্বর্ণপ্রসবা ভবতীত্যোকে
ভাষন্তে ॥

(স্মৃতিত সংহিতা)

(৫৭) তত্র শুক্রবাহন্যাং পুমানাৰ্ত্তববাহন্যাং স্ত্রী সাম্যভূতয়ো-
নপুংসকমিতি ॥

(স্মৃতিত সংহিতা)

একদা যুগা বা বহু সন্তান উৎপত্তির কারণ ।

গর্ভাশয়স্থ বীজ (শুক্র ও আর্তব শোণিত) গর্ভাশয়স্থ বায়ু কর্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইলে দুই জীবের সঞ্চার হইয়া থাকে । (৫৮) এবং ঐ বীজ বায়ু দ্বারা বহু ভাগে বিভক্ত হইলে একদা বহু সন্তানও উৎপন্ন হইতে পারে । (৫৯)

গর্ভের প্রাতিমাসিক বিবরণ ।

গর্ভাশয়ে প্রথমতঃ যাদৃশ শুক্র ও আর্তব শোণিত সংযুক্ত হয়, গর্ভের প্রথমমাসে দ্রবীভূত বীজ প্রায় তাদৃক্ ভাবেই অবস্থিতি করে । (৬০)

গর্ভের দ্বিতীয় মাসে শুক্র ও আর্তব শোণিতের ভূতপরমাণু সমূহ বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘনীভূত হয় । অনন্তর সেই ঘনীভূত পদার্থ, শুক্রাধিক্য হেতু পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে পুঞ্জ, আর্তবাধিক্য হেতু দীর্ঘাকারে পরিণত হইলে কন্ডা, এবং উভয়ের নাগ্যাবস্থা হেতু অর্কুদাকারে (গোলাকৃতি ফলের অর্ধখণ্ডাকারে) পরিণত হইলে নপুংসক সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ।

[৫৮] বীজেহস্তর্বাযুনাভিন্নে ধৌ জীবৌ কৃক্ষিমাগর্তৌ ।

যথাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতর পুরঃ সন্তৌ ॥

(সূত্রাত সংহিতা)

৫৯] “—শুক্ৰার্ভবে পুনর্বাযুনা বহুশোভিনে যথাস্বংবহুপত্যতা ॥”

(বাগ্ভটঃ)

[৬০] গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্শুক্রং তথার্ভবং । তাদৃগেব দ্রবীভূতং
প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি ॥ (হাবপ্রকাশঃ)

তৃতীয় মাগে হস্ত দ্বয়, পদ দ্বয়, ও মস্তক এই পঞ্চ অবয়বের পাঁচটি স্থল পিণ্ড জন্মে, এবং তাহাতে সূক্ষ্মরূপে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ হয় । (৬১)

চতুর্থ মাগে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় । এবং এই অবধিই চেতনাধার হৃদয়ের প্রকাশ হেতু চৈতন্যেরও প্রকাশ হয় । এবং গর্ভাশয়স্থ আগ্নের ভোগে অভিলাষ জন্মে । এই অবধিই গর্ভিণীর দেহ তুই হৃদয় (আপনার ও গর্ভাশয়স্থ আগ্নের) বিশিষ্ট বলিয়া তাহাকে দৌহদিনী এবং তাহার তৎকালিক অভিলাষকে “দৌহদ” বলা যায় ।

এই সময়ে গর্ভিণীর যে যে বস্তু ভোগে অভিলাষ জন্মে, যথা লাভ তাহা প্রদান করা উচিত । কারণ, বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিলে সম্ভান বীৰ্য্যবান, গুণবান, ও দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে ।

বাঞ্ছিত বস্তুর অলাভ হইলে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়েরই কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা । (৬২)

(৬১) দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈরতিপচ্যমানানাং মহাভুতানাং সংঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে । যদি পিণ্ডঃ পুমান্ স্ত্রী চেৎ পেশী নপুংসকক্ষেদর্কুদগিতি । তৃতীয়ে হস্তপাদ শিরসাং পঞ্চপিণ্ডকাঃ নির্কর্ত্তন্তে । অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগশ্চ সূক্ষ্মোভবতি ॥ (সূত্রান্ত সংহিতা)

(৬২) চতুর্থে নর্কীঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগঃ প্রযুক্ততরো ভবতি । গর্ভধনয় প্রযুক্তভাবে চেতনাধাতুরতিব্যক্তো ভবতি কস্মাত্তৎস্থানত্যাৎ গর্ভশ্চতুর্থে মাস্যতিপ্রায়ং ইন্দির্যার্থে কুরোতি দ্বিষদমাংসনারীং দৌহদিনী মাচক্ষতে । + + তস্মাৎ সা যদ্যদিক্ষেত্বং তৈস্য দাপয়েৎ । লব্ধদৌহদাহি বীৰ্য্যবন্তং চিয়ায়ুযঞ্চ পুত্রং জনয়তি ।

+ + সা শ্রীশ্চ দৌহদাপুত্রং জনয়েত শুণাশিতং ।

অলব্ধদৌহদা গর্ভে লভেতাকানি বাভয়ং ॥

(সূত্রান্ত সংহিতা)

(ବାମ୍ବୁ ଡ଼େ)

অষ্টম মাসে ওজঃ ধাতুঃ (রসাদি শুক্রাস্ত সপ্ত ধাতুর মারভাগ জননী হইতে ভ্রূণে এবং ভ্রূণ হইতে জননীতে পুনঃ পুনঃ সংগঠিত হয় । এই মাসে সন্তান ভ্রূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই জীবিত থাকে না । কারণ তাহার শরীরে ওজঃ ধাতুই জীবনের প্রধান অবলম্বন, তদভাবে জীবিত থাকা অসম্ভব । (*)

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসেই সন্তান ভ্রূমিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত কাল । গর্ভ কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলে ইহা অপেক্ষা অধিককাল গৌণেও ভ্রূমিষ্ঠ হইয়া থাকে । (৬৪)

গর্ভশোষের কারণ ও লক্ষণ ।

গর্ভস্থ ভ্রূণ, জাত মার ও বর্দ্ধিত হইলেও যদি গর্ভিণীর পরিহার্য অহিত ব্যবহাবাদি দ্বারা গর্ভিণীর জননেদ্রিয় হইতে রক্তাদি পরিশ্রুত হয়, তবে উক্ত ভ্রূণ তদবধি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং গর্ভিণীর উদরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ; সাধারণত ইহাকে “ উপবিষ্টক ” বলিয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় প্রায় সর্বদাই গর্ভকোষ্ঠ মধ্যে ভ্রূণের সঞ্চালন অনুভূত হয় ।

(*) এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যদি অষ্টমমাসে ওজঃ ধাতু সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, এবং ভ্রূণশরীরে সম্যকরূপে অবস্থিত থাকে, তাহাহইলে অষ্টমমাসে প্রসূত সন্তানও জীবিত থাকিতে পারে ।

(৬৪) অষ্টমেন্দ্রিয়ী ভবত্যোজঃ তত্র জাতশ্চৈব জীবৎ নির্যোজজা-
নৈঋতভাগহাচ্চ । ততো X -+ নবমদশৈকাদশদ্বাদশানামন্যতমগ্নিন্
জ যতে অতোহন্যাথা বিকারীভবতি ॥

(স্মৃতি সংহিতা)

অপিচ গর্ভাশ্রয় অতিশয় শোক, উপবাস ও রক্ষাদি সেবন
করিয়া অন্য কোনও কারণ বশতঃ জননেদ্রিয় হইতে রক্তাদি
পরিষ্কার হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভাশ্রয় জগকে ক্রমশঃ ক্রম
ও শুষ্ক করিতে থাকে, সুতরাং গর্ভাশ্রয় বর্ধিত উদরও ক্রমশঃ
ক্ষীণ হইয়া যায়, সাধারণত ইহাকে “নাগোদর” বলিয়া থাকে ।
এইরূপ অবস্থায় গর্ভকোষ্ঠগর্ভের অনেক বিশেষ জ্ঞানের সাধন
অনুভূত হয় । (৬৫)

পূর্নোক্ত অবস্থাপন্ন গর্ভ প্রসবের নিয়মিত সময় অতীত হইলেও
কাল গোণে শক্তিকষ্টে ভ্রূমিষ্ট হইয়া থাকে, অথবাকোন কালেও
প্রসব হয় না । (৬৬)

গর্ভপাতের কারণ ও লক্ষণ ।

ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় যে সমস্ত আহার ও আচরণ কর্তব্য
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে; তাহা সেবন করিলে কিম্বা কোন প্রকার
অভিব্যক্ত কিম্বা বিষমাশন (পরিমিতের অধিক বা অল্প ভোজন
ও অকালে ভোজন) কিম্বা অন্য কোন প্রকার পীড়া দ্বারা গর্ভ
আহত হইলে অকালেই গর্ভপাত হইয়া থাকে । (৬৭)

(৬৫) সংজাতস্যরে মহতি গর্ভে যোনিপরিষ্কাৎ ।

বৃক্ষিমগ্রাপ্লবন্ গর্ভঃ কোষ্ঠে তিষ্ঠতি সক্ষুরঃ ।

উপবিষ্টকমাত্তঃ বর্ধতে তেন নোদরঃ ॥

শোকোপবাসরক্ষাদৈৱথবা যোনিপরিষ্কাৎ ।

বাত্তে ক্রুদ্ধে ক্রমঃ শুযোৎ গর্ভে নাগোদরস্ত তৎ ॥

উদরঃ বৃদ্ধমপ্যত্রহীৱতে ক্ষুরণং চিরাত্ ॥ (বাগ্ভটঃ)

(৬৬) “—অন্যথা বর্ষগর্ভে কৃচ্ছ্রাজ্জায়তে নৈব বা ।” (বাগ্ভটঃ)

[৬৭] “++ এতিগর্ভশ্চাবেতাস্যঃ কৃচ্ছ্রো শুযোন্ম্রিয়েত বা ।” (বাগ্ভটঃ)

গর্ভে বিষমাশনপীড়নাদৈঃ পক্ষং জন্মাদিব ফলং পততি ক্ষণেন ।

(কৃষ্ণিনিশ্চয় সংগ্রহঃ)

গর্ভপাত হওয়ার পূর্বেই প্রথমতঃ জননেত্রিয়া হইতে বেদনার
সহিত রক্ত প্রাব হইতে থাকে, তৎপরে গর্ভপাত হয়। (৬৮)

গর্ভাশয়ের মধ্যে জ্ঞানের মৃত্যু হওয়ার
কারণ ও লক্ষণ ।

মানসিক উপত্যাপ (ধন বন্ধু বিনাশাদি জন্য) কিম্বা আগন্ত
উপত্যাপ (আঘাতাদি জন্য) কিম্বা অন্য কোন প্রকার উৎকট পীড়া
দ্বারা গর্ভিনী পীড়িত হইলে এবং দোষ বর্জিত নিষিদ্ধ আহার ব্যব-
হারাদি করিলে গর্ভাশয় মধ্যেই জ্ঞানের মৃত্যু হইতে পারে। (৬৯)

উক্ত প্রকারে জ্ঞানের মৃত্যু হইলে গর্ভিনীর উদর শীতল শুষ্ক
আঘাত (ক্ষত) বেদনাবৃত্ত, ও নিশ্পন্দ হয়, এবং গর্ভিনীর ভ্রম, ভ্রুশা,
ক্লান্তি, বিষমতা, নিশ্বাসত্যাগে নিতান্ত ক্লেশ ও নেত্রদ্বয় কোটরগত
হয়। এবং স্বাভাবিক প্রসবকালে যেসকল বেদনার উদ্ভব হইয়া
থাকে, মৃতগর্ভার তাহুক বেদনার উদয় হয় না। (৭০)

অপিচ মৃতগর্ভা রোগীর শরীরে শোণ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত
হইয়া থাকে। (৭১)

[৬৮] গর্ভে পততি রক্তস্য সমূলং দর্শনং ভবেৎ ॥

(কৃৎসিঞ্চয় সংগ্রহঃ)

[৬৯] মানসাগন্তভিস্তুকপতাপৈশ্চ পীড়িতঃ ।

গর্ভে বাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিভিষ্চ অপীড়িতঃ ।

(স্বপ্নাতগংহিতা)

[৭০] গর্ভেহতিদোষোপচয়াদপথৈর্দৈবতোহপি বা ।

মৃত্যেহস্তরূদরং শীতং শুষ্কং দ্বাতং ভ্রমব্যগং ।

গর্ভাপ্পানো ভ্রমভ্রুশা ক্লান্তিঃ ক্লেশঃ ক্লমঃ ।

অরতিঃ প্রসূতেনৈবমাধীনামগমুত্তমঃ ॥

(বাগুভটঃ)

মূঢ়গর্ভের কারণ ও লক্ষণ ।

নানাবিধ কারণে গতিগীর শরীরস্থ বায়ু দূষিত ও প্রাণিত হইয়া প্রাণবোম্বুখ জ্বালাকে বিকৃতভাৱে বহুত প্রাণত প্রাণবের ব্যাঘাত করিয়া থাকে, ঐদৃশ সংনিরুদ্ধ গর্ভকেই মূঢ়গর্ভ বলা যায় ।

ঐদৃশ মূঢ়গর্ভ নানাবিধ বিকৃতভাবে বোনিগধ্যে কিম্বা ঘরে সংগত হইয়া থাকে ।

মূঢ়গর্ভের সমস্ত প্রকার গতি সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা স্মৃতিতন্ত্রমধ্যে প্রদানতঃ অষ্টপ্রকার মূঢ়গর্ভগতি এখানে বিবৃত হইতেছে । (৭২) যথা,—

১। প্রাণবোম্বুখ কোন জ্বাণের প্রথমতই সন্ধিহীন বহির্গত হইয়া পড়ে, অন্য সমস্ত অঙ্গ অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে ।

২। কোন জ্বাণের এক সন্ধি জননেত্রিয়নুখে বহির্গত হয়, কিন্তু অপর সন্ধি বক্রভাবে অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকে ।

৩। কোন জ্বাণের সন্ধি ও অন্য শরীর বক্রভাবে অভ্যন্তরে থাকিয়া কেবল নিতম্বদেশে তীক্ষ্ণভাবে আসিয়া বোনিবারে নিরুদ্ধ হয় ।

৪। কোন জ্বাণের বক্ষঃস্থল অথবা পার্শ্বদেশ অথবা পৃষ্ঠদেশ অগ্রে আসিয়া প্রাণবহার বন্ধ করে ।

৫। কোন জ্বাণের এক বাহু বহির্গত হইয়া পড়ে, অন্য সমস্ত অঙ্গ অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকে ।

[৭১] ভবদ্যুচ্ছ্রাস প্ৰাতঃশূন্যভাস্তমূর্তে শিখো । (স্মৃতিতন্ত্রং ৭) ।

[৭২] “—তমেব কদাচিৎপদমমগতমপ্যপমমুপ্রাপ্তমনিগম্য-
মানমপানৈবগুণ্যমস্মৈহিতং গর্ভং মূঢ়গর্ভমিত্যচক্ষতে ॥ স যদা বিকৃতানি-
প্রাণীভূতমপত্যপথমনেকধা প্রতিপদ্যতে তদা সংখ্যাংসীয়েতে ॥”

(স্মৃতিতন্ত্রং ৭)

৬। কোন জ্ঞানের বাহ্যিক অঙ্গে বহির্গত হইয়া পড়ে কিন্তু ভিত্ত
বাহ্যদ্বয়ের মধ্যে জ্ঞানের মস্তক মতভাবে বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞানবাহ্য
রুদ্ধ করে ।

৭। কোন জ্ঞানের হস্ত, পদ ও মস্তক একত্রে বহির্গত হইয়া
পড়ে, কিন্তু অন্য সমস্ত শরীর বক্রভাবে অভ্যস্তরূপে বদ্ধ থাকে ।

৮। কোন জ্ঞানের এক সন্ধি জননেত্রিয় পথে বহির্গত হয়
কিন্তু অপর সন্ধি মলদ্বার অভিমুখে ঘাইয়া আবদ্ধ হয় । (৭৩)

পূর্বে যে অষ্টপ্রকার মূঢ়গর্ভগতি উল্লিখিত হইল এতদ্ব্যতীত শেষ
দুইপ্রকার গতি একেবারে অসাধ্য অন্য চয় প্রকার গতি বধা
নিহিত চেষ্টা দ্বারা প্রতীকৃত হইতে পারে কিন্তু যদি গর্ভিণীর ইন্দ্রিয়
শক্তি বিকৃত হয় কিম্বা আক্ষেপক (খোঁচনী) রোগ জন্মে, অথবা
যোনিভ্রংশ কি যোনিস্বরণ কি মক্কলশূল রোগ কিম্বা কাস, শ্বাস
ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে তবে উক্ত ছয় প্রকার সাধ্যগতি ও
অসাধ্য হইয়া থাকে । (৭৪)

অপিচ যে মূঢ়গর্ভিণীর মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, কিম্বা অঙ্গ-
সমূহ সম্পূর্ণ শীতল হইয়া যায়, কিম্বা রোগী সুলভ আভাবিক বস্তু

[৭৩] তত্র কচ্চিদ্বাতাং সন্ধিভাং যোনিমুখং প্রতিপদ্যতে । কচ্চি-
দাভ্যুতৈকসন্ধিবেকেন । কচ্চিদাভ্যুগসন্ধি শরীরঃ ফিন্দেশেন তিষ্ঠাণাগতঃ
কচ্চিভূতঃ পার্শ্বপৃষ্ঠানামন্যতমেন যোনিধারং গিধায়াবতিষ্ঠতে । অন্তঃ পার্শ্ব-
পবুস্তশিরাঃ কচ্চিদেকেন বাহন । কচ্চিদাভ্যুগশিরাঃ বাহ্যদ্বয়েন কচ্চিদাভ্যুগ-
মধ্যে হস্তপাদশিরোভিঃ । কচ্চিদেকেন সন্ধু যোনিমুখমভিপ্রতিপদ্যতে
অপরেণ পায়ুগিতাষ্ট্রৈ মূঢ়গর্ভগতিক্রমিষ্ট্রৈ সমাসেন । (সুশ্রুতসংহিতা)

[৭৪] তত্র বাবস্ত্যবস্যাণ্যো মূঢ়গর্ভো মেঘামপি : বিপনীতৈজিয়ার্থা-
ক্ষেপকযোনিভ্রংশস্বরণমক্কলশ্বাসকাসভ্রমনিপীড়িতান্ পরিহরেৎ ।

(সুশ্রুতসংহিতা)

একেনাশে নিরোহিত হয়, কিংবা কক্ষিগম্যে নীলবর্ণ শিরা সমূহ সমুদগত দেখা যায়, তাহার নিশ্চয় জ্ঞানসহ জীবন বিনাশ্ত হইবে । (৭৫)

পূর্বে যে মুদগভগতি উল্লিখিত হইল এতদ্বির প্রাকৃত প্রসবে ও তিনপ্রকার গভগতি রুদ্ধহইতে পাবেন ; যথা আগের মস্তক কক্ষ-
দেশ ও জঘনস্থান নির্গমনদ্বার অপেক্ষা পরিমাণে অধিক স্থল
হইলে ঐ ঐ অক্ষরদ্ধ হইয়া প্রসব ক্রিয়ার ব্যাঘাত করিয়া
থাকে । (৭৬)

স্মৃতিকাগৃহ ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে নবম মাস অবধিই গর্ভস্থ সন্তানের
ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত কাল ; অতএব নবম মাসের পূর্বেই স্মৃতিকা
গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্তব্য । (৭৭)

অস্থি কণ্টকাদিরহিত, মনোজ্ঞ ও প্রস্তুত ভূমিভাগে অষ্টহস্তদীর্ঘ
ও চতুরহস্ত প্রশস্ত, পূর্নদ্বার অথবা দক্ষিণদ্বার বিনাশ্তে নিম্নলিখিত
সর্বপ্রকার উপকরণ সম্মান উপলিখুভিত্তি বিনাশ্তে ও রক্ষামঙ্গল সংযুক্ত
স্মৃতিকাগৃহ নির্মাণ করা বিধেয় । (৭৮)

[৭৫] প্রবিধ্যতি শিরো যাতু শীতাজী নিরপজপা ।

নীলোদগত শিরাহস্তি সা গর্ভে ম চ তং তথা ॥

(স্মৃতিসংহিতা)

[৭৭] স্তবাবগতা অপি ত্রয়ঃ সঙ্গা ভবন্তি । শিরসো বৈগুণ্যাদংসরো
জঘনস্য বা ॥

(স্মৃতিসংহিতা)

[৭৭] প্রাক্ চৈবাস্যা নবমাস্যাস্য স্মৃতিকাগারং কারয়েৎ ।

(চরকসংহিতা)

[৭৮] অপহৃত্যস্থি শর্করা বালাদিকঃ প্রশস্তরূপবসনক্কায়াং ভূমৌ ॥

(চরকসংহিতা)

উপলিখুভিত্তিঃ সুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রাক্ দ্বারং দক্ষিণ দ্বারং বা অষ্টহস্তা-
য়তং চতুর্হস্তবিস্তৃতং রক্ষামঙ্গলসম্পন্নং বিধেয়ং ॥

(স্মৃতিসংহিতা)

স্মৃতিকাগৃহের উপকরণ ।

বস্ত্র, অলপনজবা, আচ্ছাদন, অগ্নি, জল, মলমূত্রভ্যাগ স্থান, স্নান ও আচানের স্থান, ঘৃত, তৈল, নৈঋব, সুরা, প্রসূর, শঙ্গ, খট্টা, অগ্নিসঙ্ক্ৰমণকাঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জব্বাদি স্মৃতিকাগৃহে সংগৃহীত রাখা আবশ্যক । (৭৯)

প্রাকৃত প্রসবের লক্ষণ ।

গর্ভাশয় মধ্য জ্ঞান দ্বয়ং বক্রভাবে নিম্ন অভিমুখে মস্তক রাখিয়া শয়ান থাকে । এবং প্রভাবতঃ প্রসবকালে অগ্রে মস্তক নির্গত হইয়া থাকে । ইহাকেই প্রাকৃত প্রসব বলা যায় । (৮০)

চরক সংহিতাকার বলেন যে প্রসবকালের পূর্বে গর্ভস্থ শিশু জ্ঞানীয় পৃষ্ঠাভিমুখে মুখ রাখিয়া উর্দ্ধমস্তকে অঙ্গ সমূহ সংকুচিত করিয়া অনস্থিত থাকে । প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্বে বায়ুদ্বারা পরিবর্তিত হইয়া নিম্নমস্তক হয় । এবং তদনন্তর প্রসবদ্বারে সমাগত হইয়া থাকে । (৮১)

শ্রীহরিশোহন দাস গুণ কবিরাজ ।

(ক্রমঃ)

[৭৯] ভদ্রমনালোপনাছাদনপিত্তানসম্পাদুপেতং বাস্তহ্যায়যোগাগ্নি-
গলিলোদুগলবর্চঃস্থানস্নানভূমিস্থানসমুদুসুখং তত্র মপিষ্টৈস্তলমধুনক
নৈঋব X + সুরাগবাঃ সন্ধিহিতাঃ সূর্যঃ তথাস্থানো + + শঙ্গাণি চ
তীক্ষ্ণয়সানি দ্বৌ চ বিষময়ো পর্য্যকৌ তৈন্দুকেজুদানি চ কাষ্ঠাচ্চগ্নিসঙ্ক-
ক্ষণানি দ্বিষশ্চবহ্ন্যা বহ্নশঃ প্রজাতাঃ ইত্যাদি ॥ (চরকসংহিতা)

[৮০] আভুগোহভিমুখঃ শেতে গর্তো গর্ভাশয়ে জিয়াঃ ।

স যোনিং শিরসা য়তি স্বভাবাৎ প্রসবঃ প্র'ত ॥ (স্মৃতিকাগৃহে)

(৮১) গর্ভস্থ থলুগাতুঃ পৃষ্ঠাভিমুখঃ উর্দ্ধশিরাঃ সংকুচ্যমানাঃ স্তে অস্তঃ কৃষ্ণে-
ব্যপগতপিত্তানাসুঙ্কঃ +-+ ম চোপস্থিতকালে জগ্নানি প্রসূতে মাক্তত যোগাৎ
পরিবৃত্তাবাকুশিরা নিকৃামত্যাণত্যাণথেন এবা প্রকৃতিঃ ॥ (চরকসংহিতা)

আয়ুর্বেদে শরীর তত্ত্ব ।

—0—

অস্থির কার্য ।

অস্থিই শরীরের প্রধান সার ; অস্থিই শরীরের স্থিরাংশ, অস্থি
সমূহ অবলম্বন করিয়াই এই মাংসাদিগর দেহ প্রিয়মাণ আছে
আচার্য্য সুশ্রুতমুনি বলিয়াছেন যে,—

“অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈ র্যথা তিষ্ঠন্তি ভুরুহাঃ ।

অস্থিসারৈস্তথা দেহা প্লুয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্ ॥

তন্মাস্তিরবিনষ্টেষু স্ফাৎসেষু শরীরিণাম্ ।

অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্ ॥

মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি সিরাদিঃ স্নায়ুভিস্তথা ।

অস্থীন্যাশ্রয়নং কৃত্বা ন শীর্ষ্যন্তে পতন্তি চ ॥”

যেমন রক্তের অভ্যন্তরে সার (স্থিরাংশ বা কঠিন) পদার্থ
থাকে ; সেই সার-পদার্থের বলে তাহারা যেমন স্থিত থাকে, প্রিয়মাণ
থাকে, তেমনি এই শরীরাত্মক্রে অস্থিরূপ সার বা কঠিন পদার্থ
বিদ্যমান থাকায় তদ্বারা এই দেহ প্রিয়মাণ থাকে । শরীরের
স্বক্ মাংস ও সারা প্রভৃতি চিরবিনষ্ট হইলেও অস্থিসকল নষ্ট হয়
না । কেননা অস্থিই এই পুঙ্কাল দেহের সার বা স্থিরাংশ স্বরূপ ।
সারভূত অস্থিসকল মাংস, সারা ও স্নায়ুর দ্বারা আবদ্ধ আছে ।
অস্থি অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়াই তাহারা শীর্ণমান হয় না,
বিচলিত-না স্থানভ্রষ্ট হয় না ।

এই সকল সিদ্ধান্ত কথান দ্বারা বুঝা যায় যে, অস্থিই দেহের ভার বহন করে, অস্থিই মাংসাদি জন্মের আশ্রয় এবং অস্থিই ভুক্ত জন্মের পবিত্রমোৎপন্ন রসাদি ধাত্বন মাত্র । মারু-বিধায় অস্থি কঠিনপদার্থ বটে, পরন্তু তাহা নিবেট নহে । অস্থিগাত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, যে সকল ছিদ্র, ছিদ্রানুরূপ সূক্ষ্ম নাড়ীগয়ী প্রাণালীর দ্বারা পরিপূর্ণ । মধ্যে মজ্জা, বাহিরে নাড়ীগয় মেদগ বিলি ; সুতরাং অস্থিবহির্ভাগস্থ মেদোদাত্তর মার পদার্থ সকল পিত্ততাপে পাক প্রাপ্ত ও নিকাশিত হইয়া অস্থি নামক মার পদার্থ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় এবং অস্থির মারশেষের দ্বারাও মজ্জাদাত্তর উৎপত্তি হওয়ার ব্যাঘাত হয় না ।

অস্থিক-পদার্থনিচয় ।

ইংরাজ ডাক্তারেরা বলেন, অস্থিতে শত অংশ মধ্যে $\frac{৩৩}{১০০}$ অংশ জিলেটিন Gelatine এবং $\frac{৩৩}{১০০}$ অংশমধ্যে কস্ফেট Phosphates কার্বনেট অব লাইম Carbonate of lime আছে । আগাদের পুরাতন আচা র্যোরা এই সকল নাম-সন্ধেতের পরিবর্তে অন্যবিধ নাম-সন্ধেতের ব্যবহার করিতেন । তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, “তস্য যঃ পুৰিষ্টো ভাগঃসদস্থি ।” অর্থাৎ খাদ্যজন্য পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে যে রসাত্ত উৎপন্ন হয়, সেই রসমাত্তন সুলভম সাবংশ সকল অস্থি-উৎপাদন জন্য উন্নীত হয় । এই কথার দ্বারা আমরা এখন এই মাত্র বুঝি, এ পানি যে, প্রথমতঃ পঞ্চভূতাত্তক খাদ্যজনের রসপরিণাম হয়, পরে রক্তপরিণাম, রক্তের মাংস পরিণাম, মাংসের মেদঃ-পরিণাম মেদের অস্থি পরিণাম হইয়া থাকে; কাষে কাষেই স্থিত হয় যে, অস্থিতে পিত্তদক্ষ সুলভত্বই বিদ্যমান থাকে । অর্থাৎ

পিত্তদক্ষ পার্শ্ববাণু সকল পাকসংঘাত মূর্তিতে বিদ্যমান থাকে এবং তৈজসিক রসেনব যোগ বা অংশ থাকায় যৎকিঞ্চিৎ তৈজস বিকাব এবং যৎকিঞ্চিৎ পিত্তদক্ষ আপ্য পরমাণু এই ত্রিবিধ পরমাণুই বিদ্যমান আছে । সেই জন্যই অস্থিতে অগ্নি সংযোগ করিলে আপ্য অংশ ও তৈজস অংশ পৃথক হইয়া যায়, কেবল দক্ষপ্রায় ভৌম অংশই অনশিষ্ট থাকে । সেই দক্ষ ভৌম অংশ সকল এক্ষণে অঙ্গার ও চুণ নামে বিখ্যাত ।*

অস্থির প্রবন্ধন ও উৎসৃষ্টি ।

অস্থির বৃদ্ধিশক্তি আছে এবং তাহার উৎসৃষ্টি অর্থাৎ অঙ্গুরণ শক্তিও আছে । সেইজন্যই ভাঙ্গা হাড় যোড়া লাগিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে অস্থি বৃদ্ধি রূপ বোগ বিশেষ জন্মিতে দেখা যায় ।

পূর্বেই বলাহইয়াছে যে, ভগ্নসন্ধান জ্ঞানার্থ অস্থির উপাদানিক তত্ত্ব জানা আবশ্যিক । অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে কেন ও কি প্রকার তাহা সন্ধিত হয়, অর্থাৎ যোড়া লাগে এবং কেনই বা অস্থিবৃদ্ধিরূপ রোগ জন্মে, এসকল তথ্য চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য । মহামুনি সুশ্রুত এবং আচার্য্য চরক অনেক শত অস্থি পোষক ও

* শুড়, জল, মধুক পুষ্প ও বৃক্ষ বিশেষের ত্বক ও মূল প্রভৃতি এক ত্রিত করিয়া তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে যেমন বীৰ্য্যবান্ সারাংশ উৎখিত হয়, ভুক্তজীব্যের পরিপাক হইলে তাহা হইতেও এক প্রকার সারাংশ নিকশিত হয় ।

জীব্যের স্বল্প অংশ অর্থাৎ তৈজস ও বায়বীর অংশ শীঘ্রই বিলিষ্ট হইয়া উড়িয়া যায় ; কেবল স্থবিষ্ট পার্শ্ববাংশই থাকে এবং তাহাই দৃষ্টিগোচর হয় । কাঠিন্য গুণটি ক্ষতিভূত ভিন্ন অন্য ভূতে নাই । এই সকল কারণে গর্ভোপ-নিষদ প্রভৃতিগ্ৰন্থে অস্থিকে খাদ্যজীব্যের স্থল ভাগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।

তাহার উৎপত্তি কারক জ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল জ্বরের কথা আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বলিব। অস্ফিভঙ্গ, অস্ফি শোষ, অস্ফি বৃদ্ধি প্রভৃতি আস্ফিক বিকার উপস্থিত হইলে চিকিৎসকগণ সেই সেই জব্য অভ্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদীয়সংযোগক্রিয়াবিজ্ঞান ।

ARYA CHEMISTRY.

—o—

প্রথম প্রস্তাব ।

পূর্বে এই বিদ্যা বা এই বিজ্ঞান “সংযোগাপূর্ববিজ্ঞান” ও “সংযোগক্রিয়াবিজ্ঞান” এই দুই নামে প্রচারিত ছিল । যথা,—

“ধাত্বোষধীনাং সংযোগক্রিয়াজ্ঞানং কলা স্মৃতা ।”

“সংযোগপূর্ববিজ্ঞানং ধাত্বাদীনাং কলা স্মৃতা ।”

[ঔশাননসীনীতি, ৪,৩,৫।

সকলেই জানেন যে, পূর্বে আমাদের দেশে ৬৪ ছোষটি প্রকার কলা বিদ্যা প্রচারিত ছিল । কলা বিদ্যা কি ? কলাশব্দের অর্থ কি ? আজ্ কাল তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত আছে । কলা শাস্ত্র চৌষটি প্রকার ; কিন্তু তাহার এক প্রকারও আজ্ কালকার লোকে জানে না । কাষেই আমাদেরকে প্রস্তাবিত “সংযোগ-ক্রিয়াবিজ্ঞান” বিদ্যার বিষয়বিস্তারের পূর্বে কলা বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে হইতেছে ।

মহর্ষি ঔশনা কলা-বিদ্যার লক্ষণ ও কলা-শব্দের অর্থ উত্তম-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । যথা,—

“পৃথক্ পৃথক্ তু বিদ্যানাং লক্ষণং সম্প্রকাশিতম্ ।

কলানাং ন পৃথগ্গাম লক্ষ চাস্তীহ কেবলম্ ॥

পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্ত জায়তে ।

যাং যাঃ কলাং সমাপ্রিত্য তন্নাস্তা জাতিরুচ্যতে ॥” (ঐ)

পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যার অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য ও মীমাংসাদির পৃথক্ পৃথক্ নাম ও লক্ষণ বলা হইল ; পরন্তু কলাসমূহের উপর কোন

এক নির্দিষ্ট নাম নাই; কেবলমাত্র তাহার কয়েকটি লক্ষণ আছে । ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য জন্মে; সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কলা প্রখ্যাত হইয়া থাকে । এই লক্ষণের দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে কলা বা যদ্বিময়ক ক্রিয়া অবলম্বনে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, অর্থাৎ যে ক্রিয়াশিল্প সম্পন্ন হইবে, সে শিল্প বা সে কলা সেই নামেই অভিহিত হইবে । এতদনুসারে পাক ক্রিয়ার কৌশলকে পাকবিজ্ঞান, পাকবিদ্যা বা পাক কলা বলা যায় এবং সংযোগক্রিয়ার কৌশলকে সংযোগ ক্রিয়াবিজ্ঞান বা সংযোগিকী কলা বলা যায় ।

ঐক্যপে ৬৪ চৌষটিউপকাব কলা বিদ্যা এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু সে সকল কলা এক্ষণে অন্যনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সঙ্গীতবিদ্যা এক প্রকার কলা বিদ্যা; কিন্তু কে তাহাকে কলা-বিদ্যা বলিয়া জানে; ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজী এক প্রকার কলা বিদ্যা; কিন্তু কে তাহাকে কলাবিদ্যা নামে উল্লেখ করে? নাট্যও এক প্রকার কলা, কিন্তু কেহই তাহাকে কলা বলিয়া জানে না । এইরূপ, আরও অনেক কলাবিদ্যা আছে; থাকিলেও সে সকল আজ কাল কলা নামে পরিচিত নহে । বৈদ্যের নিকট দশ প্রকার কলা বা ক্রিয়াশিল্প বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহারা সে সকলের কলা নাম ভুলিয়া গিয়াছেন । তাহারা যে মদ্য, আসব ও সুরা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন, তাহা প্রোক্ত চৌষটি প্রকারের এক প্রকার । তাহারা যে শারীর-শল্য উদ্ধৃত করিবার উপায় জানেন তাহাও একপ্রকার কলাবিদ্যা । শিবান্যধ ও ব্রণচ্ছেদ তাহানই অন্তর্গত । পূর্বে রসসংযোগ পানকযোগ ও ঔষধপাক, সম্পাচন কলানামে খ্যাত ছিল কিন্তু বৈদ্যগণ এখন আর উক্ত ক্রিয়াসমূহকে কলা নাম দিতে চাহেন না । রক্ষাদির গুণবর্দ্ধনক্রিয়াও প্রোক্ত চৌষটি কলার অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু বৈদ্যগণ তাহা এখন ভুলিয়া

গিয়াছেন । প্রাস্তব, ধাতু, পশুশৃঙ্গ ও পাশবচর্ম প্রভৃতি ভস্ম করিবাব উপায় সকল পূর্বে কলা নামে খ্যাত ছিল ; কিন্তু বৈদ্যগণ স্বহস্তে ঐ সকল কর্ম করিয়াও তদ্বিদ্যাকে কলা বিদ্যা বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না । ইক্ষুবিকার ও তিলবিকার প্রভৃতির ক্রিয়াজ্ঞান ও চৌষটি কলাব মধ্যে নিবিষ্ট, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহার কলা নাম জ্ঞানেন না । ৬৪ কলার মধ্যে ধাতুদ্রব্যের ও উদ্ভিজ্জগণের সংযোগ-বিযোগক্রিয়া ও তদ্বিসয়ক বিজ্ঞান “সংযোগক্রিয়াজ্ঞান” নামে কথিত হইয়াছে, অথচ, বৈদ্যগণ উহার কলা নাম জ্ঞানেন না । ধাত্বাদি দ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হইলে তাহা হইতে এক অপূর্ণ অর্থাৎ অভিনব গুণ বা শক্তি উদ্ভূত বা প্রকটিত হয়, তদদর্শনে পূর্বকালের ঋষিরা তদ্বিসয়ক বিজ্ঞানকে “সংযোগাপূর্ববিজ্ঞান” নাম দিয়া কলাবিদ্যার মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন, পরন্তু এখনকার বৈদ্যেরা উহার কলা নাম ভুলিয়া গিয়া নির্মাণ করিয়া ভুলিয়াছেন এবং “সংযোগাপূর্ববিজ্ঞান” এই অর্থ নামটিও ভুলিয়া গিয়াছেন । ক্ষার নিষ্কাশন করা, মার আকর্ষণ করা, নির্যাস উৎকর্ষণ করা, এ গুলিও কলাবিদ্যার অঙ্গ এবং প্রত্যেক বৈদ্য উহা জ্ঞাত আছেন, অথচ ঐ কার্যকে তাহারা কলাশিল্প বা কলা বিজ্ঞা বলিতে জ্ঞানেন না । এই দশ প্রকার কলা বা ক্রিয়াশিল্প পূর্বে যে আয়ুর্বেদের প্রধান অঙ্গ ছিল—উশানা মূনি তাহা সুস্পষ্ট রূপে বলিয়া গিয়াছেন । যথা,—

মকরন্দানবাদীনাং মদ্যাদীনাং কৃতিঃ কলা ।

শল্যগূঢ়াহতো জ্ঞানং শিবাব্রণব্যাধে কলা ॥

হীনাতিরসসংযোগান্নাদিসম্পাচনং কলা ।

রক্ষাদিপ্রাণবারোপপালনাদিকৃতিঃ কলা ॥

পাষণধাত্বাদিদৃতিস্তদ্রস্মকরণং কলা ।

যাবদিক্ষু বিকারাণাং কৃতিজ্ঞানং কলা স্মৃতা ॥

ধাত্বোষধীনাং সংযোগক্রিয়াজ্ঞানং কলা স্ম তা ।

সংযোগাপূর্ববিজ্ঞানং ধাত্বাদানাং কলা স্ম তা ॥

ক্ষাবনিষ্কাশনজ্ঞানং কলাসংজ্ঞস্ত তৎ স্মৃতম্ ।

কলাদশকমেতদ্বৈ হ্যায়ুর্বেদাগমেষু চ ॥”

[ঔশনসী নীতিসংহিতা, ৪, ৩ প্রা ।

নাম জানা না থাকিলেই লোকে চির বিজ্ঞাত বস্তুকে জানি না বলিয়া পরিচয় দেয় । এক জন বিখ্যাত বৈদেশিক পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, “আমি ৪০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর গড়ে কথা বার্তা করিয়া আসিয়াছি ; কিন্তু গদ্য কি তাহা জানিতাম না, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ।” পণ্ডিত যেমন নিত্য উচ্চাৰ্য্য গদ্যকে নাম-লক্ষণ জানা না থাকায় জানি বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই, আমরাও তেমনি শত শত বিষয়, শত শত বস্তু ও শত শত বিদ্যা, নাম লক্ষণ জানা না থাকায় সাহস করিয়া, জানি বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না । আজ কাল একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে, বৈদ্য-দিগের Chemistry কেগিষ্টি নাই । বৈদ্যেরাও সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, আমাদের Chemisry কেগিষ্টি আছে । এ সকল কেবল নাম-লক্ষণ না জানারই ফল, না থাকার ফল নহে । কৃষক কৃষিকার্য্য করে ; কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে, কৃষিবিদ্যা কি তাহা জানি না । রজক চিরকালই বস্ত্রমল অপনয়ন করিতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে রঞ্জনবিদ্যা কি তাহা কে জানে ? চিকিৎসকও বাল্যাবধি একাধিক দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া, মিশ্রিত করিয়া, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলেই প্রত্যুত্তর করেন, সংযোগাপূর্ববিজ্ঞান-বিদ্যা আমরা-দিগের নাই । কি আশ্চর্য্য ! অনভিজ্ঞতার কি অদ্ভুত পরিণাম ! যাহারা যাহা পুরুষানুক্রমে, বাল্যাবধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহারাই কি-না আজ তাহাকে নাই ও জানি না বলিয়া পরিচয় দেয় । নাই বলে কা’কে ? নামপরিবর্ত্ত হইলেই কি নাই হয় ? নাই

বলিতে হয় ? জানি না। বলিতে হয় ? নাই বলা ও জানি না বলা উচিত নহে। যে দেশে রজক, রঞ্জক, কৰ্মকার, স্বর্ণকার, কংসকার, উদ্যানকার (মালী), সূপকার, ঐন্দ্রজালিক ও চিকিৎসক আছে,— সে দেশের লোকেরা যে আমাদের কেমিষ্ট্রী.....নাই বলে, ইহা সামান্য অজ্ঞতার ফল নহে, সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। রজক চিরকালই বস্ত্র গল অপনয়নের জন্য কেমিষ্ট্রীর কার্য্য করিতেছে। রঞ্জক বস্ত্রবর্ণনে নিরন্তরই কেমিষ্ট্রীর কার্য্য করিতেছে, কৰ্মকার লৌহনির্মাণের জন্য অসংখ্য অসংখ্য কেমিষ্ট্রী ফল দেখাইতেছে। স্বর্ণকারও বড় কম নহে। সূপকারের ত কথাই নাই। তাহারা অতি অদ্ভুত কেমিষ্ট্রী বিদ্যা জানে। এ দেশের ঐন্দ্রজালিকের মত কেমিষ্ট্রীজ্ঞ পণ্ডিত অন্য কোথাও ছিল না। এ দেশের চিকিৎসকেরাও কেমিষ্ট্রী জানে, কেমিষ্ট্রীর ফল বা কার্য্য জানে, তবে কি-না ইহারা কেমিষ্ট্রী এই নামটি জানে না। তাই তাহারা বলে, আমরা কেমিষ্ট্রী জানি না অথবা আমাদের কেমিষ্ট্রী নাই।

বলিতে পারেন যে, বস্ত্র না থাকিলে নাম থাকে না, কাঁধেই নামের অভাব দেখিয়া বস্ত্রের অভাব অনুমান করিতে হয়, অগাধ সংস্কৃত সাগরের মধ্যে যখন কেমিষ্ট্রী নামের অথবা ততুল্য বা তদর্থবোধক নামের উল্লেখ নাই, তখন অবশ্যই আমরা বলিব, ভারতবাসী ঐ অদ্ভুত বিদ্যায় বঞ্চিত ছিল। এ কথাই প্রত্যুত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, নাম না থাকা, নাম না জানার একটি কারণ বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হৃদোধ হইবে যে, ঐ কারণটি পুঙ্কল কারণ নহে। শিল্পই হউক, বা বিজ্ঞানই হউক, যাবৎ না তাহা লেখা পড়ার মধ্যে আইসে, তাবৎ তাহার পরিচয় যোগ্য নাম প্রচারিত হয় না এবং তাহা তখন কোন প্রকার পুথক্ বিদ্যা বলিয়া গণ্য হয় না। এখনও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা অজ্ঞাপি লেখা পড়ার মধ্যে আইসে নাই, বিদ্যানামে গণ্য হয় নাই। গ্রন্থা-

কারে বা পুস্তকাকারে প্রচারিত হয় নাই। যখন যখন লিপিপদ্ধতির অঙ্গপ্রচার ছিল,—তখন এ দেশের লোকেরা প্রায় সকল বিদ্যাই মুখে মুখে শিখিত এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিশেষ কোন বিভাগ বিদ্যগান ছিল না। সেইজন্যই আমাদের বৈদ্যের নাম প্রতি এবং সেই জন্যই তন্মধ্যে বিষয়সাক্ষ্য থাকে দুটো হয়। আমরা দেখিতে পাই, তদ্বিধ শ্রোতনময়েও এ দেশের লোকেরা বিদ্যার প্রতিপাদ্য বা বস্তুনিচয় লোকব্যবহারে প্রতিক্রিয়া লিপিপ্রচার না থাকাতোই সে সকল বস্তু পুস্তকমতে লিখিত বা আহৃত হয় নাই, শ্রেণীকরণ প্রণালীতে বিভক্ত হয় নাই, পৃথক বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কাষেই তাহার নির্দিষ্ট নামও হয় নাই। অথচ তাহা ছিল। পরে যখন লিপিপদ্ধতির ভুরি প্রচার আরম্ভ হইল, তখন অনেকগুলি বিষয়, অনেকগুলি বস্তু, অনেক ব্যক্তির জ্ঞানে একত্র সংকলিত হইয়া পুস্তকাকারে বা গ্রন্থাকারে এবং বিভাগক্রমে, লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ক্রমে সে সকলের পৃথক নামও হইয়াছিল এবং বিদ্যা বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত কথার দ্বারা পর্যাপ্ত প্রত্যুত্তর হয় না। পর্যাপ্ত প্রত্যুত্তর এই যে, “সংস্কৃত ভাষায় হইলো কেমিষ্ট্রী শব্দের অনুরূপ শব্দ নাই, এ কথা তোমার মনে বসিলে ?” আমরা দেখিতেছি, শত শত স্থানে ইংরাজী কেমিষ্ট্রী শব্দের অনুরূপ বা তুল্যার্থদ্যোতক শব্দ আছে। কেমিষ্ট্রী বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা যুঝাইবার জন্য আমাদের সংস্কৃত ভাষায় তাঃ শব্দ শব্দ আছে এবং সে সকল শব্দ অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। কোন্‌রূপ আছে ? তাহা আমরা আগামী বারের সঞ্জীবনীতে প্রত্যুত্তর করিব। কেমিষ্ট্রী শব্দের তুল্যার্থ শব্দ, তাহার ব্যুৎপত্তি, তৎপ্রকার প্রচার, ও সমস্তই বলিব এবং এই বিদ্যা যে বৈদ্যকমধ্যে কিরূপে প্রয়োগিত আছে, তাহাও দেখাইব। [ক্রমশঃ]



